প্রকাশক—
শ্রীমুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তী, এম্, এস্-সি,
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

"দেশ,—সমগ্র দেশ,—কেবলমাত্র দেশই হ'ক আমাদের একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। বিধাতার আশীর্ব্বাদে সেই দেশে গ'ড়ে উঠুক এক বিরাট্ যশঃস্তম্ভ—অত্যাচারের নয়,—আতঙ্কের নয়,—জ্ঞান, শান্তি ও স্বাধীনতার,—বিশ্ববাসী যেন তার দিকে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় চিরদিন চেয়ে থাকে।"

—ডানিয়েল ওয়েবষ্টার

প্রিণ্টার—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীরাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন করিতেছেন, সঙ্গে মেজর জেনারেল মোহন সিং।

সিঙ্গাপুরে শ্রীরাসবিহারী বসু মেজর জেনারেল শাহনওয়াজের সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন—সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।

মুখবন্ধ

"......আজাদ হিন্দ ফৌজ শুধু মালয়, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে তাহার ইতিহাস রচনা করে নাই,—তাহার ইতিহাস রচিত হইয়াছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অন্তঃকরণে।......ইহার স্মৃতি দেশবাসীর মনে চিরজাগরূক থাকিবে।......এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু সে সবগুলিই মুহূর্ত্তের উত্তেজনাপ্রসূত।......আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান এই পুস্তকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্ত্তিকলাপ সুসংযত ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একখানি অতি মূল্যবান ইতিহাস উপহার দিয়াছেন। ......আমার মনে হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।...... প্রত্যেক দেশবাসীকে আমি ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা পাঠে এই অসমসাহসিক অভিযান সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। জয় হিন্দ।

নয়া দিল্লী
১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬

জহরলাল নেহরু

নেতাজীর ব্যাঙ্ককে প্রথম পদার্পণ।
উপস্থিত—মিঃ মাটানি (মাল্যহস্তে),
শ্রীদেবনাথ দাস, শ্রীআনন্দমোহন
সহায়, মিঃ আবিদ হাসান।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আদেশে
কার্য্যরত যুদ্ধবন্দী ইংরেজ সৈন্য।

"শত্রু নাশ"—একটি আজাদ হিন্দ ঘাতক শত্রু লাইনের নিকট শিকারের প্রতীক্ষায়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ কামান-বাহীদলের যুদ্ধ-যাত্রা।

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলার বীর সন্তান, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক, জগদ্বরেণ্য নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তদীয় অলৌকিক-গুণমুগ্ধ সহস্র সহস্র ভারতবাসী প্রদেশ, ধর্ম্ম ও আভিজাত্যের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া এক পণ, এক মন ও এক প্রাণ হইয়া ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চতুর্ব্বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা ও অসাধারণ আত্মত্যাগের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। নেতাজীর অন্তরঙ্গ সহচর স্বদেশপ্রেমিক পঞ্চনদবীর মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ খান আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অন্যতম প্রধান কর্ম্মিরূপে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার বর্ণনা আমাদের দেশবাসীকে মুগ্ধ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবে, এই আশায় "আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী" দেশবাসীর হস্তে অর্পিত হইল। বাংলার ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহা পাঠে তৃপ্তিলাভ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

প্রকাশক

ষ্টাফ্ অফিসার দল সহ নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন—জুলাই, ১৯৪৩।
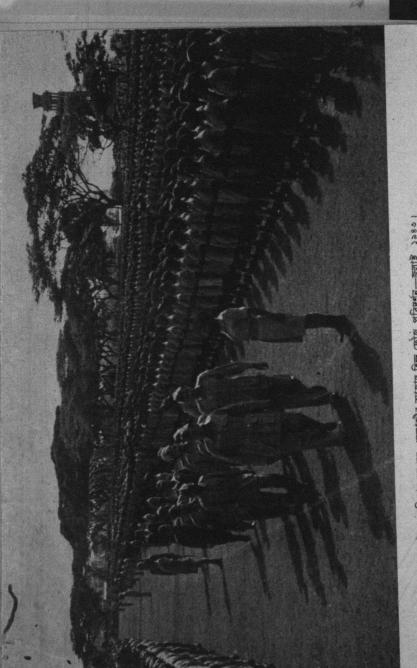
আজাদ হিন্দ বাহিনী—
সঙ্গে সাজোয়া গাড়ী।

আজাদ হিন্দ সাজোয়াবাহিনী।

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্ত্তিকাহিনী একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার হিসাবে ক্যাপ্টেন পি, কে, সাইগল, লেফ্ট, জি, এস্, ধীলন ও আমার সামরিক আদালতে যে বিচার হয় তাহা জনসাধারণের যেরূপ দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিল, পূর্ব্বে বা পরে, ভারতবর্ষের কোন সামরিক বা অসামরিক বিচার এইরূপ দৃষ্টি-আকর্ষণ করে নাই। বিচারে মুক্তিলাভের পর ভারতবর্ষের বহুস্থানে ভ্রমণ করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। যখনই যেখানে গিয়াছি জনসাধারণের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তাহার নেতাজী সম্বন্ধে বিশদ্ বিবরণ জানিবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি। সাধারণের এই আগ্রহ আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ও প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আমাকে উৎসাহিত করে। এই পুস্তক রচনা তাহারই ফল। প্রকৃত ঘটনাবলী যথাসত্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি,—ভাষা ও বর্ণনাপদ্ধতি অবশ্য সৈনিকের।

কয়েকজন গ্রন্থকার আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধীয় পুস্তক সদ্য সদ্য প্রচারের আগ্রহে, সেই সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত না হইয়াই ইংরাজী ও কতিপয় দেশীয় ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তকের বিবরণ বহু বিষয়ে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান পুস্তক-রচনার ইহা আর একটি কারণ। সামরিক আদালতে আমাদের বিচারের সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয় নাই, যাহাও আলোচিত হইয়াছিল তাহাও সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ তিন বৎসর ও আট মাস আমার বহু সহস্র সহকর্ম্মী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও উপদেশে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুপম নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সহিত জীবনে ও মরণে জড়িত ছিলেন, এই গ্রন্থের বর্ণনার বিষয় তাঁহাদেরই কীর্ত্তি-কাহিনী।

নেতাজী সাজোয়াবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন।
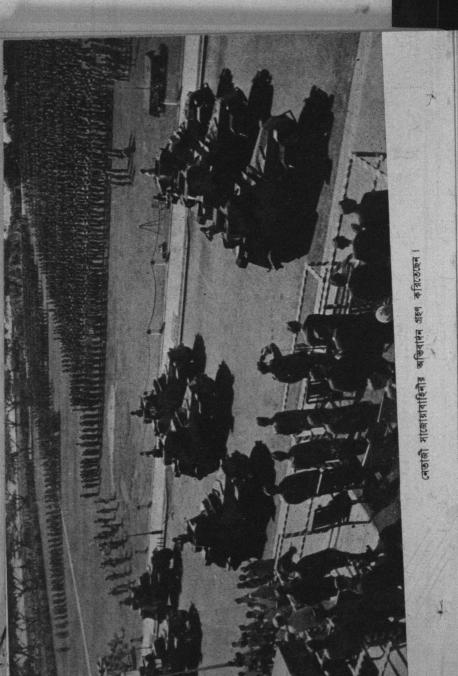
জনসাধারণের মনে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী সম্বন্ধে কোনও অসত্য বা ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে তাহা এই পুস্তক পাঠে দূরীভূত হইবে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির অনুরূপ তাহা পরিস্ফুট হইবে।

এই পুস্তকে আমি নেতাজীকে মানুষ, রাজনীতিবিদ্ ও সেনাধিনায়ক হিসাবে দেখিতে ও দেখাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

সামরিক বিচারে কারামুক্ত হইয়া আজ যে আমি এই গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছি ইহা স্বর্গত ভুলাভাই দেশাই, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মিষ্টার আসফ আলি, ডাঃ কাটজু প্রমুখ আইনজ্ঞ মনীষীদিগের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অসাধারণ পরিশ্রমের ফল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদিগের জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

এই পুস্তকের মুখবন্ধ লেখার জন্য মাননীয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীমান্ কল্যাণ বসু ও নেতাজীর অন্যান্য ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ এই পুস্তক লিখিতে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সুসাহিত্যিক শ্রীযুত তারাপদ রাহা, এম্, এ, এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। রিপ্রোডাকসান সিণ্ডিকেট অতি যত্ন-সহকারে এই পুস্তকের ছবিগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি ঋণী।

পাঠকগণ এই গ্রন্থ যত্ন-সহকারে পাঠ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

২, উইণ্ডসর প্লেস,
নিউ দিল্লী

শাহ্ নওয়াজ খান

মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি—আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিব।

মেজর জেনারেল এম্, জেড, কিয়ানি—আজাদ হিন্দ ফৌজ ১নং ডিভিশানের সেনাপতি।

বিষয়-সূচী

কর্ণের হবিবুর রহমান

আনন্দমোহন : সহায়
(সেক্রেটারী—আজাদ
হিন্দ গভর্ণমেণ্ট)

চিত্র-সূচী

নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সাজোয়াবাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন। সঙ্গে (১) মেজর জেনারেল এম, জেড্, কিয়ানি, (২) শ্রীরাসবিহারী বসু, (৩) মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, (৪) মেজর জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা, (৫) কর্ণেল পি, কে, সাইগল।

১৯। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্ণে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সৈন্যদলকে অভিভাষণ

২০। সিঙ্গাপুর মিউনিসিপাল বিল্ডিং-এর সম্মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ

২১। কর্ণেল মহ্‌বুব আহমেদ তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে "ক্ল্যাং ক্ল্যাং" ঘাঁটি আক্রমণের আদেশ দিতেছেন

২২। আজাদ হিন্দ সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রা

২৩। আজাদ হিন্দ সৈন্যদল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে

২৪। পোপার যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত কর্ণেল সাইগলের অধীনস্থ বোমাবর্ষী কামান-বাহিনী

২৫। প্যালেল যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ ফৌজ মেশিনগানবাহী দল

২৬। "তাহারা তীর-ধনুক থেকে মেশিনগান পর্য্যন্ত যখন যে অস্ত্র পেয়েছে তাই নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।" কোহিমায় যুদ্ধরত সুভাষ-বাহিনীর এক দল

২৭। কর্ণেল জি, এস্, ধীলন

২৮। কর্ণেল পি, কে, সাইগল

২৯। মেজর জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা

৩০। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল বুরহানুদ্দীন

৩১। কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন

৩২। নেতাজী শহীদ-স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি-স্থাপন করিতেছেন

৩৩। নেতাজীর শহীদ-স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান

৩৪। আমরা ভারতবর্ষকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি—এই আমাদের প্রধান সেনাপতি নেতাজীর ফটো

৩৫। মিঃ ভুলাভাই দেশাই

"স্বাধীন ভারতে আবার আমাদের দেখা হবে"—নেতাজী যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোন্মুখ সেনানায়কদিগকে বিদায় দিতেছেন।

"কদম্ কদম বাড়ায়ে যা"—ভারতবর্ষের পথে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ঘাঁটি।

মানচিত্র-সূচী

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্নে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সৈন্যদলকে অভিভাষণ—"এই যুদ্ধে আমরা বাঁচি বা মরি সে অতি তুচ্ছ কথা, দেশকে অবিলম্বে পরাধীনতা-মুক্ত করিব, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের সঙ্কল্প হউক।"
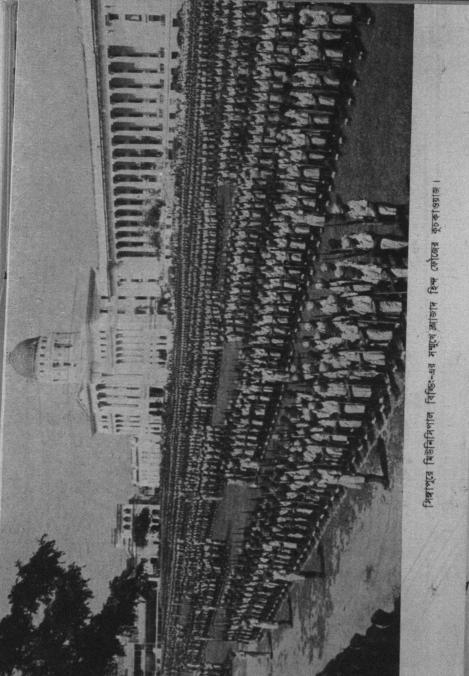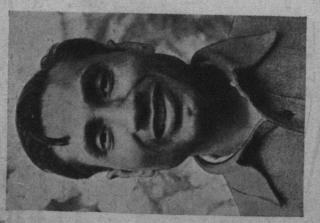
আজাদ হিন্দ ফৌজ
ও
নেতাজী

সিঙ্গাপুরে মিউনিসিপাল বিল্ডিং-এর সম্মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ।

মেজর জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা

লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল বুরহানুদ্দীন

কর্ণেল জি, এস, ধীলন

কর্ণেল পি, কে, সাইগল

টোকিওতে নেতাজী।

(নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অরবিন্দ বসুর সৌজন্যে)

“আমরা ভারতবর্ষকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি—এই আমাদের প্রধান সেনাপতি নেতাজীর ফটো”—আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা বৃটিশ সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন অজিত সিং-এর উক্তি—ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী

নেতাজী

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে নেতাজীর একটি লিপিচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আমার মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগ্‌ছে—এ কি আমার দ্বারা সম্ভব : ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবরূপে যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আমার মত একজন সামান্য ব্যক্তি তাঁর প্রকৃত লিপিচিত্র অঙ্কন করবে—এ কি সম্ভব ? আমার ত' মনে হয় এ শুধু দুঃসাধ্য নয়—এ অসম্ভব।

আমার অনেক বন্ধুই আমাকে অনুরোধ করেছেন—নেতাজীকে আমি যেমনটি দেখেছি—তার একটা সত্যিকার বর্ণনা যেন আমি দিই। সে চেষ্টা আমি আজ করব, কিন্তু আমার ভয় হয়—অক্ষম আমার লেখনী বুঝি আমার নেতাজীর মহিমা ম্লান ক'রে ফেলে। পাঠকগণ যেন আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করেন : যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, তিনি এত মহান্ যে আমার মত একজন সাধারণ সৈনিকের পক্ষে তাঁর যথাযথ বর্ণনা করা সত্যিই সম্ভব নয়।

এ কথা আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাঁর চরিত্র আমার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নেতাজীকে
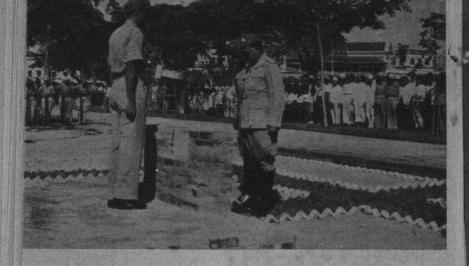
নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদ-স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি-স্থাপন করিতেছেন, সঙ্গে কর্ণেল হবিবুর রহমান—জুলাই, ১৯৪৫।

নেতাজীর সিঙ্গাপুরে শহীদ-স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান—জুলাই, ১৯৪৫।
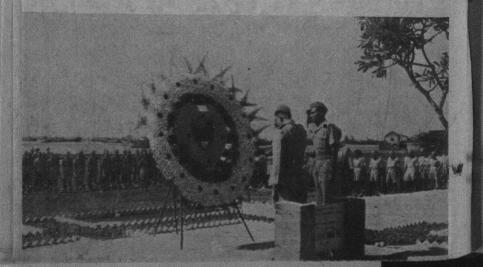
আমি মানুষ, সৈনিক ও রাজনীতিজ্ঞ—এই তিনরূপে দেখেছি, কিন্তু এখনও আমি ঠিক ক'রে বলতে পারি না—এই তিনের কোন রূপে তিনি সবচেয়ে বড়, আর কোনটাতে ছোট। ঘরে থাকবার সময় মনে হ'ত—মানুষ হিসেবেই তিনি সব চেয়ে বড়, যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্যদলের মাঝে তাঁকে দেখে মনে হ'ত—এমনটি আর হয় না, আবার যখন তিনি সভাসমিতি, বৈঠকে অথবা অফিসে সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাধিনায়ক রূপে কাজ করতেন তখন তাঁর কার্য্য-পরিচালনা দেখে আমরা মুগ্ধ হতাম।

বাল্যকাল থেকে সামরিক আবহাওয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আনুগত্যের ভিতরই মানুষ হ'য়ে উঠেছি আমি। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকেই তার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আসছিলাম আমি—কারণ, আমার বরাবরের ধারণা জাপানীরা ভারতীয়দের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই ক'রে নিচ্ছে এবং ব্রিটিশদের উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং নেতাজীকে প্রথম আমি যখন দেখলাম তখন তাঁকে বেশ ক'রে যাচাই ক'রে নিতে কসুর করি নি। তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেমই আমাকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি জীবনের সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে রাজী ছিলেন, কারণ তাঁর কাছে এর চেয়ে বড় জিনিষ কিছু জগতে ছিল না।

কোন লোকের কাজ-কর্ম্ম, আদর্শ ঠিক মত বুঝতে হ'লে বহুদিন তাঁর সঙ্গ করা দরকার। নেতাজীর সাহচর্য্যের সুযোগ

মিঃ ভুলাভাই দেশাই
ও মিঃ আসফ আলি

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ডাঃ কে, এন, কাটজু, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

আমি যথেষ্ট পেয়েছি : যতদিন তিনি পূর্ব্বএশিয়ায় ছিলেন তাঁর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। তিনি যতদিন সিঙ্গাপুরে ছিলেন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তারপর তিনি ব্রহ্মদেশে যান, আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। সেখানে প্রায় দেড় বৎসর আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস করেছি। প্রতিদিন নানা কাজে তাঁর যে অসাধারণ ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় আমি পেয়েছি তা অবর্ণনীয়। পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে যে গভীর শ্রদ্ধা, প্রীতি তিনি লাভ করেছেন তাই তাঁর গুণাবলীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই মুগ্ধ হ'য়েছে ; এমন কি, অনেক বিদেশী লোকও তাঁর সান্নিধ্যে এসে তাঁর অনুরাগী ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন। পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়-দের তিনিই ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তা'ছাড়া প্রাচ্যদেশবাসী ও ভারতীয়দের মধ্যেও একটা নিবিড় বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার ভাব গড়ে তুলেছেন। লোকে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দিয়েছে, প্রীতি দিয়েছে দেবতা জ্ঞানে নয়—তারা তাঁর মাঝে সত্যিকার মানুষ, বীর, বন্ধু, সার্থীর দেখা পেয়েছে বলে। তাঁর মাঝে এমন কি ছিল যার বলে তিনি মানুষের হৃদয় এমনি করে জয় করে নিলেন, এমনি করে তাদের গভীর শ্রদ্ধা, অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করলেন ? কি গুণেই বা তিনি পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের অবিসম্বাদী নেতা বলে গণ্য হ'লেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে—এ সব পেয়েছেন তিনি তাঁর মহান্ চরিত্র, অতুলনীয় সাহস ও অনন্যসাধারণ উদারতার গুণে।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুর মত, সার্থীর

নেতাজীর জন্মদিনে কলিকাতায় নেতাজী-ভবনে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ নেতাজীর ফটোতে মাল্যদান করিতেছেন—২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৬।

মত। পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের তিনি নেতা—কিন্তু'হাবভাবে কোনদিন তিনি তাঁর প্রভুত্ব জাহির করেন নি। তিনি নিত্য কঠোর জীবন যাপন ও অমানুষিক পরিশ্রম করতেন; আবার সবার দুঃখকষ্টের ভাগও গ্রহণ করতেন। তিনি আজাদ হিন্দ দলের প্রত্যেক লোকের খোঁজ খবর নিতেন, প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন। ছোট বড়, খুঁটিনাটি সব কিছুর হিসাব তিনি নিজে করতেন, যার যা প্রয়োজন তাও মেটাতেন। কোনও জাঁক-জমক তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন।

জাপানীদের সঙ্গে নেতাজীর সম্বন্ধ শেষে কি গিয়ে দাঁড়ায় —এ নিয়ে প্রথম প্রথম আমরা খুবই মাথা ঘামিয়েছি। মালয় ও ব্রহ্মদেশের লোকের সঙ্গে জাপানীরা যা ব্যবহার করেছে, জেনারেল মোহনসিং-এর সঙ্গে যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে —তা দেখে ওদের ওপর আর বিন্দুমাত্র আস্থা আমাদের ছিল না। এখন নেতাজীর সঙ্গে ওরা কিরূপ ব্যবহার করে এবং নেতাজীই বা তার প্রতিদানে কি করেন—দেখবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম নেতাজী কারো কাছে নতি স্বীকার করার লোক ন'ন, দেশের সম্মান তিনি কোন কিছুর পরিবর্ত্তেই খোয়াতে রাজী ন'ন।

নেতাজীর আর একটা গুণ ছিল তাঁর অকপট ব্যবহার, এই গুণেই তিনি তাঁর অধীনস্থ অফিসার ও অন্যান্য লোকের চিত্ত জয় করেছিলেন। একদিন কয়েকজন অফিসার নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করল—জাপানীদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধটা কি?

নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখিতেছেন, সঙ্গে মেজর জেনারেল এম, জেড, কিয়ানি।

ঝাঁসীর-রাণী বাহিনীর দামামা-বাদক।

তিনি বল্‌লেন,—জাপানীরা ভালভাবে জানে, ব্রিটিশেরা যতদিন ভারতবর্ষে থাকবে ততদিন তারা সেখান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ ক'রে যুদ্ধ চালাবে জাপানীদের সঙ্গে,—জাপানীরা নিরাপদে তাদের সাম্রাজ্য ভোগ করতে পারবে না; সুতরাং তারা নিজের স্বার্থেই ভাবতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ-বিতাড়নের চেষ্টা করবে, নইলে তাদের নিজেদেরই পূর্ব্বএশিয়া থেকে বিতাড়িত হ'তে হবে। নেতাজী বল্‌লেন—যুদ্ধে আমাদেব সাহায্য ক'রে আমাদের কোন অনুগ্রহ করছে না ওরা। আসল কথা—ওরাও যেমন আমাদের সাহায্য করছে, আমরাও তেমন তাদের সাহায্য করছি। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—ভারত থেকে ব্রিটিশ-বিতাড়ন; ওরা কবতে চায় এটা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে—আমরা চাই নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে। তিনি বল্‌লেন—"সত্যি কথা বলতে কি—বিশ্বাস আমি ব্রিটিশদেরও করি না, জাপানীদেরও না। দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে বিশ্বাস কাউকেই করা যায় না, আমরা যতদিন দুর্ব্বল থাকব শক্তি-শালী যে কোন জাতিই সুযোগ পেলে আমাদের শোষণ করতে ছাড়বে না।" নেতাজী বললেন—জাপানীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—আমাদের নিজেদের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠা। জাপানীরা এসে আমাদের রক্ষা করবে এ প্রত্যাশা যেন আমরা কখন না করি, আমাদের নিজ শক্তিবলেই নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এমন কি, ভারতবর্ষে গিয়ে যদি আমরা দেখি জাপানীরা ব্রিটিশের আসনে নিজেরা বসতে চাইছে তা'হলে তাদের বিরুদ্ধেই

নেতাজী ঝাঁসীর-রাণী বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন। সঙ্গে ক্যাপ্টেন মিসেস থিভার্স।

ঝাঁসীর-রাণী বাহিনীর মেয়েরা সঙ্গিনযুদ্ধ-শিক্ষায় নিযুক্ত।

অস্ত্রধারণ করতে হবে আমাদের। শুধু সেই দিন নয়, অনেক জনসভাতেও নেতাজী আমাদের এই কথাই বলেছেন। যে সব সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে তাদের তিনি আগে থেকেই বলে রেখেছেন—তারা যেন প্রথমে ব্রিটিশদের সঙ্গে, পরে দরকার হ'লে জাপানীদের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। জাপানীদের সঙ্গে এক সাথে মিলেমিশে কাজ করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পৃথক স্থান (Sector) ছিল, সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ করত। আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর জাপানী কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশ বলে কিছু ছিল না। যুদ্ধের সময় 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'তে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—এই ফৌজ যখন জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে লড়াই করছে তখন এরা জাপানীদের হাতে ক্রীড়াপুত্তলি না হ'য়ে যায় না। নেতাজী এর উত্তরে বলেছিলেন—ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যদল ত' ফ্রান্সে জেনারেল আইশেনহাওয়ারের (Eisenhower) নেতৃত্বে ঠিক এই ভাবেই লড়াই করছে। ব্রিটিশেরা যখন নিজেরাই আমেরিকানদের নির্দ্দেশ মেনে যুদ্ধ করছে তখন তারা আবার আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করতে আসে কেন?

নেতাজীর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উচ্চাকাঙ্খার নামগন্ধ ছিল না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার একটি বৈঠকে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো তাঁর বক্তৃতার এক অংশে বলেন,—স্বাধীন ভারতে

নেতাজীই হবেন সর্ব্বেসর্ব্বা ; কথাটি শুনবামাত্র নেতাজী উঠে দাঁড়িয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলেন—এরূপ কথা বলবার কোন অধিকার জেনারেল তোজোর নাই। স্বাধীন ভারতে কে কি হবেন তার সিদ্ধান্ত করবে ভারতের অধিবাসীরা। তিনি নিজে ভারতের একজন দীন সেবক মাত্র,—সেখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা হবার মত যোগ্যতা রয়েছে কেবল মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা প্রাদেশিক ভেদাভেদ তাঁর কাছে কিছুমাত্র ছিল না। এ সব তিনি আমলই দিতেন না। হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাইকে তিনি সমচোখে দেখতেন এবং তাঁর এই ভাবই সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আজাদ হিন্দ দলে ধর্ম্মগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নামগন্ধ ছিল না, অথচ প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ ধর্ম্মমত অনুসারে উপাসনা করবার অধিকার ছিল। তিনি তাঁর সৈন্যদের বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তারা সবাই একই ভারতমাতার সন্তান ; সুতরাং তাদের কারো সাথে কারো কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। নেতাজীর অনুপ্রেরণায় আমরা সবাই এক হ'য়ে গিয়েছিলাম এবং আমরা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করছিলাম ভারতের ধর্ম্মগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শুধু বিদেশীদেরই সৃষ্টি। এই বিদ্বেষের ভাব যে আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হ'য়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ— নেতাজীর শ্রেষ্ঠ অনুরাগীভক্তদের কয়েকজন হচ্ছেন

মুসলমান। মানুষ হিসাবে কে কেমন নেতাজী তাই দেখে লোককে সম্মান দিতেন, তার ধর্ম্ম বা প্রদেশ দেখে নয়।

জার্ম্মানী থেকে টোকিও আসবার বিপদসঙ্কুল পথে তিনি যখন সাবমেরিণে যাত্রা করেন তখন তাঁর সঙ্গী নির্ব্বাচন করেন যাঁকে—তিনি এক মুসলিম তরুণ। নাম তাঁর আবিদ হোসেন।

আবার তাঁর সৈন্য দল যখন যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন—তখন তার দুইজন ডিভিশনাল কমাণ্ডারই ছিলেন মুসলমান: মেজর জেনারেল এম, জেড, কিয়ানি এবং আমি। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে তিনি যখন শেষবাব টোকিও যাত্রা করেন তখনও তাঁর সঙ্গী নির্ব্বাচন কবলেন একজন মুসলমানকে। নাম তাঁব কর্ণেল হবিবর বহমান। এইরূপ মনোভাব শুধু সৈন্যদলেই নিবদ্ধ ছিল না, অসামরিক লোক সমাজেও এ ভাব প্রসাবিত হ'য়ে পড়েছিল। সেখানেও নেতাজীর শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদের কয়েকজন হচ্ছেন মুসলিম। মিঃ হাবিব নামে রেঙ্গুণের এক ধনী বণিক নেতাজীর গলাব মালার মূল্য স্বরূপ তার সমস্ত সম্পত্তি দান কবেছিলেন—এ সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এই জন্যই আমরা—আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা—এ কথায় বিশ্বাস করি না যে ভারতীয়েরা সব ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে আপন ভাইবোনের মত মিলেমিশে এক স্বাধীন মহান্ অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না।

তিনি আমাদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—অনাহার-ক্লিষ্ট দেশের সৈন্য আমরা, জীবন আমাদের এক মহৎ উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীকৃত। তাঁর কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়েই আজাদ হিন্দের সৈন্যেরা অত কষ্ট ক'রে বাধাবিপত্তি অভাব তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করতে পেরেছিল।

নিজের কাজ, ব্যক্তিগত জীবন বলে তাঁর কিছু ছিল না। খুব ভোরে উঠে রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত তিনি সব সময়েই দেশের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বাড়িতে তাঁর ব্যবহার ছিল অতি চমৎকার,—অভ্যাগতেরা তাঁর কাছে সমাদব পেতেন পরমাত্মীয়ের মত। অফিসারদের প্রায়ই তিনি ব্যাড্‌মিণ্টন খেলায় নিমন্ত্রণ করতেন। খেলার শেষে তিনি তাঁদের নিজের ঘরে নিয়ে যেতেন, তাঁদেব জামা-কাপড় বদল করবার দরকার হ'লে তিনি নিজের জামা-কাপড়ই তাঁদের দিতেন। তাঁদের কেউ হাত-মুখ ধুতে গেলে তিনি তাঁর জন্য সাবান, তোয়ালে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনীর মেয়েদের তিনি নিজের সন্তানের মত দেখতেন। তাদের কিসে মঙ্গল হয়, সম্মান কিসে তাদের বজায় থাকে সে বিষয়ে তাঁর সদা-সতর্ক দৃষ্টি ছিল। একবার ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনীর একটি মেয়ে তার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে শুনে বিষপান করে। ব্যাপারটা যথা সময়ে জানতে পারায় মেয়েটি অবশ্য রক্ষা পেল। নেতাজী দুইজন বর্ষিয়সী মহিলার উপর ভার দিলেন—এর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সর্ব্বদা এর গতিবিধি লক্ষ্য করতে। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও তাকে ডেকে পাঠাতেন। সে এলে বাপের মত তিনি তার সঙ্গে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দিতেন।

নেতাজী তাঁর সৈন্যদের খুবই ভালবাসতেন এবং তারা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখতেন। অনেক সময় তিনি তাদের রান্নাঘর পরিদর্শন করতেন, কখনও বা তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতেন। তাঁর কড়া হুকুম ছিল—তাঁর নিজের খাদ্য যেন ঠিক সৈন্যদের খাদ্যের মত হয়। তিনি প্রায়ই হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন এবং নিজের বাড়িতে মিঠাই তৈরী করিয়ে সেখানকাব সৈন্যদের জন্য নিয়ে যেতেন।

তাঁর এই সব গুণ থাকায়, জাপানীদের কাছে নতি স্বীকারে অস্বীকার করায় এবং তাঁর অকপট ব্যবহার, দেশপ্রীতি, নিঃস্বার্থপরতা এবং সৈন্যদের প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি সবার প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই মনে করত—নেতাজী তার বিশিষ্ট বন্ধু এবং এমন একজন নেতার জন্যে প্রাণ দেওয়াও মহাসৌভাগ্যের কথা।

প্রত্যেকদিন বেতারে ভারতবর্ষের খবর তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে শুনে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েন। এই সময় দিনরাত তিনি ভাবতেন—কি ক'রে দেশবাসীকে—বিশেষ ক'রে তাঁর অতি প্রিয় বাংলাদেশের অধিবাসীকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন। অনেক চেষ্টা ক'রে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের সরকারের কাছ থেকে তিনি ১০০,০০০ টন্ চা'ল ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠান যে একলক্ষ টন চা'ল তিনি কলকাতায় পাঠাবেন—পাঠানোর সকল প্রকার বন্দোবস্ত তিনি নিজেই

করবেন, ব্রিটিশেরা শুধু এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে মালবাহী জাহাজ ও নৌকাগুলি তাঁরা নিরাপদে ফিরে যেতে দেবেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এর কোন জবাবই দিলেন না, নেতাজী আগেই অনুমান করেছিলেন—তাঁরা এইরকমই করবেন। নেতাজী শুধু একবার নয়—কয়েকবার এই প্রস্তাব করেন; একবারও জবাব মিল্‌ল না। হবেই ত'—লক্ষ লক্ষ বাঙালী মরে ত' ব্রিটিশের কি?

একবার জাপানী জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষ নেতাজীর কাছে এসে বলেন—তাঁরা ঠিক করেছেন কলকাতায় বোমা ফেলবেন এ বিষয়ে নেতাজীর মত কি। নেতাজী তার উত্তরে বলেন—সুন্দর মহানগরী ভীষণ বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে এ তিনি একেবারেই চা'ন না। তিনি বলেন—"দেশ-বাসীকে দিতে চাই আমি আশা ভরসা—ধ্বংস ও যন্ত্রণা নয়।··· ইম্ফলের পতনের পর আমরা অনেক বোমারু-বিমান কলকাতা পাঠাতে চাই, তারা গিয়ে উপর থেকে বোমা ফেলবে না, ফেলবে হাজার হাজার ত্রিবর্ণ পতাকা। বোমার চেয়ে এতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের কাজ করবে বেশি।" যাই হ'ক কলকাতায় বোমা ফেলার চেষ্টা থেকে জাপানীদের নেতাজীই বিরত করেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতাজীর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। যখন যে চাল দরকার, সে চাল দিতে তাঁর কখনও ভুল হ'ত না, ফলে রাজনীতির খেলায় তাঁর বিপক্ষ দলেরই হ'ত পরাজয়। মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে এমন্

কথা তিনি বলতেন যে আমরা শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতাম। অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'ত। বস্তুতঃ তিনি নেতা ছিলেন শুধু পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের নয়, ওখানকার যাবতীয় লোকের। বৃহত্তর পূর্ব্বএশিয়ার বৈঠকে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তিনিই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্যই জাপানী গবর্ণমেণ্ট টোকিওর হাবিয়া পার্কে (Habiya Park) জাপানীদের কাছে বক্তৃতা দিতে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। এটা কম সম্মানের কথা নয়, জাপানীরা এ সম্মান বিদেশী কাউকে বড় একটা দেয় নি —বিশেষ ক'রে এমন সময়ে, যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় ক'রে তারা সৌভাগ্য ও গৌরবের চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল। জাপানের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমায় বলেছেন— নেতাজী বিপুল প্রতিভাশালী ব্যক্তি। পূর্ব্বএশিয়ায় এমন রাজনীতিজ্ঞ আর নেই। নেতাজীর সঙ্গে বহু সভা এবং বৈঠকে গিয়ে আমি দেখেছি রাজনীতিজ্ঞানে অন্য কেউ তাঁর কাছে দাঁড়াতেই পারে না।

ভারতীয় রাজনীতি ছিল তাঁর একেবারে নখ-দর্পণে। ভারতের অধিবাসীদের তিনি চিনতেন—নেতারা সব তাঁর জানা—সুতরাং এখানকার কার্য্যপদ্ধতি ও তার ফলাফল যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসত। জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা বেশ একটু কঠিন ব্যাপার ছিল, বিশেষ ক'রে এই সময়ে যখন তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই সোণা ফলছে। নেতাজী কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারও কেমন ক'রে যেন

অতি সহজ করে ফেলতেন, জাপানীদের দুরভিসন্ধি তাঁর সুনিপুণ রাজনৈতিক চালে সব ভেস্তে যেত,—তাই তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য আমাদের একবারও ঘটে নি। নিম্নপদস্থ ভারতীয় ও জাপানী অফিসারেরা কিন্তু পরস্পরের প্রতি রাগে গস্ গস্ করতেন। মোট কথা, আমাদের রাজনৈতিক-তরণী ভীষণ তুফানের মাঝেই চলেছিল কিন্তু সুদক্ষ কর্ণধার নেতাজীর পরিচালনা গুণে আপদ বিপদ তার কিছু ঘটে নি। আমি বরাবর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি,—দেখে দেখে বুঝেছি রাজনৈতিক বুদ্ধি তাঁর অতি তীক্ষ্ণ। জাপানের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ববাবর আমাদের সাহায্য করবার অছিলায় আমাদের দ্বারা নিজেদের কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছে,—এতে আমরা অতিশয় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। নেতাজী আসার পর তাঁর প্রভাবে ওদের মতিগতি একেবারে পাল্‌টে গেল। যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন কিছু করতে হ'লে জাপানী সামবিক কর্ত্তৃপক্ষ নেতাজীর সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করার পর তবে কাজে হাত দিতেন। চীনের উপর জাপানের প্রভুত্ব করার স্পৃহা যে শেষে বন্ধুত্ব-কামনায় পরিণত হ'ল এরও মূলে রয়েছেন নেতাজী। ব্রহ্ম, চীন ও জাপানের অনেক বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ প্রায়ই নেতাজীর কাছে আন্তর্জাতিক ব্যাপারের পরামর্শ নিতে আসতেন। পূর্ব্বএশিয়ার পরাধীন জাতিদের কাছে নেতাজী ছিলেন বিশেষ গর্ব্বের বস্তু। মহত্ত্ব কেউ অর্জ্জন করতে পারে না—এ মানুষের জন্মগত সহজাত গুণ; কিন্তু মহত্ত্বের পথে যাত্রা ক'রে কোন বড় কিছু করতে

গেলে এর আনুষঙ্গিক অনেক কিছু মানুষের অনুশীলন ক'রে নিতে হয়—এই অনুশীলনকেই বলা হয় মহত্ত্বের সাধনা। এ সাধনা নেতাজী যথাযথ ভাবে করেছিলেন। তাঁর অকপটতাই তাঁর মহত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধি এনে দিয়েছিল। সুদূর প্রাচ্যের নেতারা তাঁর কাছে যুক্তি পরামর্শ চাইতে এলে তিনি তাঁদের অতি সহজে ব্রিটিশ প্রচার বিভাগের দুরভিসন্ধি ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন।

নেতাজীর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হচ্ছে সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় এ একটা মস্ত বড় চাল। পূর্ব্বেকার ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার অধিকার ছিল না, তা ছাড়া পূর্ব্বএশিয়ার জাতিসঙ্ঘের (League of East Asiatic Nations) সঙ্গে সমপর্য্যায়ে সহযোগিতার সম্ভাবনাও তার ছিল না। এইরূপ সমান মর্য্যাদা ও অধিকারের প্রশ্ন যে একদিন আসবে—এ কথা নেতাজী পূর্ব্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনে এত আগ্রহশীল হ'য়ে উঠেছিলেন। অফিসার ও কর্ম্মীবৃন্দ সব একই রয়ে গেলেন—অথচ রাতারাতি আমরা স্বাধীন রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করলাম এবং ন'টি রাজ্য আমাদের স্বাধীনতা মেনে নিল। আমাদের গবর্ণমেণ্ট অপরের আশ্রিত হলেও মর্য্যাদা ও সুযোগ সুবিধা আমরা ঐ নয়টি রাজ্যের যে কোনটির চেয়ে একটুও কম পেলাম না।

জাপানীরা একবার প্রস্তাব করেছিল—সমপদস্থ আজাদ

হিন্দ ফৌজ ও জাপানের সামরিক কর্ম্মচারীদের প্রথম সাক্ষাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকই প্রথম অভিবাদন জানাবে—কারণ, জাপানী ফৌজ অনেক আগে গড়া হ'য়েছে। নেতাজী এ কথা শুনে রীতিমত চটে যান। তিনি বলেন,—এরূপ করলে মর্য্যাদায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে অনেক হীন করা হয়, সুতরাং এ প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করতে রাজী ন'ন। তিনি প্রস্তাব দেন, এরূপ সমপদস্থ দুই অফিসারের দেখা হ'লে তাঁরা দুইজনেই একসঙ্গে পরস্পরকে নমস্কার করবেন। জাপানীরা শেষে নেতাজীর মতই মেনে নেয়।

এ ছাড়া পূর্ব্বএশিয়ায় একমাত্র আজাদ হিন্দ ফৌজই জাপানী সামরিক আইনের আমলে আসত না। জাপানীরা কয়েকবার নেতাজীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে—আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপানের সামরিক আইনের অধীন করা হ'ক। নেতাজী কঠোর ভাবে তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন,—আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজেদেরই স্বতন্ত্র আইন কানুন আছে, তারা অপরের আইনের অধীনে থাকবে কেন। ব্যাপারটা শেষে টোকিও-য় জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের কানে পর্য্যন্ত তোলা হয়, সেখানে অবশ্য তাঁরা নেতাজীর কথাই মেনে নেন। সুযোগ পেলেই নেতাজী স্পষ্ট ক'রে শুনিয়ে দিতেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য, একে দিয়ে জাপানীদের নিজেদের কোন কাজ করিয়ে নিতে তিনি দেবেন না। দু' দু' বার জাপানীরা নিজেদের কাজে আজাদ হিন্দ

ফৌজের সাহায্যপ্রার্থী হ'য়েছে। একবার ছামপং (Chumpong) এলাকায়—শ্যামদেশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে একটা ছোট জাপানী দলকে শ্যামবাসীরা এখানে অবরুদ্ধ করে। এ ব্যাপার ঘটে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে। আর একবার ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে ব্রহ্মের জাতীয় বাহিনী যখন জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখনও জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে তাদের হ'য়ে লড়তে আহ্বান করেছিল। এই উভয় ক্ষেত্রেই নেতাজীর আদেশক্রমে আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়।

নেতাজীর আদর্শই ছিল—জাপানীদের কাছ থেকে পারতপক্ষে সাহায্য না নেওয়া। সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয়দের কাছ থেকে যতক্ষণ সাহায্য পাওয়া যেত ততক্ষণ সেই ধরণের সাহায্য জাপানীদের কাছ থেকে কিছুতেই গ্রহণ করা হ'ত না। জাপানীরা বার বার নেতাজীকে অনুরোধ করেছে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া হ'ক। নেতাজী এক সামরিক উপকরণ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহায্য নিতে কিছুতেই রাজী হন নি। তিনি ভারতীয়দের বলতেন—যতদিন তাঁরা নিজেদের দেশের কাজ নিজেরা চালিয়ে নিতে পারেন ততদিন তিনি অপরের মুখাপেক্ষী হবেন না। তাঁর এই অকপট ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়ে সেখানকার ভারতীয়েরা অজস্র টাকা, লোকবল ও নানা জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব দানের আয়োজনও চলছিল। স্বাধীনতার একটা অনিশ্চিত সম্ভাবনার জন্য এমন যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করার

কথা জগতে আর কোন জাতি কোনদিন ভেবেছে কি না সন্দেহ,—কিন্তু ওখানকার ভারতীয়েরা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সবাই নেতাজী যা চান তাই দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পূর্ব্বএশিয়ার সর্ব্বত্র ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ক'রে ওখানকার ধনী, দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছিলেন নেতাজী, ফলে তাদের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য আসতে লাগল। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বহু ভারতীয় তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব দেশের কাজে আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিয়ে নিজেরা ফকির সাজলেন। কোন কোন পরিবারের সবাই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছেন: বাপ এসেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজে, মা—ঝাঁসীর-রাণী-বাহিনীতে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বালসেনা দলে যোগ দিয়েছে। "করো সব নিছোয়ার, বনো সব ফকির"—এই ছিল তাঁদের নেতাজীর দেওয়া বাণী। হাবিব, বেতাই, খান্না এবং আরও অনেকে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজেরা একেবারে ফকির হ'য়েছেন। এমনি ক'রে রেঙ্গুণে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে মোট ২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

আজাদ হিন্দ সরকারী তহবিলে যে শুধু বড়লোকেরাই টাকা দিয়েছেন তা নয়—বস্তুতঃ এর অধিকাংশ টাকা এসেছে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের কাছ থেকে। দীন মজুর, গয়লা এবং তাদেরই সমশ্রেণীর লোক তাদের যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রে এ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

সিঙ্গাপুরের একটি জনসভায় নেতাজীর বক্তৃতা দেবার পর আমি যে দৃশ্য দেখেছি তা জীবনে ভুলব না।

বক্তৃতা শেষ ক'রে নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ সরকারী তহবিলের জন্য টাকা চাইলেন, তখন হাজার হাজার লোক টাকা দিতে আসতে লাগলেন। তাঁরা সব নেতাজীর সামনে কিউ (queue) ক'রে দাঁড়িয়ে একে একে এসে টাকা দিয়ে চলে যেতে লাগলেন। কিউ-য়ে যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা সবাই অবশ্য বেশ মোটা টাকাই দান করছিলেন। হঠাৎ দেখি—একটি নিঃস্ব স্ত্রীলোক বক্তৃতামঞ্চে নেতাজীর দিকে এগিয়ে আসছে। পরণে তার শত ছিন্ন বস্ত্র, মাথায় কাপড় জোটে নি। এ আবার কি করে, দেখবার জন্য আমরা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নেতাজীর কাছে এসে সে তিন টাকার নোট বের ক'রে নেতাজীর হাতে দিতে গেল।...আমরা দেখলাম নেতাজীর কেমন বাধো বাধো লাগছে। তা দেখে সে বল্‌লে,—"নেতাজী, আপনি নিন, এই আমার যথাসর্ব্বস্ব।" নেতাজীর দ্বিধার ভাব তবুও কাটল না, দুই চোখে তার জল ভরে এল। এর পর তিনি হাত বাড়িয়ে তার দান গ্রহণ করলেন।

সভা ভঙ্গ হবার পর আমি নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঐ গরীব স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে তিনি টাকা নিতে দ্বিধা করছিলেন কেন, আর তিনি চোখের জলই বা ফেললেন কেন। নেতাজী উত্তরে বল্‌লেন,—"বড়ই মুস্কিলে পড়েছিলাম আমি; ওর দিকে চেয়েই আমি বুঝেছিলাম—ঐ ওর যথা-

সর্ব্বস্ব, ঐ টাকা আমি নিলে ওর অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে,—আবার না নিলে ও মনে ব্যথা পাবে তাও ভাবছিলাম : দেশের স্বাধীনতার জন্য ওর যা কিছু ছিল সব দিতে এসেছে,—এ প্রত্যাখ্যান করলে ওর মনে বড়ই আঘাত দেওয়া হবে, ও হয়ত ভাব্‌বে বড়লোকদের মোটা মোটা টাকাই কেবল আমি নিচ্ছি। এইসব নানা কথা ভেবে এই দান আমি গ্রহণ করেছি। আমার মনে হচ্ছে—ধনীদের কোটি কোটি টাকা থেকে তাঁরা যে লক্ষ লক্ষ দান করেছেন তার চেয়ে ঐ গরীব মেয়েটির যথাসর্ব্বস্ব তিন টাকার মূল্য অনেক বেশি।

ভয় কাকে বলে নেতাজী তা জানতেন না,—জীবনের কোন প্রকার সুখ-সম্ভোগের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। কোন দৈব শক্তি রক্ষাকবচ দিয়ে যেন তাঁকে ঘিরে রেখে দিয়েছিল,—আমি বহুবার দেখেছি অল্পের জন্য তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। এই সব দেখেছি বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে তিনি মারা গেছেন··· "নেতাজী জিন্দাবাদ"।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনা

১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের কথা। সেদিন নেতাজীর ওখানে আমাদের কয়েকজনের রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। আকাশে চাঁদ,—জোছনায় চারিদিক ছেয়ে গেছে, নেতাজীর ঘরের বারান্দায় বসে আমরা নানা কথাবার্ত্তা বলছি, নেতাজীও প্রসন্নমুখে আমাদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন,—এমন সময় আমাদের একজন তরুণ অফিসার হঠাৎ নেতাজীকে দু'টি প্রশ্ন ক'রে বসলেন। তার একটি হচ্ছে—ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করবার কথা নেতাজীর মনে কি ক'রে এল, আর একটি—মহাত্মা গান্ধী ভারতের বাইরে তাঁর এই সশস্ত্র অভিযানকে কি চোখে দেখবেন? উত্তরে নেতাজী বল্লেন—১৯৩৫ সালের পর কোন বুদ্ধিমান্ লোকেরই বুঝতে বাকি ছিল না যে একটা বিশ্বব্যাপী মহাসমর দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। তাঁর বিশ্বাস—ইংলণ্ড যদি এর সাথে জড়িয়ে পড়ে, ভারতবর্ষকেও সে এর মাঝে টেনে নেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের করা হবে বন্দী—যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের আর মুক্তি নেই।

নেতাজী বল্লেন,—"দেখলাম আমার সামনে মাত্র দু'টি পথ—হয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কারাবরণ—না হয় দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডের শত্রুপক্ষের সঙ্গে মৈত্রী

ক'রে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা।" নেতাজী বলতে লাগলেন—দু'টি পথের কোন্‌টি শ্রেয়, এ নিয়ে তাঁর মনে বিশেষ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং এ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করবার আগে তিনি—জগতের তৎকালীন পরিস্থিতি এবং তাতে ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে যান। তিনি মহাত্মাজীকে বুঝিয়ে বলেন—যতদিন যুদ্ধ চলবে, ততদিন নেতাদের এই ভাবে কারারুদ্ধ থাকার কোন অর্থ হয় না—এর চেয়ে কোন কোন নেতা যদি ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ ক'রে ভারত আক্রমণ করেন তা'হলে হয়ত দেশ স্বাধীন হ'তে পারে। এ যে সম্ভব—গ্যারিবল্ডি এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দৃষ্টান্ত দেখলেই তা বুঝা যায়।

মহাত্মাজী উত্তরে বলেন—ভারতবর্ষ যে এই উপায়ে কোনদিন স্বাধীন হ'তে পারবে, এ তিনি নিজে বিশ্বাস করেন না,—নেতাজী চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন, যদি সফল হ'ন মহাত্মাজীই তাঁকে সর্ব্বাগ্রে অভিনন্দিত করবেন। শুনে নেতাজীর মনে হ'ল—যে পথ অনুসরণ করলে ভারতকে স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'বে বলে তাঁর বিশ্বাস, সে পথে যাত্রার প্রারম্ভেই তিনি মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ লাভ করলেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারম্ভেই নেতাজীকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। এমন যে করা হবে—এ অবশ্য জানা কথা। এখন তাঁর প্রথম সমস্যা হ'ল কি ক'রে এই কারাবাস থেকে উদ্ধার

পাওয়া যায়। কয়েক দিন ভেবে চিন্তে তিনি ঠিক করলেন —এই অন্যায় আটকের প্রতিবাদকল্পে তিনি অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করবেন। একবার এ পথে যাত্রা করলে আর তাঁর পিছিয়ে পড়া চলবে না—এ কথা তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন; সুতরাং ব্রিটিশ সরকার যদি তাঁকে আটক রাখতেই বদ্ধপরিকর হ'ন, তবে যতীন দাসের মত অনশনে মৃত্যু বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। ব্রিটিশের মতিগতিও তাঁর অনেকটা জানা,—তাই তাঁর মনে হ'য়েছিল, এই ভাবে মৃত্যু বরণই হয়ত তাঁকে করতে হবে। ভাগ্যে যা থাকে হ'ক— এই ভেবে তিনি অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ ক'রে দিলেন। প্রথম কয়েক দিন কর্ত্তৃপক্ষ রইলেন একেবারে যেন পাষাণ—মন যে তাঁদের কোন দিন একটু নরম হ'বে তার আভাস পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট এসে নেতাজীকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন—এতে কোন ফল হবে না। কিন্তু নেতাজী সে সব কথায় কর্ণপাত করলেন না। বারো দিন অনশনের পর তাঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হ'য়ে উঠল যে, তা দেখে জেলের কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হ'য়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন। নেতাজী মুক্তি পেয়ে তাঁর পৈতৃক আবাসে ফিরে এলেন। এইবার সুরু হ'ল ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে ব্রিটিশের শত্রু-পক্ষের কোন একটি দেশে যাওয়ার আয়োজন।

বাড়ীর চারিদিকে গোয়েন্দা বিভাগ আর পুলিশের সদা-সতর্ক দৃষ্টি। বে-সরকারী খবরে জানা যায়, পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের বাষট্টি জন লোককে তাঁর উপর দৃষ্টি রাখার জন্য

নিযুক্ত করা হ'য়েছিল। নেতাজী কয়েক দিন তাঁর শোবার ঘরে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন,—তাঁর এক অল্পবয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রী শুধু সেখানে তাঁর খাবার দিয়ে আসত, অন্য কাউকে সেখানে তিনি ঢুকতেই দিতেন না। তাঁর শোবার ঘরও তিনি দুইভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। তার একটায় তিনি ধ্যান-ধারণা করতেন,—অন্যটায় চলত খাওয়া ও শোওয়া। উপাসনার ঘরটা ছেড়ে তিনি প্রায় বেরুতেনই না। অবশেষে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে সবার অলক্ষ্যে কি ক'রে তিনি আফ্‌গানিস্থানে হাজির হলেন, সে কথা এখনও রহস্যাবৃত।

আফ্‌গানিস্থান থেকে—সেখানকার জার্ম্মান-কন্‌সালের সাহায্যে তিনি জার্ম্মানীতে গিয়ে হাজির হ'ন। সেখানে হিটলারের সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি জার্ম্মান-অধিকৃত দেশের ভারতীয় বাসিন্দা ও যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে একটা সৈন্যদল গড়ে তুলবার কথা আলোচনা করেন। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকেই নেতাজী জার্ম্মানীতে আজাদ হিন্দের প্রথম সৈন্যদল গড়ে তোলেন।

সুদূর প্রাচ্যে গ্রেট্ ব্রিটেন আর জাপানের মাঝে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার্লিনস্থ জাপানী রাজদূতের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে অনুরোধ করেন—তিনি যেন টোকিওর জাপানী গবর্ণমেণ্টকে সুদূর প্রাচ্যে অনুরূপ একটা আজাদ হিন্দ সৈন্যদল গড়ে তুলতে বলে পাঠান। ওখানকার এ দল গড়া হবে জাপান-অধিকৃত দেশের ভারতীয় বাসিন্দা আর জাপানীদের হাতে যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে। কথাটা

যথাসময়ে জাপানী সরকারের কানে গেলে তাঁদের ভালই লাগল,—তাঁরা পূর্ব্বএশিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদল গড়ে তুলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

বার্লিনের জাপানী রাজদূত-বিভাগের কর্ম্মচারী মেজর জেনারেল ইয়ামামোতোর (তখন ইনি কর্ণেল ছিলেন) কাছ থেকে নেতাজী খবর পেতে লাগলেন—সুদূর প্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কাজ কেমন অগ্রসর হচ্ছে। শেষে ১৯৪৩ সালের মে মাসের শেষদিকে জাপানী ডুবোজাহাজে চ'ড়ে নেতাজী যখন বার্লিন থেকে পেনাঙে আসেন—মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো তখন তাঁর সঙ্গে আসেন। পরে ইনি হিকারী-কিকন নামক জাপানী মিলন-সঙ্ঘের (Liaison Organisation) অধ্যক্ষ হ'ন।

ভারতের মুক্তিকল্পে স্বাধীন ভারতীয়দের নিয়ে সৈন্যদল গড়ে তোলার কল্পনা এমনি করে নেতাজীর মনেই প্রথম উদিত হয় এবং তিনিই তাকে প্রথমে কার্য্যে পরিণত করেন।

এইবার প্রাচ্যে জেনারেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ কি ক'রে গড়ে উঠে আবার ভেঙ্গে গেল, মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টার মেজর জেনারেল (তখন লেফ্‌ট্. কর্ণেল) জে, কে, ভোঁসলার নেতৃত্বাধীনে দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ আবার কি ক'রে গড়ে উঠল,—নেতাজী এসে কি করলেন,—ব্রহ্ম-যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ কতটা কি করে শেষে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল—সে সব কথা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সূচনা

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা যথাযথ বর্ণনা করবার আগে যে যে কারণে ভারতীয় অফিসার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ এতে যোগদানে ইচ্ছুক হ'ন—তা সংক্ষেপে বলতে চাই।

কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারগণ

ভারতীয় সৈন্যদল ভারতবাসীদের নিয়েই গঠিত হ'বে—এই নীতি প্রবর্ত্তন এবং দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনপ্রার্থী সামরিক শিক্ষার্থীদের এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাদের পদমর্য্যাদা, বেতন, বৃত্তি, আহার ও বাসস্থান প্রভৃতি ভারতীয় সেনাবিভাগের ইংরেজ অফিসারগণের সমানই দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ এ প্রতিশ্রুতির কোনটাই রক্ষা করা হয় নি। কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারদের ভারতীয় ইউনিটের প্লেটুন কমাণ্ডার ক'রে রাখা হ'য়েছে—অথচ নিম্নপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের অ-ভারতীয় ইউনিটের কমাণ্ডার ক'রে দেওয়া হ'য়েছে।

বেতন

কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারদের বেতন সমপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের বেতনের চেয়ে অনেক কম। বেতনের এই তারতম্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠলে উত্তর দেওয়া হয়—ইংরেজ অফিসাররা নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে চাকরি করতে এসেছেন—তাই তাঁদের বেতন একটু বেশী দেওয়া হয়।

কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারেরা মালয়ে এসে বল্লে

বসলেন,—এবার তাঁরাও ত' দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছেন—এবার ইংরেজ অফিসারদের সমান বেতন দেওয়া হ'ক তাঁদের। কিন্তু তাঁদের এ কথায় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করলেন না। কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারেরা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বেতন পেতে থাকলেন, যেমন—যিনি লেফ্‌টেনাণ্ট তাঁর বেতন হ'ল চার শ'—কিন্তু ঐ পদেই একজন ইংরেজ পা'ন প্রায় ছয় শ'। একই ইউনিটে কাজ করেন এমন ভারতীয় ও ইংরেজ এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট ও কোয়ার্টার-মাষ্টারদের বেতনও বিভিন্ন: একজন ইংরেজ যেখানে পা'ন এক শ'—একজন ভারতীয় সেখানে মাত্র ষাট্। ভারতীয় অফিসারদের কম মর্য্যাদা দেওয়া যেন ইংরেজের জিদ। এতে ভারতীয় অফিসারগণের বিরক্ত ও রুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

ক্লাব

মালয়ের অনেক ক্লাবে ভারতীয় অফিসারগণ সভ্য হওয়ার অধিকার পান নি। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষই বিশেষ ক'রে বলতেন—ভারতীয়েরা এসেছেন মালয়-অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে। অধিবাসীদের অনেকে অবশ্য ইউরোপীয়। ভারতীয়েরা এঁদেরও রক্ষক হ'য়ে সেখানে গিয়েছেন,—অথচ রক্ষকদের তাঁদের ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

বর্ণ বৈষম্য

মালয়ে যুক্ত-মালয়-রাজ্যের রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ—কোন এশিয়াবাসী ইউরোপীয় কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে এক

কামরায় যেতে পাবেন না,—এ দুই ব্যক্তি যদি সমপদস্থও হ'ন —তবুও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

ভারতীয় সেপাই

মালয়ে একজন ভারতীয় সেপাইকে বেতন দেওয়া হ'ত মাত্র পঁচিশ টাকা,—কিন্তু সেই একই কাজে একজন ব্রিটিশ-সৈন্য পেত পঁচাত্তরের কাছাকাছি।

যুদ্ধের বেলায় অবশ্য প্রায়ই ভারতীয় সেপাইদেরই থাকতে হ'ত ব্রিটিশসৈন্যের আগে। সুতরাং বেতনের এই বৈষম্য ভারতীয়দের অসন্তোষ ও ক্রোধের কারণ হ'য়ে ওঠে। আর বৈষম্য শুধু বেতনের বেলায়ই নয়—খাদ্য, বাসের ব্যবস্থা, ব্যবহার প্রভৃতি সবকিছুতেই এই তারতম্য লক্ষিত হ'ত। ভারতীয় সেপাইদের মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগত—তাদের প্রতি এই বৈমাত্রেয় ব্যবহার দেখান হয় কেন—ব্রিটিশ টমীর চেয়ে তাদের সাহস ও কার্য্যক্ষমতা ত' একটুও কম নয়?

সাধারণ

বিগত মহাসমরের (১৯৩৯-৪৫) প্রারম্ভে ভারতীয় নেতারা সব এক বাক্যে বল্‌লেন যে, এ যুদ্ধ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—ইংরেজ স্বাধিকার বজায় রাখতে এ যুদ্ধে নামছে; সুতরাং ভারতবর্ষের এ যুদ্ধের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা দাবী করলেন—ভারতীয় সৈন্যদল যেন এ যুদ্ধে যোগদান না করে। কিন্তু এ দাবী নিষ্ফল,—ভারতীয় সৈন্যদলের উপর তাঁদের কোন হাত ছিল না, সুতরাং ইংরেজ

ভারতীয় সেনাকে যখন যেখানে খুশি নিজের কাজে লাগাতে লাগলেন।

ভারতীয় সৈন্যদের কাছে ব্রিটিশ-প্রচারক প্রচার করতে লাগলেন—ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণ থেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষাই এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সরলপ্রাণ ভারতীয় সেপাই প্রথমে এ সব কথাই বিশ্বাস করে; কিন্তু সমুদ্রপথে বিদেশে যুদ্ধ-যাত্রাকালে যখন সে নিজের চোখে দেখলে একজন ইংরেজ সৈনিককে যে সব সুখ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে—তাকে তা দেওয়া হচ্ছে না,—তখন তার মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগল,—যাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—তারাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে—এটা কি ঠিক হচ্ছে? তখন সে বুঝলে— প্রচারকের কথা সবই ভুয়ো, সে ক্রীতদাস মাত্র—যুদ্ধ করতে যাচ্ছে সে তার প্রভুর নিজের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য এবং এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় ক'রে তোলা হবে।

যে সিঙ্গাপুরকে অজেয় অভেদ্য বলে গর্ব্ব করা হ'ত—তারও যখন পতন হ'য়ে গেল—তখন ভারতীয় সৈন্য ভাবতে আরম্ভ করলে—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ যদি তাদের করতেই হয়, তবে নিজের দেশের গণতন্ত্র আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করাই তাদের ভাল। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারতীয় সৈন্যদের অধিকাংশেরই এইরূপ মনোভাব হ'য়েছিল—তাই পরে দলে দলে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে।

এ ছাড়া মালয়ের বিপর্য্যয়কালে—গোরাসৈন্যেরা এশিয়া-

বাসী জাপানীদের হাতে প্রাণ যাওয়ার ভয়ে কেমন করে পালাচ্ছে—তাও তারা স্বচক্ষে দেখেছে,—ফলে ইংরেজকে আগে যে সম্ভ্রমের চোখে দেখত তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। জাতীয় শৌর্য্যহিসাবে তারা যে ইংরেজের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, এ ধারণাও তাদের মনে বদ্ধমূল হ'য়েছে।

মালয়-বিপর্য্যয়

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জাপানীদের কর্ম্মতৎপরতা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা কঠিন ছিল না যে, যুদ্ধ এখানেও আসন্ন, কিন্তু মালয়ের সামরিক এবং অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিরাপত্তার স্বপ্নে মস্‌গুল হ'য়েছিলেন—এই জন্যই মালয় রক্ষার ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারে নি। সৈন্য ও রণসম্ভার কিছুই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা হয় নি। সিঙ্গাপুর পতনের পর মিঃ চার্চ্চহিল পার্লিয়ামেণ্টে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেন,—অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য রণ-রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মালয়কে এক রকম জন ও রণসম্ভার শূন্য ক'রে ফেলা হ'য়েছিল এবং বিশেষ ক'রে বিমান-বাহিনী এখানে একেবারে ছিল না বললেও হয়। সুতরাং যুদ্ধ যখন এল, তখন সবাই একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল এবং আক্রমণ শেষ না হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত কেউই প্রকৃতিস্থ হ'তে পারে নি।

এয়ার-মার্শাল ব্রুকস্ পোফাম ছিলেন মালয়ের ব্রিটিশ সেনা-বিভাগের কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্। তিনি মালয় রক্ষার জন্য

তাঁর বিমানবাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ক'রে মালয়ের বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন করেন। ফলে বেশীর ভাগ মিলিটারী ইউনিটই ঐ সব এরোড্রোম রক্ষা করবার জন্য এধার ওধার ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত ইউনিটগুলিকে জাপানীরা সহজেই পরাজিত করে—ব্রিটিশ কমাণ্ডার জাপানী অগ্রগতি রোধ করবার মত সৈন্যসমাবেশই ক'রে উঠতে পারেন নি। যুদ্ধে সাফল্যলাভ করবার জন্য ব্রুকস্ পোফামের বিরাট্ বিমানবাহিনীর যে সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল কার্য্যকালে তার কিছুই পাওয়া গেল না, ফলে তাঁর পরিকল্পনা হ'ল ব্যর্থ।

ইংরেজদের এরোপ্লেনের অধিকাংশই যুদ্ধের প্রথম দিকেই অকেজো হ'য়ে গিয়েছিল—বাকিগুলি জাপানীরা জমি থেকে উঠতেই দেয় নি। মালয়-যুদ্ধে রাজকীয় বিমানবাহিনী স্থলবাহিনীকে কোন সাহায্যই ক'রে উঠতে পারে নি। যুদ্ধের শেষের দিকে ওখানকার বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রায় ষাটখানা ত্বরিদ্গতি জঙ্গীবিমান সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছায়—কিন্তু ওখানকার যুদ্ধ তখন শেষ হ'য়ে গেছে, সিঙ্গাপুর আত্ম-সমর্পণ করেছে—সুতরাং সে বিমানগুলি বাক্সবন্দী অবস্থতেই জাপানীদের হাতে এসে পড়ে।

এদিকে 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' ও 'রিপাল্স'—এই দুইখানি প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ-জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর নৌবাহিনীও এক রকম অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে,—একমাত্র মারসিং উপকূলে একটি সামান্য সংঘর্ষ ছাড়া মালয়ের আশেপাশে আর কোথাও তাদের কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নি।

মালয়-যুদ্ধে এমনি ক'রে আকাশে ও জলে ইংরেজের সর্ব্বক্ষমতা বিনষ্ট হওয়ায় জাপানীরা যখন যেখানে খুশি জাহাজ থেকে সৈন্য নামিয়ে পশ্চাদপসরণকারী ইংরেজসৈন্যদের ঘেরাও করবার সুযোগ পায়।

মালয়ে জাপানী-আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত স্থল-বাহিনীও ইংরেজদের পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাজোয়া গাড়ীর ইউনিট একটিও ছিল না—জাপানী 'ট্যাঙ্ক' তাই অতি অনায়াসে ওদের প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেদ ক'রে এগিয়ে যেত। ইংরেজ-বাহিনীর অধিকাংশ ইউনিটকে মালয়ে আনবার পর মোটর-বাহিনীতে পরিবর্ত্তিত করা হয়। মোটর চালনায় এরা তেমন দক্ষতা লাভ করতে পারে নি,—তা ছাড়া নতুন ধরণের যে সব যুদ্ধাস্ত্র তাদের দেওয়া হয়, তাও তারা ভাল ক'রে ব্যবহার করতে শেখে নি। প্রতিরোধের তোড়জোড় করতেই এদের অধিকাংশ সময় কেটে গেছে—বড় ইউনিট হ'য়ে যুদ্ধ করা এদের শিক্ষা দেওয়া হয় নি। বনে-জঙ্গলে কি ক'রে লড়তে হয় তা তারা জানে না—সুতরাং রাস্তা ছেড়ে চলাচল করা তাদের একরকম বন্ধ। ওদিকে জাপানীরা বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করতে একেবারে ওস্তাদ—ফলে, জঙ্গলের লড়াইয়ে ব্রিটিশদের তারা একেবারে কোণঠাসা ক'রে রেখেছিল। এমনি ক'রে মালয়ের স্থলবাহিনীকে সুদক্ষ জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে দিনের পর দিন লড়তে হ'য়েছে, কোন রকম সাহায্য বা বিশ্রাম তারা পায় নি,—অথচ জাপানীরা প্রতিদিনই পালটে পালটে নতুন সৈন্যদল পাঠিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সহযোগিতার অভাব

মালয়ে অসামরিক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা সামরিক কর্ম্মচারীদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না,—তারা যেন এদের চক্ষুশূল,—তারা যেন অনধিকারে প্রবেশ করেছে এখানে। সুতরাং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে কোনরূপ সাহায্য করা দূরের কথা—বাধাই দিতেন তাঁরা বেশি। মালয়-যুদ্ধ-কালে প্রায়ই দেখা যেত—সামরিক ট্রেণ আট্‌কা পড়ে গেল। কারণ কি—না, অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারেন নি। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মজুর চেয়েও সময়মত মজুর পেতেন না।

এ ছাড়া বিমানবাহিনী, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর পরস্পরের মধ্যে কোন সহযোগিতা ছিল না। মালয় রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক বিমানবাহিনী স্থলবাহিনীকে কম প্রয়োজনীয় বলে মনে করত—ফলে, স্থলবাহিনী বিমানবাহিনীকে তেমন প্রীতির চোখে দেখত না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবাহিনীর আর পাত্তা পাওয়া গেল না,—স্থল-বাহিনীর লোকজন এইবার তাদের সাহস আর কার্য্যকলাপ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। মালয়ের নৌবাহিনী এমন অকিঞ্চিৎকর যে, তার সাহায্য পাওয়ার জন্য কেউ মাথাই ঘামালেন না। তিন বাহিনীর মাঝে কোন রকম সহযোগিতা না থাকায় জাপানীরা অতি সহজেই 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' আর 'রিপাল্‌স্' জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সমর্থ হ'ল।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই অষ্ট্রেলিয়ান, ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে বিরোধ তীব্র হ'য়ে ওঠে,—এ নিয়ে কখন কখন অস্ত্র-যুদ্ধ পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। যুদ্ধের মধ্যে এই বিদ্বেষ তীব্রতর হ'য়ে ওঠে—ফলে বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে সহযোগিতার পরিবর্ত্তে বিবাদের ভাবই বেশী লক্ষিত হয়।

সু-নেতৃত্বের অভাব

মালয়ে সু-নেতৃত্বেরও বিশেষ অভাব ছিল। জাপানী রক্ষি-নৌবাহিনী যখন সিঙ্গাপুর ও কোটাভারু ধরোধরো করলে—ইংরেজ সামরিক অফিসারেরা তখন সিঙ্গাপুরের আফিসঘরে বসে দিব্যি নিশ্চিন্তে আলোচনা করছেন—'মেটাডোর'-পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনা করা উচিত হবে কি না। এই পরিকল্পনা অবশ্য অনেক আগেকার। এর প্রধান অঙ্গ ছিল—থাইল্যাণ্ডে (শ্যামে) প্রথমেই ইংরেজ-সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া। অনেক যুক্তি-পরামর্শের পর একটা নতুন পরিকল্পনা খাড়া করা হ'ল—'মেটাডোর'-পরিকল্পনার কাছে সেটা একেবারে কিছুইনা বললেই হয়। এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে সব কিছু পণ্ড হ'য়ে গেল।

যুদ্ধের প্রথম কয়েক দিনের ভিতরেই ইংরেজেরা তাঁদের একজন জেনারেল এবং তাঁর অধীনস্থ তিনজন ব্রিগেড-কমাণ্ডারকে বরখাস্ত করেন—এতেও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

১২শ 'ইণ্ডিয়ান ব্রিগেডে'র কমাণ্ডারের দোষেই 'শ্লিম'-নদীর যুদ্ধে পরাজয় ঘটে—তথাপি তাঁকে অন্য একটা ব্রিগেড পরিচালনার ভার দেওয়া হয়।

একটি ব্রিগেড জাপানীগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় ওর কমাণ্ডারের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়—তা' সত্ত্বেও তাঁকে আর একটা ব্রিগেড পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। যথাসময়ে অপসরণের আদেশ দিতে না পারায় তাঁর এ ব্রিগেডও জাপানীদের হাতে পর্য্যুদস্ত হয়। এঁরই দোষে পরে মালয়ে দ্বাবিংশ 'ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্রিগেড' জাপানীদের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিনষ্ট হয়। সিঙ্গাপুরে পৌঁছবার পর অবশ্য এই কমাণ্ডারকে বরখাস্ত করা হয়।

সিঙ্গাপুরের পতন ও ভারতীয়দের মনোভাব

মালয়ে থাকবার সময়েই ভারতীয় সৈন্যেরা দেখেছে—এশিয়ার অন্যদেশবাসীরা তাদের 'ব্রিটিশের প্রহরী কুকুর' বলে ঘৃণা করে। ফলে ভারতীয়েরাও তাদের সঙ্গে ব্যবহারে উদ্ধত ও একটা শ্রেয়োমন্য ভাব পোষণ করত। সিঙ্গাপুরের পতন যদিও বিন্দুমাত্র তাদের দোষে ঘটে নি, তবুও এর পর লজ্জায় তাদের মাথা কাটা যেতে লাগল। যাদের তারা এতদিন ঘৃণার চোখে দেখার ভাণ ক'রে এসেছে তাদের কাছে তারা এবার পরাজিত হীন সৈনিক মাত্র। তাদের সকল গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়ে গেল। বারবার তারা নিজের মনে প্রশ্ন করতে লাগল,—এ অবস্থা আমাদের কেন হ'ল ? উত্তরটা অবশ্য তেমন কঠিন নয়,—তারা

জানত, ব্রিটিশের অক্ষমতাই এর একমাত্র কারণ; সুতরাং ব্রিটিশের পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ করতে এসেই তাদের আজ এই লাঞ্ছনা। এরপর ব্রিটিশের প্রহরী কুকুর হ'য়ে আর লড়বার আগ্রহ যদি তাদের না থাকে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

মালয়ের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদল কোন রকমে বিমানের সাহায্য না পেয়েই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লড়াই করেছে। ব্রিটিশ কমাণ্ডারেরা সিঙ্গাপুরের নিরাপদ দুর্গে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে বার বার নানা ভুল করেছেন, আর ভারতীয় সৈন্যেরা ধীর বিশ্বস্তভাবে তাঁদের আদেশানুযায়ী যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁদের ভুলের ফল ভোগ করেছে।

সুদীর্ঘ বিপৎসঙ্কুল মালয় যুদ্ধের পর তারা জীর্ণ-ক্লান্ত-দেহে সর্ব্বশেষে সিঙ্গাপুরে এল। কিন্তু সর্ব্বশেষে এলে হবে কি—সিঙ্গাপুরে জাপানী আক্রমণের মুখে ঠেলে দেওয়া হ'ল তাদেরই সর্ব্বাগ্রে। এখানেও তারা তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান ক'রে প্রাণপণে লড়েছে, অথচ ঠিক সেই সময়ে তাদের অষ্ট্রেলিয়ান সহকর্ম্মীরা নিজ নিজ জায়গা ফেলে সহরে গিয়ে অন্যান্য অষ্ট্রেলিয়ান কর্ত্তৃক আরব্ধ লুট-তরাজ, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে মত্ত হ'য়ে উঠেছে।

এই বিশ্বস্ততা ও সাহসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মিল্‌ল তাদের ব্রিটিশ কমাণ্ডার জেনারেল পার্সিভ্যালের কাছ থেকে—বিনা সর্ত্তে যখন তিনি জাপানীদের হাতে সিঙ্গাপুর তুলে দিলেন, আর তার সাথে দিলেন ভারতীয় সৈন্যদল।

জাপানীদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় তাদের বলে

দেওয়া হয়—ব্রিটিশদের আদেশ তারা যেমন মেনে চলত ঠিক তেমনি ক'রে জাপানীদের হুকুমও যেন তারা মেনে চলে। এতদিন তারা ব্রিটিশদের কাছে গবাদি পশুর মত বাস ক'রে এসেছে, তাদের জন্য অকুণ্ঠচিত্তে দেহের রক্তপাত ক'রেছে—সেই ব্রিটিশেরা যখন তাদের এমনি ক'রে ত্যাগ ক'রে গেল, তখন তারা নিজেদের বড় অসহায় বোধ করতে লাগল।

সুদক্ষ ইংরেজ প্রচারকের মুখে শ্বেতকায় জাতির শ্রেষ্ঠতা ও অপরাজেয়তার কথা শুনে শুনে ভারতীয় সৈনিকদের অনেকের কেমন সে কথায় বিশ্বাস হ'য়ে গিয়েছিল। তারা ভাব্‌ত—সাহেবরা কোন ভুল করে না। মালয়ের যুদ্ধে তারা যখন দেখলে—সেই সাহেবরাই প্রাণভয়ে কেমন পালাচ্ছে, তখন তাদের শ্রেষ্ঠতা, মর্য্যাদা সম্বন্ধে এদের বিশ্বাস একেবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল; অফিসারশ্রেণীর সাহেবরা তাঁদের জাত-ভাইদের দিকেও ফিরে তাকান নি। যুদ্ধে অফিসারদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—সৈন্যদের সঙ্গে থেকে পরিচালনা করা; কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁরা জাপানীদের হাতে জীবিত-বন্দী হবার ভয়ে এমন ভীত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা সর্ব্বদাই ভারতীয় সৈন্যদের পিছনে আত্মগোপন ক'রে থাকতেন। এরূপ ভয় পাবার কারণও অবশ্য যথেষ্ট ছিল।

জাপানীরা ব্রিটিশদের ভয় দেখানো ও দমাবার জন্যে এমন কতকগুলি কাজ করত—আধুনিক সভ্যসমাজের বিচারে পাশবিক ছাড়া যার অন্য আখ্যা নাই। ধৃত বন্দীদের গাছের সঙ্গে বেঁধে তাদের সহকর্ম্মীদের সামনে

একে একে সঙ্গিন দিয়ে খোঁচান হ'ত—অনেক সময় ব্রিটিশ অফিসারকে সঙ্গিনের খোঁচা দিতে ডাকা হ'ত তাঁরই অধীনের ভারতীয় সৈনিককে। যে সব ভারতীয় সৈনিক এ কার্য্যে সম্মত না হ'ত—জাপানীদের হাতে তারাই সঙ্গিনের খোঁচা খেত। জাপানী সৈন্যেরা এ সব কাজে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করত—এ তাদের একরকম চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল। গাছে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় যে সব ইংরেজ কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করছে এইবার তাদের সঙ্গিনের খোঁচা খাওয়ার পালা আসবে বলে—তাদের অনেককে আবার জাপানীরা ছেড়ে দিত ; উদ্দেশ্য—ওরা নিজের নিজের দলে ফিরে গিয়ে এই সব নিষ্ঠুর আচরণের গল্প করবে তাদের কাছে, ফলে ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের মন যাবে দমে।

ভারতীয়দের সঙ্গে কিন্তু জাপানীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করত। ভারতীয় সৈন্যদের বন্দী অবস্থায় আনা হ'লে জাপানীরা হয় তাদের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত, না হয় তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে বলত—তারা ইচ্ছা করলে তাদের কাছে থাকতে পারে অথবা ব্রিটিশের দলে ফিরে যেতে পারে। বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের তারা বলত—ওরা তাদের ভাই, শত্রু নয়। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যই জাপানীরা যুদ্ধ করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হ'য়েছিল, তারা জাপানীদের হাতে ভাল ব্যবহারই পেয়েছিল—ফলে দলে দলে ভারতীয় সৈন্য এসে জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

সুদূর প্রাচ্যে জাপানীরা এত সহজে এবং দ্রুত ব্রিটিশদের হারিয়ে দিতে লাগল যে, তা' দেখে ভারতীয়দের মন থেকে ব্রিটিশ-ক্ষমতার উপর আস্থা একেবারে তিরোহিত হ'ল। ভারতীয়দের মনে হ'তে লাগল—যুদ্ধে জাপানীরাই শেষে ব্রিটিশদের হারিয়ে দেবে। মালয়ে এশিয়াবাসী অ-সামরিক লোকেরাও এই ধারণাই পোষণ করতে লাগলেন। এর আগে ইংরেজেরা ওখানে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের গর্ব্ব ক'রে বেড়াতেন এবং বলতেন—জাপানী আক্রমণ থেকে এ দেশ তাঁরা রক্ষা করবেনই; কিন্তু মালয়ের বিপর্য্যয়ে তাঁদের সকল জারিজুরি ভেঙে গেল।

মালয়ে যখন যুদ্ধ চলছিল—সিঙ্গাপুর হ'য়ে উঠেছিল তখন কর্ম্মহীন ব্রিগেডিয়ার ও কম্যাণ্ডিং অফিসারদের আড্ডাখানা। নিজের নিজের হেড কোয়ার্টার্সে বসে তাঁরা অলস জীবন যাপন করছিলেন, আর তাঁদেরই সৈন্যদল তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাঁদের মূর্খতার মূল্য দিচ্ছিল।

মালয়-যুদ্ধে ব্রিটিশ-নেতৃত্বের ইতিহাস সত্যই কলঙ্কের ইতিহাস। নেতাদের বুদ্ধির দোষেই মালয়ে এই বিপর্য্যয়।

রবার বাগানে যেখানে সৈন্যদের শিবির সন্নিবেশ করা হয় সেখানে সারাদিন তারা কেবল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত থাকত। মাটি খুঁড়ে কাঁটা তার খাটিয়ে মজবুত আত্মরক্ষার আশ্রয় গড়ে তুললেই অথবা 'পিলবক্স' তৈরী করলেই জাপানীরা আর তা' ভেদ ক'রতে পারবে না—এই ছিল তাদের বিশ্বাস। কেবল আত্মরক্ষা আর আত্মরক্ষা।

এই চিন্তা ক'রে ক'রে তাদের দ্রুত চলাফেরা বা বিক্রম দেখিয়ে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল—জাপানীরা তাই সহজেই ইংরেজের আত্মরক্ষা-লাইনের ফাঁক দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে এসে ঘেরাও ক'রেছে।

ব্রিটিশপক্ষের সৈন্যেরা প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে যে আত্মরক্ষার আয়োজন ক'রেছিল—তাদের বিশ্বাস ছিল, সে আয়োজন ব্যর্থ হবে না; কিন্তু জাপানীরা তাদের সে সবই ভণ্ডুল ক'রে দিলে। অস্ত্র দিয়ে লোকে যেমনি সহজে কচুগাছ কাটে—ঠিক তেমনি সহজে জাপানীদের ওদের ব্যূহ ভেদ করতে দেখে ওদের মন একেবারে দমে গেল। এর উপর ওদের আরও বেশী ভয় ছিল—ওদের কম্যাণ্ডাররাই হয়ত ওদের একেবারে ডুবিয়ে দিতে পারে। তাঁরা অবশ্য দূরে থেকে বুঝতেই পারতেন না—তাঁদের বিশৃঙ্খল পরিচালনার কি বিষময় ফল হচ্ছে, কিন্তু সৈন্যেরা বুঝত। তারা বুঝত—পরিচালনা সবদিকেই ভুল পথে চলেছে। বৃথা পাল্টা-আক্রমণ চালাতে গিয়ে শত শত প্রাণ বিনষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষ থেকে কোনরূপ বাধা না পেয়েও বারবার নিরাপদ ঘাঁটি থেকে সরে সরে যেতে হচ্ছে। দীর্ঘপথ অতিক্রম ও অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ক'রে একেই তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল—তার পর আবার সর্ব্বদা শত্রু-বিমান-আক্রমণের ভয়। প্রথমেই ভেঙ্গে পড়লেন ব্রিটিশ অফিসারেরা—জাপানীদের হাতে জীবিত-বন্দী হবার ভয়ে। অফিসারদের এই অবস্থা দেখে সৈন্যদের মনের বল একেবারে লোপ পেল। মনের বল হারিয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে

পড়ল, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে শত্রু-আক্রমণে বাধা দেবার শক্তি আর তাদের রইল না—এই জন্যই একলক্ষ ব্রিটিশ সৈন্যকে সিঙ্গাপুরে ত্রিশ হাজার জাপানী সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন

ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বোস জাপানী দেশপ্রেমিক মিঃ তোয়ামার পৃষ্ঠপোষকতায় বহুকাল জাপানে বাস ক'রে আসছিলেন। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুকাল পরেই তিনি জাপানী সৈন্যদলের 'ইম্পিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফে'র অধ্যক্ষ ফীল্ড-মার্শাল সুগিয়ামার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লেন—বর্ত্তমান মহাসমর ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষ উদ্ধার করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ। তাঁর (ফীল্ড-মার্শাল সুগিয়ামার) সাহায্য পেলে ভারতীয়েরা পূর্ব্ব-এশিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে পূর্ব্বদিক্ থেকে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে। রাসবিহারী তাঁর কাছে এই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি 'জেনারেল ষ্টাফ'কে আরও অনুরোধ জানালেন—তাঁরা যেন জাপানী সৈন্য-বাহিনীকে এই মর্ম্মে এক আদেশ দেন, যাতে তারা জাপান-অধিকৃত প্রদেশে ভারতীয়দের শত্রু-প্রজাবৎ না দেখে। সুগিয়ামা রাসবিহারীর প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারেন নি। তিনি বলেন—ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশেরা এখন জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধরত, সুতরাং ভারতীয়দের শত্রু-প্রজাবৎ মনে করাই স্বাভাবিক।

মিঃ বোস তখন ডেপুটি ওয়ার-মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললে তিনি মিঃ বোসের প্রস্তাবে রাজী হ'লেন। ফলে মিঃ রাসবিহারী বোসের

অধিনায়কতায় সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ (Indian Independence League) নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

জাপানীরা থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) অধিকার করবার পর স্বামী সত্যানন্দ পুরী কয়েকজন ভারতীয় নেতার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ব্যাঙ্ককে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। জাপানী সৈন্যদল মালয় যাত্রা করলে—এর কয়েকজন প্রতিনিধি তাদের সঙ্গে গিয়ে স্থানীয় ভারতীয় নেতাদের অধিনায়কতায় বিভিন্ন স্থানে এই সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের শাখা পূর্ব্ব-এশিয়ার সর্ব্বত্র, যথা—ফিলিপাইনস্, থাইল্যাণ্ড, ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিস্, ফরাসী ইন্দোচীন, সাংহাই, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশে স্থাপিত হয়। এ সকল শাখাই মিঃ রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীন ভারতের কর্ত্তৃত্ব মেনে চলত।

পূর্ব্ব-এশিয়ায় এইসব শাখা স্থাপন ক'রে রাসবিহারী খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। জাপানীরা যে যে দেশ অধিকার করত, সেই সেই দেশেই লুঠ ও নারীধর্ষণ চালাত। যে সব লোকদের তারা শত্রু-প্রজা-পর্য্যায়ে ফেলত তাদের উপরই জাপানীদের এই পৈশাচিক লীলা সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপীয়ান, ইউরেশিয়ান ও চীনেরাই এদের হাতে বেশী লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। কিন্তু জাপানীরা এমন পৈশাচিক ব্যবহার করলেও কোনদিন ভারতীয় নারীর সম্ভ্রমহানি

করে নি। অনেক ইউরেশিয়ান ও চীনে মেয়ে তাই সাড়ী বা "দোপাট্টা" প'রে নিজেদের ভারতীয় ব'লে চালিয়ে জাপানীদের অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। খুব সম্ভব উপরওয়ালাদের কাছ থেকে ভারতীয় নারীদের সম্ভ্রমহানি না করবার জন্য কোন নির্দ্দেশ পেয়ে থাকবে তারা। জাপানী সৈন্যদের দোষ-ত্রুটি অনেক থাকা সত্ত্বেও সৈন্য হিসাবে তারা খুব ভাল: তারা তাদের উপরওয়ালাদের আদেশ বিশ্বস্তভাবে মেনে চলে। প্রায়ই দেখা যেত, জাপানী সৈন্যেরা ভারতীয়দের গৃহে গিয়ে গৃহবাসীদের সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করছে। এদের অনেকেই অবশ্য নিজেদের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে জানে না, তবু তারা ভারতীয় দেখলেই তার কাছে গিয়ে বলত—"গান্ধী কা?" ওরা এর দ্বারা কি বলতে চায় প্রথম প্রথম বুঝতাম না আমরা, পরে বুঝলাম—এর দ্বারা ওরা জানতে চায়—'তুমি মহাত্মা গান্ধীর দলের কি না?' উত্তরে 'হাঁ' বললে ওরা খুশি হ'য়ে করমর্দ্দন অথবা নমস্কার ক'রে চলে যেত।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং

ইনি ছিলেন চতুর্দ্দশ পঞ্জাব রেজিমেণ্টের ফার্ষ্ট ব্যাটেলিয়ানের অফিসার। এই ব্যাটেলিয়ানটি ১৯৪১ সাল থেকে উত্তর মালয়ের যিত্রা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাটেলিয়ানটি যুদ্ধে প্রেরিত হ'লে তিনি নিজে, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আকরাম খাঁ এবং কম্যাণ্ডিং

অফিসার লেফ্‌ট, কর্ণেল এল, ভি, ফিজপ্যাট্রিক প্রভৃতি কয়েকজন অফিসার মূল ব্যাটেলিয়ান থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েন। কম্যাণ্ডিং অফিসার যুদ্ধে আহত হ'য়ে চলতে অশক্ত হ'য়ে পড়েন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আকরাম খাঁ তাঁকে কয়েকদিন মালয়ের ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পথে বহন ক'রে নিয়ে চলেন। অবশেষে তাঁরা অর্ল ষ্টারের একটি মস্‌জিদে আশ্রয় পান। ইত্যবসরে জাপানী সাজোয়া বাহিনী ও সাইকেল আরোহী সৈন্যদল বনজঙ্গল ভেঙে প্রায় সিঙ্গাপুরে এসে পড়ে।

অর্ল ষ্টারে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর মিঃ প্রীতম্‌ সিং নামক একজন শিখ-বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা হয়। ইনি ব্যাঙ্ককের ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের নির্দ্দেশে জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিলেন। এই সময়েই ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গেও পরিচয় হয়—ইনি জাপানের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার, নাম মেজর ফুজিয়ারা। মেজর ফুজিয়ারা ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্য হ'তে বলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ক্যাপ্টেন মোহন সিং ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দিয়ে জাপানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হ'ন।

ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে দলে টান্‌বার আগেই জাপানীরা ক্যাপ্টেন পট্টনায়ক নামক একজন অফিসারকে পাকড়াও করে। ইনি 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে' কাজ করতেন।

জাপানীরা এঁর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য ভারতীয় লোক নিয়ে যে একটা ফৌজ গড়বার প্রয়োজনীয়তা আছে—এ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে এঁকে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ করে। ক্যাপ্টেন পট্টনায়ক জানান —তিনি চিকিৎসাব্যবসায়ী লোক, এসব ব্যাপারে আসতে পারবেন না। তাঁর দেশপ্রীতির অভাব দেখে জাপানীরা তাঁকে রীতিমত কীল-চড় লাগায়।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং দেখ্‌লেন—ভারতীয়দের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তা' ছাড়া মালয়ের ভারতীয় অধিবাসীদের তাদের সাহেব প্রভুরা বিপদের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই শ্রেয়, তাতে অনেক ভারতীয়ের প্রাণরক্ষা হবে—তা' ছাড়া মালয়ের অ-সামরিক ভারতীয়েরাও নিরাপদে থাকতে পারবে। এইসব চিন্তা ক'রে ভারতীয় সৈন্যদলের কতকগুলি লোক ও কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে তিনি নিজের নেতৃত্বে একটা ছোট দল গড়ে তুল্‌লেন। এই দলের নাম রাখা হ'ল "ফুজিয়ারা কিকন"। এর স্বেচ্ছাসেবকেরা জাপানী সৈন্যদলের সাথে এগিয়ে গিয়ে ভারতীয় সেনা-সংগ্রহে সাহায্য করত—তা' ছাড়া অ-সামরিক ভারতীয়দের খাদ্য সরবরাহ, আহত রুগ্নদের সেবা প্রভৃতি কাজে তারা সাহায্য করত। যে সব আহত সৈনিক অশক্ত হ'য়ে,—দল এগিয়ে গেলে পিছনে রাস্তায় বনে-জঙ্গলে পড়ে থাকত—তাদেরও কুড়িয়ে আনত এরা।

কুয়েলা লামপুর সহরে ভারতীয় সৈন্য-সংগ্রহের একটা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখানে একটা শিবির ক'রে প্রায় পাঁচ হাজার ভারতীয় সৈনিককে একত্র করা হয়। স্থানীয় ভারতীয় অ-সামরিক লোকেরা এদের খাবার ও ওষুধ যোগাতেন। খাবার ও ওষুধ যোগানোর ব্যাপারে জাপানীদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পাওয়া যেত না। ভারতীয় সৈন্যদের সকল ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হ'ত। পরিত্যক্ত ব্রিটিশ শিবিরে এবং অ-সামরিক ভারতীয় লোকদের বাড়ীতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাঠান হ'ত—খাবার ও ওষুধ সংগ্রহ করতে। কুয়েলা লামপুরে ভারতীয় বন্দীদের দিনগুলি তেমন ভাল কাটে নি, কোন রকমে তারা দু'টি খেয়ে বেঁচে ছিল—এই পর্য্যন্ত। এই দুর্দ্দিনে ১।১৩শ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রাইফেলসের ক্যাপ্টেন মহবুব আহম্মদ ও আই, এম্, এস, ক্যাপ্টেন তালিবুদ্দিন দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে ভারতীয় সৈন্যদের জন্য খাবার, জামা কাপড় ও ওষুধ সংগ্রহ ক'রে আন্‌তেন—তাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে একটা হাসপাতালও তাঁরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অ-সামরিকদের তরফ থেকে বুধ সিং নামে এক ভদ্রলোক ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যের জন্য দিবারাত্র খাটতেন। দুর্গত ভারতীয়দের জন্য বেশী সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল নিম্নশ্রেণীর গরীব কুলী-মজুরদের কাছ থেকে।

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি কুয়েলা লামপুর শিবিরে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ভারতীয় সৈন্যদের কাছে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,—মালয় এবং অন্যান্য স্থানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ (ভারতীয় জাতীয় বাহিনী) নামে একটি ফৌজ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই ফৌজের আসল কাজ হবে—ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা। তিনি জানান—ব্রিটিশ-কবল থেকে ভারত-বর্ষকে মুক্ত করতে জাপানীরা তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অতঃপর মোহন সিং তাদের কাছে দুইটি দল গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এর একদল মালয়ে থেকে যুদ্ধ করবে—আর এক দল যাবে ব্রহ্মদেশে লড়তে। মোহন সিং-এর প্রস্তাবমত দুইটি দলই গড়ে ওঠে। এর প্রত্যেকটিতে দু'শ ক'রে সৈন্য ছিল। মালয় এবং ব্রহ্মদেশেই এরা যুদ্ধ করে। যে দল মালয়ে লড়তে যায় তার নেতা ছিলেন—দ্বাবিংশ মাউন্টেড্ রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন আল্লাহ্ দিত্তা খাঁ। সিঙ্গাপুরে যে সব সৈন্যদল প্রথমে লড়তে যায়—ক্যাপ্টেন আল্লাহ্ দিত্তার দল তার মধ্যে একটি। ব্রহ্মদেশে যে দল যুদ্ধ করতে যায় তার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন—৪/১৯শ হায়দরাবাদ রেজিমেণ্টের মেজর রামস্বরূপ। সাহসী ও কৌশলী নেতা হিসাবে রামস্বরূপের খুব নাম ছিল। তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাপানীদের

সাহায্যে অনেক ভারতীয় সৈন্যের প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে ব্রহ্মদেশের অ-সামরিক ভারতীয়েরা জাপানীদের কাছে সদ্ব্যবহার পায়।

কুয়েলা লামপুর শিবিরে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে দেশপ্রীতি ও জাতীয়তার ভাব জাগিয়ে তুলতে মাঝে মাঝে বক্তৃতা ও নাটকাদির অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হ'ত। বর্ণ, শ্রেণী ও ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য এখানে তুলে দেওয়া হ'য়েছিল। সবাই একসঙ্গে থাকত—একসাথে খাওয়া দাওয়া করত।

সিঙ্গাপুরের পতন

সিঙ্গাপুরের সঙ্গে প্রধান ভূখণ্ডের যোগ-বর্ত্ম 'জোহোর কজ-ওয়ে' ব্রিটিশেরা ১৯৪২ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ভেঙে ফেলে। ভাঙার আগেই অবশ্য সৈন্যদলগুলিকে দ্বীপে সরিয়ে আনা হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যদলগুলি মালয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লড়ে এসেছে। তাদের দেহ ও মন দুই-ই ক্লান্ত। দ্বীপে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপর হুকুম এল—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে: দ্বীপ রক্ষা করতে হবে তাদের। শুনে তাদের গা জ্বালা করতে লাগল—কারণ, কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মালয়-যুদ্ধের পর তাদের যথেষ্ট বিশ্রাম দেওয়া হবে এবং দলে আরও নতুন সৈন্য নেওয়া হবে। সে সব কিছুই হ'ল না দেখে তাদের মন দমে গেল। সামরিক ও অ-সামরিক

কর্ম্মচারীর সর্ব্ব-উচ্চশ্রেণী থেকে আরম্ভ ক'রে সর্ব্ব-নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত কোন লোকেই আর মনে বল পাচ্ছিলেন না।

সকল এশিয়াবাসীর মনেই ধারণা হ'ল—ব্রিটিশেরা কেবল তাদের ফাঁকি দিচ্ছে। অ-সামরিক এশিয়াবাসীদের যে ব্রিটিশেরা যথাসময়ে মালয় থেকে অপসারিত করে নি—একথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এরপর আবার সবার মনেই ধারণা—ব্রিটিশেরা এশিয়াবাসীদের কাউকেই আর বিশ্বাস করে না, তারা মনে করে প্রত্যেক এশিয়াবাসীই জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

জাপানীরা ১৯৪২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রথমে এখানে প্রবেশ করে এবং সপ্তাহকালব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রিটিশবাহিনী জাপানীবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

আত্মসমর্পণ ও ফারের পার্কে ভারতীয়দের একত্র সমাবেশ

১৯৪২ সালের ১৫-১৬ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রে হুকুম এল—কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার থেকে আরম্ভ ক'রে নিম্নতম সৈনিক পর্য্যন্ত—ভারতীয় সবাইকেই ফারের পার্কে একত্র সমবেত হ'তে হবে—ব্রিটিশদের সবাইকে গিয়ে মিলিত হ'তে হবে চাঙ্গিতে। আমরা সবাই (বিশেষ ক'রে অফিসারেরা) এই হুকুম শুনে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—কারণ, যুদ্ধের আইন অনুসারে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভারতীয় ও ব্রিটিশের মধ্যে কোন তারতম্য না ক'রে যুদ্ধ-বন্দী সকল

অফিসারকেই একস্থানে ও সাধারণ সৈনিকদের অন্যস্থানে রাখ্‌বার কথা। জাপানীদের নিষ্ঠুর আচরণের কথা আমরা আগেই শুনেছি। এইবার মনে হ'তে লাগল—আমাদের জাপানীর হাতে নির্য্যাতন ভোগ করতে ফেলে রেখে ওঁরা সরে পড়ছেন।

পরদিন ভোরে আমরা মার্চ্চ ক'রে ফারের পার্কের দিকে রওনা হ'ব—এমন সময় মেজর ম্যাকাডাম আরও কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসারকে নিয়ে আমাদের বিদায় দিতে এলেন। আমার সঙ্গে করমর্দ্দনের সময় তিনি বল্‌লেন—"এই বোধ হয় আমাদের পৃথক্ পৃথক্ পথে যাত্রা সুরু।" তাঁর এ কথার অর্থ তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নি—কারণ, জাপানীদের মনের ভাব আমরা তখন পর্য্যন্ত কিছুই জানি না, অথচ তিনি বোধ হয় সব কিছু জেনেই এ কথা বলেছিলেন। তখন পর্য্যন্ত আমাদের অনেকেই মালয়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কার্য্যকলাপ অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়বার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন কিছুই জানতেন না। উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারেরা হয়ত সব কিছুরই খবর রাখতেন, কিন্তু এসব কথা তাঁরা একান্ত গোপন রেখেছিলেন। সুতরাং আমরা যখন ফারের পার্কে গিয়ে সমবেত হ'লাম তখন পর্য্যন্ত আমরা অনুমান করতে পারি নি—সেখানে গিয়ে আমাদের ভাগ্যে কি ঘট্‌বে।

হস্তান্তরকরণ

১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা ফারের পার্কে সমবেত হ'লে মালয়ের ব্রিটিশ মিলিটারী হেড্‌কোয়ার্টার্সের ষ্টাফ অফিসার লেফ্‌ট, কর্ণেল হাণ্ট—মেজর ফুজিয়ারা, কর্ণেল এন্‌, এস্‌, গিল, ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সামনের একটা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সেখানে সব অফিসারদের একত্র ক'রে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে লেফ্‌ট, কর্ণেল হাণ্ট একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বল্‌লেন—"আজ থেকে আমরা সবাই যুদ্ধ-বন্দী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে আজ আমি আপনাদের সকলকে জাপানী গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দিচ্ছি —আগে আমাদের হুকুম আপনারা যেমন মেনে চলতেন এখন থেকে তেমনি এঁদের হুকুম মেনে চলবেন। অন্যথা করলে শাস্তি পেতে হবে আপনাদের।" এরপর আমাদের সবাইকে 'অ্যাটেনশান' অবস্থায় দাঁড় করিয়ে সৈন্যদের নাম ও 'রোল'-লেখা কতকগুলি কাগজপত্র তিনি জাপানের প্রতিনিধি মেজর ফুজিয়ারার হাতে তুলে দিলেন। মেজর ফুজিয়ারা আবার আমাদের 'অ্যাটেনশান' অবস্থায় দাঁড় করিয়ে বল্‌লেন—"জাপানী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রহণ করছি এবং গ্রহণ করবার পর আমি আপনাদের সবাইকে সর্ব্বাধিনায়কের

(G.O.C.) হাতে তুলে দিচ্ছি। এখন থেকে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর আদেশ মেনে চলবেন আপনারা,—তিনিই আপনাদের হর্ত্তাকর্ত্তা।"

আমরা সবাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম—এইসব ব্যাপার তাঁর চোখের সামনে ঘটতে দেখে তাঁর মুখের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না। না, বাইরে দেখে তাঁর মনের ভাব কিছুই বুঝবার উপায় নেই। তাঁর ভাব দেখে মনে হয়—এই ব্যবস্থায় তিনি বেশ খুশিই হ'য়েছেন। মোহন সিং নিজেও একজন যুদ্ধ-বন্দী—তাঁরই হাতে অন্যান্য যুদ্ধ-বন্দীদের তুলে দেওয়া যে বে-আইনী এ নিয়ে তিনি কোনও প্রতিবাদ করলেন না। হয়ত ভারতীয়দের নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থাই তাঁর এ সময়ে ছিল না—তিনি হয়ত ভাবছিলেন ছাঙ্গির ব্রিটিশ বন্দী-শিবিরে গিয়ে তাঁর নিজের ভাগ্যে কি ঘটবে। এরপর তিনি বারান্দা থেকে সরে গেলেন। তখন মেজর ফুজিরারা জাপানী ভাষায় এক বক্তৃতা দিলেন—একজন জাপানী অফিসার তা' ইংরেজী ক'রে শুনালেন—আর হিন্দুস্থানী ক'রে শুনালেন কর্ণেল গিল।

মেজর ফুজিয়ারা তাঁর বক্তৃতায় বল্‌লেন—"এশিয়ার যে সকল জাতি এই দীর্ঘকাল ধ'রে নিষ্ঠুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদতলে দলিত হচ্ছে তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যেই জাপানের এই সমরাভিযান। জাপান এশিয়াবাসীর মুক্তিদাতা সুহৃদ্। পূর্ব্বএশিয়ায় জাপান এক নতুন তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই নতুন তন্ত্র পূর্ব্বএশিয়ার প্রত্যেক দেশকেই সমভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে—সব জাতির মাঝে আনবে সাম্য ও স্বাধীনতা—সবার উন্নতির জন্য আনবে পরস্পরের সহ-যোগিতা। এশিয়ার স্বাধীনতা ও বিশ্বের শান্তির জন্যই চাই ভারতের স্বাধীনতা। ভারতীয়দের নিজের দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টা ভারতীয়দেরই করতে হবে—তাদের এই অভীষ্ট লাভের চেষ্টায় জাপান সর্ব্বপ্রকারে তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

এরপর ক্যাপ্টেন মোহন সিং মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন,—"ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, ভারতীয় সৈন্যেরা নাকি মালয়ে ভাল যুদ্ধ করতে পারে নি। কিন্তু জাপানীর মত শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযোগী আধুনিক রণসজ্জা, রক্ষী-বিমানবাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে দেওয়া হয় নাই। ব্রিটিশদের মালয় এবং সিঙ্গাপুরে পরাজয় ঘটেছে ব্রিটিশদেরই দোষে—ভারতীয়দের দোষে নয়। ভারতীয়েরা ভাল যুদ্ধই করেছে—চিরকালই করে।...প্রাচ্যে ব্রিটিশ উৎপীড়নের আয়ু শেষ হ'য়ে এসেছে, তাদের ঘৃণ্য শাসনের এবার অবসান ঘটবে। জাপানী সশস্ত্র বাহিনী তাদের সিঙ্গাপুর আর মালয় থেকে তাড়িয়েছে, —ব্রিটিশ এবার দ্রুত পশ্চাদপসরণ ক'রে ব্রহ্মদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। ভারত স্বাধীন হ'তে আর বেশী দেরী নেই। যে সব দানব এতদিন ধরে ভারতীয়দের হৃদয়-শোণিত

শোষণ ক'রে আসছে—ভারতীয়দের কর্ত্তব্য হবে সেই সব নরপিশাচকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বপ্ন সফল করতে জাপানীরা সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করবেন—প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—আমাদের চল্লিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে যুদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যেই সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় সৈন্য ও অ-সামরিক ভারতীয়দের মধ্য থেকে লোক নিয়ে আমরা একটা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে তুলব।"

শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর এই বক্তৃতার দুই রকম ক্রিয়া লক্ষিত হ'ল। একদল বক্তৃতা শুনে উচ্চকণ্ঠে 'ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ' বলে হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল,—তারা যে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করতে রাজী—সে কথা তারা হাত তুলে জানাল। আত্মমর্য্যাদাশীল ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশের প্রতি একটা সহজাত ঘৃণার ভাব আছে—এই হর্ষধ্বনির মূলে হয়ত সে ভাবটা কিছু কাজ ক'রেছে ; কিন্তু এ ছাড়াও হয়ত অন্য কারণ ছিল : যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি জাপানীরা অমানুষিক অত্যাচার করে—এই কথাই এতদিন ভারতীয়েরা শুনে এসেছে, কিন্তু আজ জাপানীরা নিজের মুখেই বল্‌লে—ভারতবাসী তাদের ভাই এবং ভাইয়ের মত ব্যবহারই তারা পাবে জাপানীদের হাতে—শত্রুর মত নয় বা শত্রুপক্ষের পরাজিত সৈন্যের মত নয়। এ কথায় তাদের মনে একটা স্বস্তি বা হর্ষের ভাব আসা অস্বাভাবিক নয়।

ফারের পার্কে সমবেত বেশীর ভাগ ভারতীয় সৈন্য কিন্তু ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর বক্তৃতায় বিশেষ উৎসাহ পাইলেন না। তাঁদের মনে হ'তে লাগল—জাপানীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া মানে নিজেদেরই আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিশেষ ক'রে অফিসার শ্রেণীর লোকেরা ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কথায় সায় একেবারে দিতে পারলেন না। এই বক্তৃতা শুনে আমরা একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদেরই স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া—একটা নিছক পাগলামি বলে আমাদের মনে হ'তে লাগল। গবাদি পশুদের যেমন হস্তান্তরিত করা হয়—তেমনি ক'রে ব্রিটিশদের হাত থেকে জাপানীদের হাতে, জাপানীদের হাত থেকে আবার ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে এসে আমরা কয়েকজন অফিসার নিজেদের বড় অসহায় মনে করতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন মোহন সিং অবশ্য এরপরে নেতৃত্বে যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়েছেন এবং তাঁর ব্যবহারও ছিল অকপট—সেইজন্য আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, তা' সত্ত্বেও যখনকার কথা বলছি তখন তাঁকে আমি একজন কার্য্যকুশল সাধারণ অফিসার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি নি, তাঁর সাথে পরিচয়ও আমার দীর্ঘ দশ বছরের। এমনি একটা লোকের হাতে আমাদের তুলে দেওয়া হ'ল, তাঁকে আমাদের সর্ব্বময় হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ক'রে দেওয়া হ'ল এতে আমরা জাপানীদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠলাম—কারণ, ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের ভিতরে কর্ণেল

গিল, কর্ণেল ভোসঁলা, মেজর মেহ্‌তাব সিং এবং মেজর ভগতের ন্যায় অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন। সেনাবিভাগের অফিসার হিসাবে এঁদের ১৫।২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা, অথচ ক্যাপ্টেন মোহন সিং ৮।৯ বৎসর মাত্র অফিসার হ'য়েছেন।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কতটা যোগ্যতা আছে তা' আমার বেশ ভাল ক'রে জানা ছিল, তাই আমার মনে হ'তে লাগল—তিনি জাপানীদের সঙ্গে তাদের কূট চালে এঁটে উঠতে পারবেন না; ফলে তারা আমাদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রে নেবে। সুতরাং আমি দৃঢ়সঙ্কল্প করলাম—আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। একান্ত ব্যর্থতা ও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েও বংশপরম্পরাগত রাজানুগত্যের সংস্কারে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দেওয়াই আমি সাব্যস্ত করলাম—শুধু তাই নয়, বিখ্যাত এক সামরিক উপজাতির নেতা হিসাবে অন্যান্য সবাইকেও এতে যোগদান করতে নিষেধ করা আমি আমার কর্ত্তব্য বলে মনে করলাম—বিশেষ করে যে সকল সৈন্যকে আমি পরিচালনা করেছি আর যে সব লোক আমারই প্রদেশ থেকে এসেছে—তাদেরকে।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষ ভারতীয় সেনাদলে কাজ ক'রে এসেছেন, সুতরাং রাজানুগত্য আমাদের বংশগত সংস্কার। ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময় 'সম্রাট্ বাহাদুরের সামরিক ছাত্রবৃত্তি' (King Emperor's Cadetship) নামে একটা

বৃত্তি দেওয়া হ'য়েছিল আমায়। যার বংশের বিশেষ সামরিক খ্যাতি আছে এবং যে নিজে সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে তাকেই এই সম্মানজনক বৃত্তি দেওয়া হয়।

যুদ্ধ-বন্দীদের অনেকেই আমার দলে—আমার মতই ভাবত তার'। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম—"কেউ যদি বলে তোমার ভাইদের গুলী করে মার, তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমে তাকেই গুলী করবে।"

আমাদের মাঝে রাজা এবং বড়লাট বাহাত্বরের কমিশন-প্রাপ্ত অনেক অফিসার ছিলেন—যুদ্ধের বহু আগে থেকেই এঁদের আমি চিনতাম। এঁরা সব এক সঙ্গে যুক্তি ক'রে ঠিক করলেন—ভারতীয় জাতীয় বাহিনী থেকে দূরে থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ এসব ক'রে জাপানীরা কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করছে।

এই মনোভাব নিয়েই আমি অন্যান্য বিশহাজার যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে নীসুন-শিবিরে যাই। সেখানে গিয়েও আমার মনোভাবের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। আমার কাছে যে কেউ এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসত, তাকেই আমি বলতাম,—"আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিও না।" কয়েকদিন পরে আমাকে নীসুন-শিবিরের কম্যাণ্ডার ক'রে দেওয়া হ'ল।

শিবিরের জীবনযাত্রা ও পরিচালনা পদ্ধতি

ফারের পার্কের সভার পর ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাঁর 'হেডকোয়ার্টার্স' করলেন সিঙ্গাপুরের 'মাউণ্ট প্লেজাণ্ট' নামক

জায়গায়। মেজর ফুজিয়ারা সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার জন্য 'ফুজিয়ারা কিকন' না যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন—তার 'হেডকোয়ার্টার্স'-এর কাছেই। যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরগুলি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে নীসুনে একটি যুদ্ধ-বন্দী 'হেডকোয়ার্টার্স' প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, এর পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ল কর্ণেল এন্, এস্, গিলকে, কর্ণেল জে, কে, ভোঁসলাকে এব 'এ্যাড্জুট্যাণ্ট' ও 'কোয়ার্টার-মাষ্টার জেনারেল-এর পদ দেওয়া হ'ল এবং কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি হ'লেন এর 'ডিরেক্টার অব্ মেডিক্যাল সার্ভিস'।

এই সবই রইল মাউণ্ট প্লেজাণ্টের ভারতীয় জাতীয়-বাহিনীর 'হেড্কোয়ার্টার্স'-এব অধীনে :

যুদ্ধ-বন্দীদের সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন যুদ্ধ-বন্দী-শিবিরে রাখা হ'ল। বন্দী-শিবিরগুলি নিম্নলিখিত জায়গায় নিম্নলিখিত অফিসারের পরিচালনাধীনে ছিল :—

(১) নীসুনে মেজর এম্, জেড্, কিয়ানি।

(২) বিদাদরীতে—লেফ্ট, কর্ণেল জি, আর্, নাগর।

(৩) তিরসাল পার্কে—মেজর তেহল সিং।

(৪) ক্রাঞ্জিতে—লেফ্ট পুরুষোত্তম দাস।

(৫) সিলেটারে—মেজর উইগুম্যান।

বন্দীদের অতি কষ্টে এখানে জীবন যাপন করতে হ'ত। যেখানে যত লোকের সঙ্কুলান হয় সেখানে তার পাঁচ গুণ লোককে থাকতে হ'ত, ফলে শিবিরে লোকের অসম্ভব ভিড় হওয়ায় প্রবল আকারে নানা রোগ দেখা দিল। যুদ্ধের

সময় সিঙ্গাপুরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সমস্ত নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল।

এত বেশী লোক এইসব শিবিরে থাকায় স্বাস্থ্য রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। শিবিরের কম্যাণ্ড্যাণ্ট ও মেডিক্যাল অফিসারের চেষ্টায় কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি মারাত্মক রোগগুলির প্রবল আক্রমণ ক্রমে আয়ত্তে আনা হ'ল।

উপযুক্ত ঔষধপত্রের অভাবে মেডিক্যাল অফিসারকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হ'য়েছিল। বন্দী-হাসপাতালে প্রায় পাঁচ হাজার রোগী ও আহত সৈনিক ছিল, অথচ জাপানীদের কাছ থেকে কোন নতুন ঔষধপত্র আসবার নাম নেই। সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন ইংরেজ—তিনি বুদ্ধি ক'রে ব্রিটিশদের মজুত ঔষধপত্র সব ছাঙ্গির ব্রিটিশ বন্দী-শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয়েরা শেষে অবশ্য ডিরেক্টারের এ কার্য্যের প্রতিবাদ ক'রেছিল এবং জাপানীদের চেষ্টায় ওখান থেকে কিছু ঔষধপত্র ফেরত পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম প্রথম টাট্‌কা শাকসব্জী বা মাংস সরবরাহ এখানে হ'ত না—ফলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাবে অনেক সৈনিক বেরিবেরি, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হ'য়েছিল। সিঙ্গাপুরের রসদ-ভাণ্ডার সব জাপানীদের হাতে—তাদের বোঝানো দায় হ'য়ে উঠত—ভারতীয়দের একই বেলার খাবারের জন্যে চাল, ডাল, আটা, ঘি, লঙ্কা, মসলা, লবণ—এত সব এক সঙ্গে কেন দরকার হয়। ওদের নিজেদের খাবার বড়

সাদাসিদে : ভাতের সঙ্গে একটু তরকারী বা মাছ, আর লবণ হলেই হ'ল। তাই তারা আমাদের এত বিলাস ক'রে খাওয়ার নিন্দা ক'রে, জাপানীদের অনাড়ম্বর আহারের প্রশংসা ক'রে অনেক বক্তৃতা দিত। একবার তারা জোর ক'রেই আমাদের এই অনাড়ম্বর আহারে অভ্যস্ত করতে চেষ্টা ক'রেছিল। তারা ঠিক করলে—দিনে একটার বেশী আহার্য্য আমাদের দেবে না। কোন দিন হয়ত শুধু গোল-মরিচ দিয়ে বলত—"যাও, এই খেয়েই তোমরা থাক গিয়ে আজ।" কয়েকদিন যাবারপর যখন আমাদের পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হ'ল তখন একদিন তাদের ডেকে এনে আমাদের রাঁধার প্রণালী দেখালাম—এত বিভিন্ন জিনিষ আমাদের একবেলার রান্নায় কেন দরকার হয়। আমাদের রান্না তাদের খাইয়ে দেখালাম। আমাদের নিমন্ত্রণে কয়েক দিন আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবার পর দেখা গেল—তাদের সেই বহু প্রশংসিত অনাড়ম্বর আহার্য্যের প্রতি তাদের পূর্ব্ব শ্রদ্ধা আর বড় নেই।

প্রথম ছ'মাস সৈন্যদের কোন বেতন দেওয়া হয় নি।

বন্দী-নিবাসে যখন এই রকম ব্যাপার চলেছে,—ক্যাপ্টেন মোহন সিং তখন আল্লাদিত্তা খাঁর অধীনস্থ সাবেক দুই শ' স্বেচ্ছাসেবক ও কয়েকজন নতুন উদ্যোগী কর্ম্মীর সাহায্যে বন্দী-সৈন্যদের ভিতরে প্রচার, বক্তৃতা এবং সভা প্রভৃতির ব্যবস্থা করছেন, উদ্দেশ্য—বন্দী-সৈন্যদের ভিতরে জাতীয়তা-বোধ জাগিয়ে তোলা এবং তাদের আজাদ হিন্দ ফৌজে

যোগ দিতে ইচ্ছুক ক'রে তোলা। আজাদ হিন্দ ফৌজ অবশ্য তখনও গড়ে ওঠে নি, কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন—শীগ্‌গিরই এটা গড়ে তোলা হবে। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর এই প্রচারকার্য্য খুবই সফল হ'য়েছিল। তাঁর প্রচারে বিশ্বাস ক'রে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলে। অধিকাংশ ভারতীয় সৈনিকের কাছে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রিয় হ'য়ে উঠলেন। জাপানীদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে লাগলেন—তাতে ভারতীয় সৈন্যেরা তাঁকে আরও প্রীতির চোখে দেখতে লাগল। তাঁর বিশেষ সৌভাগ্য যে তিনি কর্ণেল গিল ও চ্যাটার্জ্জির মত অফিসারকে পরামর্শদাতা ও সহকারীরূপে পেয়েছিলেন।

অধিকাংশ সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করলেও অফিসারদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে আস্থা স্থাপন করতে পারছিলেন না। জাপানীজাতির পূর্ব্ব ব্যবহার তাঁদের জানা ছিল সুতরাং তাঁদের মনে হচ্ছিল এ জাতিকে বিশ্বাস করলে ভুল করা হবে—তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা না ক'রে যুদ্ধ-বন্দীরূপে দূরে থাকাই সমীচীন। আমি নিজেও এই অফিসারদেরই একজন। আমার মনে হ'ত—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন না হ'লেই ভাল হয়। এইজন্য নীসুনে গিয়ে প্রথমেই আমি প্রায় কুড়িজন অফিসার নিয়ে একটা সঙ্ঘ গড়ে তুললাম—এই সঙ্ঘের একমাত্র কাজ হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে বাধা দেওয়া।

১৯৪২ সালের মার্চ্চের প্রথম দিকে লেফ্‌ট, কর্ণেল এন্, এস্, গিল এবং মেজর মহাবীর সিং ধীলন সাইগনে উপরওয়ালা জাপানী অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। এঁরা দুই জন সেখান থেকে জেনে এলেন—টোকিওতে শীঘ্রই ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা বসবে, সেই সভায় ভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হবে।

১৯৪২ সালের মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে টোকিওতে এই সভার অধিবেশন হয়। এই বৈঠকে যোগদান করতে মালয় থেকে যে শুভার্থী (Good-will) মিশন আসে—তাতে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং, লেফ্‌ট, কর্ণেল এন, এস্, গিল, মিঃ আয়ার, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ, মিঃ রাঘবন, মিঃ কে, পি, কে, মেনন ও মিঃ এস্, সি, গুহ।

স্বামী সত্যানন্দ ও মিঃ প্রীতম্ সিং ব্যাঙ্কক থেকে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে পথে একটা বিমান দুর্ঘটনায় ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ, স্বামী সত্যানন্দ, মিঃ আয়ার ও মিঃ প্রীতম্ সিং-এর মৃত্যু হয়। কতকগুলি শিবিরে জনরব রটেছিল —এই বিমান দুর্ঘটনা না কি জাপানীদের ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব্ব-কল্পিত। এই চার জন ভদ্রলোকের স্পষ্টবাদিতার জন্য জাপানীরা তাঁদের তেমন প্রীতির চোখে দেখ্‌ত না।

টোকিও বৈঠকে ঠিক হয়, ১৯৪২ সালের জুন মাসে ব্যাঙ্ককে পূর্ব্বএশিয়ার সকল ভারতীয়দের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা

বৈঠক হবে। এতে আরও ঠিক হয়—'ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ' নামে একটা সঙ্ঘ গঠন করা হবে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হবে ভারতকে বিদেশীর অধীনতাপাশ, আয়ত্ত, প্রভাব, অধিকার প্রভৃতি থেকে মুক্ত ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতা দান। তা' ছাড়া ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটা ফৌজ গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কাজ পাকাপাকিভাবে স্বুরু হবে অবশ্য ব্যাঙ্কক বৈঠকের অনুমোদন পাওয়ার পর, সঙ্ঘের কর্ম্মী-সমিতিও সেইখানে ঠিক হবে।

বিদদরি প্রস্তাব

সিঙ্গাপুরের পতনের অল্প কয়েকদিন পরেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং উপরিতন অফিসারদের ডেকে একটা সভা ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অফিসারেরা সবাই একবাক্যে বলেন—বিষয়টি যখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তখন প্রত্যেক অফিসারেরই নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করবার অধিকার থাকা উচিত। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এ প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। তিনি প্রত্যেক ইউনিটের কম্যাণ্ডিং অফিসারকে নিজের নিজের দলের অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মত সংগ্রহ ক'রে তাঁর হেড-কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং টোকিও থেকে ফিরে এলে সিঙ্গাপুর বিদদরি শিবিরে উপরিতন

অফিসারদের আর একটা সভা হয়। বহু আলোচনার পর সেই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(ক) আমরা শুধু ভারতীয়। বর্ণ, মত, ধর্ম্মের কোন বৈষম্য আমরা মানি না।

(খ) ভারতের স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

(গ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটা ফৌজ গড়ে তুলতে হবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় জনগণের আহ্বানে শুধু এ ফৌজ যুদ্ধ ক'রবে।

(ঘ) যতদিন এ আহ্বান না আসে ততদিন আমরা শুধু উন্নত এবং দেশভক্ত ভারতীয় হ'তে চেষ্টা ক'রব।

এই সভায় আরও স্থির করা হয় যে প্রস্তাবগুলি ভারতীয় বাহিনীর অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকদের বুঝিয়ে দিতে হবে, প্রস্তাবগুলি বুঝে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঐগুলি গ্রহণ করতে রাজী হ'ন তাঁদের নামের একটা তালিকা তৈরী করতে হবে। যথাসময়ে এই তালিকা তৈরী করা হ'ল। যে সব স্বেচ্ছাসেবক এই প্রস্তাবগুলি মেনে নিল তাদের অন্য সৈন্যদের কাছ থেকে পৃথক ক'রে রাখা হ'ল।

১৯৪২ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি ঘটছিল। এই সময়েই বিভিন্ন শিবিরের সৈন্যদের দুই দলে ভাগ করা হয়।

(ক) স্বেচ্ছাসেবকের দল : যারা জাপানীদের বিশ্বাস করে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে রাজী।

(খ) যারা স্বেচ্ছাসেবক নয়, অর্থাৎ যারা জাপানীদের বিশ্বাস করে না এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিতেও চায় না।

মোটামুটি অধিকাংশ শিখ, ডোগরা, জাঠ এল স্বেচ্ছা-সেবকের দলে। আর পাঞ্জাবী মুসলমান, পাঠান এবং গুর্খা গেল অন্য দলে। কিন্তু এ দলভাগ শুধু মনোভাব বিচার করে; বস্তুতঃ—খাদ্য, ব্যবহার বা বাসস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবক ও অ-স্বেচ্ছাসেবকের ভিতরে কোন তারতম্য দেখান হ'ত না—একই ব্যারাকে থেকে একই খাদ্য খেয়ে তারা এক ধরণের কাজই করত। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর নিযুক্ত প্রচারকেরা অবিরত এ শিবিরে ও শিবিরে ঘুরে সবার মনোভাব জেনে ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে জানাত।

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে জাপানীরা থাইল্যাণ্ড ও বোর্ণিওতে পাঠানোর জন্য কতকগুলি মজুর চেয়ে পাঠাল। তদনুসারে ক্যাপ্টেন ধারগলকর, তৃতীয় অশ্বারোহী সৈন্য-দলের ক্যাপ্টেন এইচ্, বুধবর, ক্যাপ্টেন তাজিক, ক্যাপ্টেন জীবন সিং ও আরও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে প্রায় এক হাজার লোক পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ব্যাঙ্ককে; ভারতীয় স্থপতি দলের মেজর এন্, এস্, ভগতের অধীনে আরও পাঁচশ' পাঠানো হ'ল বোর্ণিওতে। এইসব লোকগুলির কেউই অবশ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের নয়—এ কথাও সত্য যে এইসব অফিসারেরা প্রকাশ্যভাবেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের তীব্র সমালোচনা ক'রেছেন।

প্রথমোক্ত দলকে ব্যাঙ্ককে গিয়েই খুব মুস্কিলে পড়তে হয়। স্থানীয় কম্যাণ্ডার ভারতীয় অফিসারদের বল্‌লেন—তাদের আনা লোকের নামের ফিরিস্তি দাখিল করতে। বিভিন্ন কাজ জানা লোকের নাম বিভিন্ন কাগজে থাকবে। ভারতীয় মোটর চালক ও মিস্ত্রীদের জাপানীরা নিজেদের মোটর ট্রান্‌সপোর্ট কোম্পানীর কাজে লাগাবে ঠিক ক'রেছিল। ভারতীয় অফিসারেরা এরূপ ফিরিস্তি দাখিল করতে রাজী হ'লেন না। তাঁরা বল্‌লেন—জেনেভাব আন্তর্জাতিক আইন সভার নির্দ্দেশ অনুসারে এই দাবী বে-আইনী; তাঁরা কেবল বন্দীদের নাম, পদ (Rank) এবং ইউনিটের লিষ্টি দাখিল করতে পারেন। জাপানীরা বল্‌লে—ভারতবর্ষ ঐ জেনেভা চুক্তিপত্রে পক্ষ নহে। ছাঙ্গির ব্রিটিশ যুদ্ধ-বন্দীদের কাছ থেকে ত' এ সকল খবরই পাওয়া গেছে, আর তা' ছাড়া ব্রিটিশ এবং অষ্ট্রেলিয়ান উভয় দলের যুদ্ধ-বন্দীরাই জাপানী লরী চালাচ্ছে—জাপানী কারখানায় কাজ করছে। এ সব বলা সত্ত্বেও ভারতীয় অফিসারেরা তাদের কথা মত কাজ করতে রাজী হ'লেন না। ফলে ক্যাপ্টেন ধরগলকর, ক্যাপ্টেন এইচ্‌, বুধবর এবং ক্যাপ্টেন এ, এ, তাজিক-কে ওরা বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁদের উপর যথেচ্ছ দুর্ব্ব্যবহার ক'রলে। সংবাদপত্রে প্রচারিত হ'য়েছিল যে ওঁদের তিন জনকে ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে ৮৮ দিন ঝুলিয়ে রাখা হ'য়েছিল—কারণ তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন নি। আমার মনে হয় এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা—জাপানী ও

আজাদ হিন্দের নিন্দা ক'রে ব্রিটিশের অনুগ্রহভাজন হবার উদ্দেশ্যেই এরূপ প্রচার করা হ'য়েছিল। বস্তুতঃ জাপানীদের দুর্ব্ব্যবহারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করা না করার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না। ১৯৪২ সালের জুন মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ব্যাঙ্ককের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে এ সব ব্যাপারের কথা শোনেন এবং তিনিই চেষ্টা ক'রে জাপানীদের হাত থেকে এই তিন জন অফিসারকে মুক্ত ক'রে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসেন।

যুদ্ধ-বন্দী-শাস্তি-শিবির

দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সামরিক বিচার হয় তাতে ইংরেজদের অভিযোগগুলির মূল বক্তব্য ছিল—আজাদ হিন্দ ফৌজের দলভুক্ত লোকেরা ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ক'রেছে, কিন্তু এমন কি এই বিচারের অভিযোক্তারা পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন--যুদ্ধ-বন্দী-শাস্তি-শিবিরের অত্যাচার কাহিনী জঘন্যভাবে অতিরঞ্জিত এবং সর্ব্বৈব ভিত্তিহীন। এই অধ্যায়ে যুদ্ধ-বন্দী-শাস্তি-শিবিরের একটি প্রকৃত লিপিচিত্র অঙ্কন করতে আমি চেষ্টা ক'রব—যা থেকে ভারতীয়েরা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবেন।

ব্রিটিশ পক্ষের আত্মসমর্পণের পর জাপানীরা ভারতীয় অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকদের একই শিবিরে একত্র রেখেছিল। সেখানে নিজ নিজ ইউনিটের সৈন্যদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করবার দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছিল অফিসারদের উপর। কিন্তু অনেক সৈন্য মনে ক'রত—ব্রিটিশেরা যে মুহূর্ত্তে তাদের জাপানীদের হাতে তুলে দিয়েছে সেই মুহূর্ত্তে তাদের রাজার প্রতি আনুগত্য শেষ হ'য়ে গেছে—এখন তারা নিজেরা যুদ্ধ-বন্দী, তাদের অফিসারেরাও যুদ্ধ-বন্দী—সবাই সমান—অফিসারদের আদেশ মেনে চলবার প্রয়োজন তাদের আর নেই। এইরূপ মনোভাবের ফলে বন্দী-শিবিরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা সুরু হয়। এক ইউনিটের

সৈন্যেরা তাদের কম্যাণ্ডিং অফিসারকে ধরে বিষম প্রহার পর্য্যন্ত করে। এরূপও অনেক শোনা গেছে—রাত্রে সৈন্যেরা শিবির থেকে পালিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অ-সামরিক লোকের বাড়ীতে গিয়ে লুঠ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি ক'রেছে। এক ইউনিটের সৈন্যদের একেবারে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—রাত্রে পার্শ্ববর্ত্তী বাসিন্দা লোকের বাড়ী থেকে গরু চুরি ক'রে এনে কেটে খাওয়া। আবার কোন কোন দলের লোকের শূকর চুরি ক'রে এনে কেটে খাওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। একই শিবিরে হিন্দু মুসলমান সৈন্য র'য়েছে অথচ সেখানে এইসব ব্যাপার চলেছে; সুতরাং এসব দমন করতে যদি কোন কঠোর নীতি অবলম্বন না করা হয় তবে যে কোন মুহূর্ত্তে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হ'তে পারে। এইসব দুর্নীতি দমন করবার জন্য সেনা-শাস্তি-শিবির (Concentration Camp) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উপরি-উক্ত অপরাধের জন্য যাদের এখানে পাঠানো হ'ত তাদের শাসন করা আবশ্যক ছিল। সেনা-শাস্তি-শিবিরের (Concentration Camp) ব্যবহার কঠোর ছিল বটে কিন্তু পৈশাচিক নয়। পরে—বিশেষ করে ১৯৪২ সালের এপ্রিলের পর কয়েকজন অফিসার ও কতকগুলি সৈনিককে অন্য কারণে শাস্তি-শিবিরে আনা হয়। তাদের সন্দেহ করা হ'য়েছিল—তারা ব্রিটিশের পঞ্চম বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাচ্ছে। তবে দিল্লীর লাল কেল্লায় বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈন্যদের

সঙ্গে প্রথম অবস্থায় যে ব্যবহার করা হ'য়েছে তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার আজাদ হিন্দ ফৌজের শাস্তি-শিবিরে কোন দিনই কা'রো প্রতি করা হয় নি।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে কর্ণেল এন্, এস্, ভগৎ শাস্তি-শিবিরের নাম পালটে রাখলেন 'অবরোধ-শিবির' (Detention Camp)। মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টর মেজর জেনারেল ভোঁস্লার নেতৃত্বাধীনে ২য় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমনের পর অবরোধ-শিবিরে কা'রো সঙ্গে এতটুকু রূঢ় বা অন্যায় ব্যবহার করা হ'যেছে এমন একটি দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষও দেখাতে পা'রেন নি।

এরপর ১৯৪২ সালের মে মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং অফিসার 'স্বাতন্ত্র্য-শিবির' (Officers' Separation Camp) নামে এক নতুন শিবির স্থাপনা করেন। যে সকল অফিসার আজাদ হিন্দের বিরুদ্ধে প্রচার ক'রেছেন অথবা অপরকে আজাদ হিন্দ ফৌজ দলে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছেন ব'লে সন্দেহ করা হ'ত তাদের এই শিবিরে এনে নিজ নিজ ইউনিট থেকে দূরে রাখা হ'ত। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং নিজেই আবার এই শিবির উঠিয়ে দেন।

জাপানী-অভিসন্ধি ফাঁস

ছাঙ্গি-পাহারা

১৯৪২ সালের মার্চ্চের প্রথম দিকে জাপানীরা ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কাছে এসে অনুরোধ করে—ছাঙ্গিতে একদল ভারতীয় প্রহরী পাঠাতে—এরা সেখানে গিয়ে সেখানকার ব্রিটিশ-বন্দী-নিবাসে পাহারা দেবে। জাপানীরা বলে—এইবার সত্যিকার কাজ সুরু হ'ল—এইরকম সব কাজ ক'রে জাপানী হেড্-কোয়ার্টার্সের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে হ'বে যে ভারতীয়েরা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এবং ব্যগ্র। এইরূপ করলেই না কি আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিত্তিস্থাপনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হ'বে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছাঙ্গি ব্রিটিশ-শিবিরে এইরূপ ভারতীয় সৈন্যের পাহারা বসানোর উদ্দেশ্য ছিল—জাপানী সৈন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা; দ্বিতীয়তঃ—ভারতীয় সৈন্যদের এইরূপ কাজের ভার দিয়ে তাদের মন থেকে 'নিকৃষ্টতার ভাব' (Inferiority Complex) দূর করা। পূর্ব্বএশিয়ায় নব-অধিকৃত প্রত্যেক স্থানেই জাপানীরা এই নীতি অবলম্বন ক'রত। এমনি ক'রে শ্বেতকায় সাহেবদের অবমানিত ক'রে তারা এশিয়াবাসীদের দেখাত—তারা সাহেবদের চেয়ে হীন ত' নয়ই, বরং বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ।

আজাদ হিন্দ ফৌজ আরও বড় ক'রে গড়ে তুলবার আশায়

ক্যাপ্টেন মোহন সিং ভারতীয় প্রহরীদল পাঠাতে রাজী হ'লেন—আর এই অপ্রিয় কাজের ভার পড়ল গিয়ে লেফ্‌ট, জি, এস্‌, ধীলনের (আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণেল) উপর। অধিকাংশ ভারতীয় অফিসারদের এ কাজটা তেমন পছন্দ ছিল না। ভারতীয়েরা সাধারণতঃ উদার, বীরধর্ম্মী—পরাজিত শত্রুকে লাঞ্ছিত করা তাঁরা পছন্দ করেন না। ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের দল যেরূপ কাজ করতে চায়—পরাজিত শত্রুদের পাহারা দেওয়া সে ধরণের কাজ নয়। মোট কথা—ভারতীয় সবাই প্রায় এ কাজের বিরোধী; তবুও লেফ্‌ট, ধীলন যখন একবার ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কাছে কথা দিয়ে ফেলেছেন তখন প্রিয় হ'ক, অপ্রিয় হ'ক—ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর আদেশ তিনি আর অমান্য করতে পারলেন না। নেতাজীর আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছাঙ্গি পাহারার উপর কর্ত্তৃত্ব করতে লাগল জাপানীরাই।

ভারতীয় বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজ সৈন্যদের কথা

ছাঙ্গি পাহারা ব্যাপারের কয়েকদিন পরেই মার্চ্চের প্রথম দিকে জাপানীরা ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর কাছে নয় শ' ভারতীয় বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজ সৈন্য চেয়ে পাঠায়—এরা সিঙ্গাপুর রক্ষায় সাহায্য করবে। মোহন সিং পাঠাতে রাজী হ'ন। তিনি সমস্ত বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজ সৈন্যদের এক সঙ্গে ডেকে বলেন—ব্রিটিশ বিমানবাহিনী আমাদের শিবির আক্রমণ ক'রবে এরূপ আশঙ্কা করা যাচ্ছে—এরূপ

ঘটলে ভারতীয় বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজদেরই সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা উচিত। জাপানীরা অবশ্য বিমান-ধ্বংসী কামান দিয়ে সাহায্য করবে—কিন্তু এ সব কামান নেবার আগে তাদের কাছ থেকে কয়েকদিন এর প্রয়োগরীতি প্রভৃতি শিক্ষা ক'রে নিতে হবে। তাদের আশ্বাস দিয়ে বলা হয়—তাদের কেবল নিজেদের শিবির-রক্ষা কার্য্যেই নিযুক্ত রাখা হ'বে ; পরে ভারতবর্ষে গিয়ে যখন কাজ করতে হ'বে তখন ভারতের স্বাধীনকৃত প্রদেশগুলিতে শত্রুবিমান প্রতিরোধ করবে তারা। এরপর প্রায় ছয় শ' ভারতীয় বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজকে জাপানীদের কাছে শিক্ষানবিশি করতে পাঠানো হয়। এদের অধিকাংশই পাকা বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজ—বহু বৎসর ধ'রে তারা এই কাজই ক'রে আস্‌ছে। সুতরাং জাপানীদের কাছে শিক্ষা করবার তাদের কিছুই ছিল না—জাপানীদের উদ্দেশ্য শুধু তাদের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা। তাই জাপানী-শিবিরে এলেই জাপানীরা তাদের এক শ' এক শ' ক'রে কয়েক দলে ভাগ ক'রে নন্‌কমিশন্‌ড অফিসার ও জাপানী অফিসারদের হাতে তুলে দেয়। কয়েকটি দলকে জাহাজে ক'রে প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ রক্ষা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। একটি জাপানী সংবাদপত্রে ক্যাপ্টেন মোহন সিং এদের সম্বন্ধে প্রথমেই যে খবর পান তাতে জানা গেল ছেবো (Cebo) দ্বীপে এরা যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে এও জানা যায়, এদের অনেকে সেখানে প্রাণ হারিয়েছে।

অন্য যে সব দল সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছিল তাদের অনেকে জাপানীদের হাতে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করে। কয়েকজন ভারতীয় অফিসার জাপানী নন্‌কমিশন্‌ড অফিসারের হাতে কীল চড় খান। তাঁরা এতে প্রতিবাদ জানালে কয়েকদিন তাঁদের অনাহারে রাখা হয়। কা'রো কা'রো সঙ্গিনের খোঁচা পর্য্যন্ত খেতে হয়। এঁদের কয়েকজন কৌশলে শিবির থেকে পালিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে জানান যে—জাপানীরা ভারতীয়দের জাপানী সৈন্যে পরিণত করতে চেষ্টা করছে। এই শুনে ক্যাপ্টেন মোহন সিং লেফ্‌ট, কুন্‌জুকা নামে একজন জাপানী অফিসারের সঙ্গে জাপানী-নিয়ন্ত্রিত শিবিরে ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে যান। জাপানী প্রহরী ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে শিবিরে ঢুকতেই দেয় না। এই ব্যাপার ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যদের মনে বিশেষ অসন্তোষ ও ক্রোধের সৃষ্টি করে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় গোলন্দাজ সৈন্যগণ জাপানীদের হাতে অমানুষিক নির্য্যাতন ভোগ করতে থাকে। যারা প্রাণে বেঁচে ছিল নেতাজী এসে জাপানী কবল থেকে তাদের মুক্ত ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজ-ভুক্ত ক'রে নেন।

জাপানীরা যে মুখেই শুধু ভারতীয় স্বাধীনতার কথা বলে, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রাখবার মতলব যে তাদের নেই—এ ধারণা আমার আরও বদ্ধমূল হয় ছাঙ্গি-পাহারা ও ভারতীয় বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজ সৈন্যদের ব্যাপার দেখে।

আমার মনে হয়—তাদের উদ্দেশ্য কেবল আমাদের দিয়ে তাদের নিজেদের কাজ করিয়ে নেওয়া। এইজন্য আমি ঠিক ক'রেছিলাম, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে আমি যথাসাধ্য বাধা দে'ব। অন্যান্য অফিসারদেরও আমার এ সঙ্কল্পে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাঁর প্রচারকার্য্য জোরে চালাতে থাকেন এবং যে সকল অফিসার ও সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে বাধা দেয় তাদের আটক ক'রে রাখবার জন্য সেনা-শাস্তি-শিবির গড়ে তোলেন।

আমার অধীনস্থ কাউকে আমি শাস্তি-শিবিরে কিছুতে যেতে দেব না ঠিক করলাম। একবার আমার অধীনের কয়েক জন অফিসারকে শাস্তি-শিবিরে নিয়ে যাওয়ায় আমি আমার নেতৃপদ-ত্যাগপত্র দাখিল করলাম। এক কথায় বলতে গেলে—নীসুন-শিবির পরিচালনা করবার ভার যতদিন আমার হাতে ছিল আমি শিবিরের সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজের মত ব্যক্ত করতে দিতাম। আমি তাদের অভয় দিয়ে বলেছিলাম—এরজন্য তাদের শাস্তি-শিবিরে যেতে হ'বে না। আর শিবির যতদিন আমার পরিচালনাধীনে ছিল ততদিন সেখানে যেতে কা'রো হয়ও নি।

১৯৪২ সালের মে মাসের প্রথম দিকেই বেশ বোঝা গেল —জাপানীরা ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে যে অপরিমেয় ক্ষমতা দিয়েছে তার বলে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে

তুলবেনই, তা' ছাড়া জাপানীরাও এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প। ঐ মাসের মধ্যেই আমাদেরও ঠিক ক'রে ফেলতে হ'বে—বিদদরি প্রস্তাবগুলি আমরা মেনে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হ'ব কি না। আমরা শুনতে পেলাম—স্বেচ্ছাসেবকদল ও অ-স্বেচ্ছাসেবকদলকে পৃথক ক'রে বিভিন্ন শিবিরে রাখা হ'বে। এইসব দেখে শুনে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধবাদী অফিসারদের নিয়ে আমরা কয়েকটা সভা করলাম। এই সভার শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, উচ্চপদের ভারতীয় অফিসারদের আজাদ হিন্দ ফৌজের বাইরে থেকে সেনা-শাস্তি-শিবিরের কষ্ট ভোগ করার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং (ক) উচ্চপদের অফিসারগণ আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ক'রে ধীরে ধীরে এর নিয়ন্ত্রণ-ভার নিজেদের হাতে নেবেন, তাঁরা দেখবেন—যুদ্ধ-বন্দীরা যেন কোন নির্য্যাতন ভোগ না করে, জাপানীরা যেন তাদের দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে না নেয়। (খ) সাধারণ সৈনিকেরা এখন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করবে না, তেমন হয় আপাততঃ তারা একটু কষ্ট বা দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করুক—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অবশ্য আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিতরে থেকেই তাদের সাহায্য করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এ সব কথাই অবশ্য আমি বেশীর ভাগ মুসলমানদের সম্বন্ধে বলছি।

১৯৪২ সালের মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের সভার সিদ্ধান্তানুসারে নীস্যুনে কর্ণেল চ্যাটার্জ্জির অধীনস্থ এক প্রচারক

দল ও নীম্সুন শিবিরের প্রায় চার শ' অফিসারের সামনে আমি বল্‌লাম—বিদদরি প্রস্তাবানুযায়ী আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বেচ্ছাসেবক হওয়া সাব্যস্ত ক'রেছি। আমি উপস্থিত সকলকেই বল্‌লাম—তাঁরাও যেন অবিলম্বে এর স্বেচ্ছাসেবক হ'বেন কি না হ'বেন, ঠিক করে ফেলেন। এই সভাতেই আমি প্রত্যেক ইউনিটের কম্যাণ্ডারকে তার নিজের ইউনিটের সৈন্যগণের কে কে স্বেচ্ছাসেবক হ'বে, আর কে কে হ'বে না—তার পৃথক পৃথক তালিকা তৈরী ক'রে পরের দিনই দিতে বল্‌লাম—কারণ, এই দুই দলকে ছাড়াছাড়ি হ'তে হ'বে। সেইদিনই বিকালে আমি মসজিদে মুসলমান-অফিসারদের একটি সভা আহ্বান করলাম এবং সেখানে তাঁদের কাছে আজাদ হিন্দ ফৌজে আমি কেন যোগদান করছি তার কারণ বল্‌লাম। তাঁদের আরও বল্‌লাম—এতদিন আমি তাঁদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ও রক্ষা ক'রে এসেছি কিন্তু এখন আমার বিদায় নেবার পালা এসেছে। তাঁরা যখন যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন আমি তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য ক'রব প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং তাঁদের অনুরোধ কর্‌লাম—তাঁরা যেন জোরজবরদস্তিতে পড়ে কখনও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ না দেন। তাঁরাও অঙ্গীকার করলেন—এরূপ কখনও হ'বে না। এরপর সেদিনকার সিদ্ধান্তটি পাকা করবার জন্য তাঁরা মুসলমান ধর্ম্মের রীতি অনুসারে "দোয়া খয়ের" করলেন।

ব্যাঙ্কক বৈঠক

এর কয়েকদিন পরে ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাঁর মাউণ্ট প্লেজাণ্টের বাংলোতে বড় অফিসারদের একটি বৈঠক আহ্বান করলেন। এতে আলোচনা করা হ'বে—আগামী ব্যাঙ্কক বৈঠকে কি করা যায়। সবাই এখানে উপস্থিত হ'লে তিনি বল্‌লেন—আগামী জুন মাসে ব্যাঙ্ককে ভারতীয়দের একটা সভা হ'বে, এই সভায় তিনি ভারতীয় বন্দীদের নব্বই জন প্রতিনিধি নিয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়েছেন। পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের তরফ থেকে যতজন ব্যাঙ্ককে সমবেত হ'বার কথা—এই সংখ্যা তার এক তৃতীয়াংশ। তিনি আরও বল্‌লেন—এই নব্বই জন প্রতিনিধিরই ব্যাঙ্ককে যাবার প্রয়োজন আছে ব'লে তিনি মনে করেন না, ত্রিশ জন গেলেই চলবে, বাকী ষাট জনের স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে তাঁদের ভোট তিনিই সেখানে দাখিল করতে পারবেন। উপসংহারে তিনি বল্‌লেন—সবারই যখন তাঁর উপর আস্থা আছে, তখন কে কে তাঁর সাথে ব্যাঙ্ককে যাবেন তা' তিনিই ঠিক ক'রে দেবেন। উপস্থিত সবাই তাঁর এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল ব্যাঙ্ককে কৌশলে আমাদের দ্বারা অনেক কিছু অঙ্গীকার করিয়ে নেওয়া হ'বে—সুতরাং ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাঙ্কক বৈঠকে যোগদান আমি তেমন পছন্দ করছিলাম না। ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর বলা শেষ হ'লে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম—

ব্যাঙ্ককে যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতিনিধি পাঠানো সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা করতে চাইছেন তাতে আমার আপত্তি আছে। ব্যাঙ্ককের বৈঠকে তিনি যে প্রতিনিধিদল সঙ্গে ক'রে যাবেন তাঁদের সেখানে যুদ্ধ-বন্দীদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হ'বে, সুতরাং এমন সব লোকেরই সেখানে যাওয়া উচিত, যাঁদের উপর যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে যুদ্ধ-বন্দীরা নিজেরা। তিন রকম উপায়ে এই নির্ব্বাচন সম্ভব—

(ক) প্রত্যেক শিবিরের যুদ্ধ-বন্দীর হিসাব নিয়ে একটা অনুপাত কষে আসনগুলি ভাগ ক'রে দিতে হ'বে। তদনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন তারা নিজেরাই করবে।

(খ) এতে যদি সুবিধা না হয় তবে কোন্ সম্প্রদায়ের কত লোক আছে তার হিসাব নিয়ে তাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে আসন বণ্টন ক'রে দেওয়া হ'বে। বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন তারা নিজেরাই করবে।

(গ) এ দু'টির একটি পন্থাও যদি ক্যাপ্টেন সিং-এর মনঃপূত না হয় তা'হলে তিনি শুধু তাঁর দেহরক্ষীকে (A. D. C.) নিয়েই সেখানে যেতে পারেন—আমাদের সকলের যখন পূর্ণ আস্থাই তাঁর উপর আছে তখন এই ত্রিশ জন প্রতিনিধিকে সেখানে টেনে নিয়ে যাবার কি প্রয়োজন? অবশ্য এ অবস্থায় ব্যাপারটাকে যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতিনিধি পাঠানো হ'ল—এরূপ বলা যাবে না।

সভায় উপস্থিত সকলেই আমার এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। সকলে একবাক্যে আমাকে সমর্থন ক'রছে দেখে ক্যাপ্টেন মোহন সিং বল্লেন—পরদিন তিনি জানাবেন, এই তিন পন্থার কোন্‌টি অনুসরণ ক'রে কাজ করা তাঁর পক্ষে সমীচীন। এরপব সেদিনকার বৈঠক ভেঙ্গে যায় এবং আমরা যে যার শিবিরে ফিরে আসি।

শিবিরে এসে আমি সকল অফিসারদের ডেকে সভায় কি হ'ল জানালাম, ওঁরা শুনে একবাক্যে বল্লেন—আমি ঠিকই ক'রে এসেছি।

পরদিন ক্যাপ্টেন পট্টনায়ক নামে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর একজন এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট আমার শিবিরে এসে আমাকে বল্লেন—আমার অধীনস্থ অফিসারদের দিয়ে পঁয়ত্রিশটি 'প্রক্‌সি ভোটে'র কাগজ সই ক'রে দিতে হ'বে। আগের দিন ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর বাড়ীতে আমাদের যে বৈঠক হ'য়েছে তার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম ; ক্যাপ্টেন সিং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে আমার প্রস্তাবিত তিন পন্থার কোন্‌টি তিনি অনুসরণ করবেন সে কথা তিনি জানাবেন—ক্যাপ্টেন পট্টনায়ককে সে কথাও বল্লাম। অবশেষে ব্যাঙ্ককে যে সব প্রতিনিধি পাঠানো হ'বে তাঁদের নামের লিষ্ট দেখাতে বল্লাম। তাঁকে বল্লাম—যাদের উপর নির্ভর করতে পারি সেইসব লোককে আমরা 'প্রক্সি ভোট' দিতে পারি। প্রক্‌সির ফরমে ঠিক এইরূপ লেখা ছিল : "আমি...এতদ্দ্বারা আমার 'প্রক্‌সি ভোট'...কে

দিচ্ছি, এঁর সিদ্ধান্ত আইনতঃ আমার সিদ্ধান্ত ব'লেই গণ্য হ'বে।"

ক্যাপ্টেন পট্টনায়ক প্রতিনিধিদের নামের লিষ্ট দিতে রাজী হ'লেন না, তিনি বল্‌লেন—প্রতিনিধিদের নামের জায়গাটা ফাঁক রাখা হ'বে, তিনি নিজে ঐ স্থান পূরণ ক'রে দেবেন। ব্যাপারটা রীতিমত আপত্তিজনক। আমি অফিসারদের এইরূপ ফরমে সই দিতে বল্‌তে অস্বীকার করলাম। ক্যাপ্টেন পট্টনায়ক বেশ একটু রেগে—পরদিন এর উত্তর আমি পাব ব'লে শাসিয়ে চলে গেলেন। এই সমস্ত ব্যাপার আমি আমার শিবিরের অফিসারদের কাছে বল্‌লে তাঁরা সকলেই আমার কার্য্যের অনুমোদন ক'রলেন। সেইদিন রাত্রেই আমার উপর হুকুম এল—আমাকে কুয়েলা লামপুর শিবিরে বদলি ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে, সেখানে গিয়ে অ-স্বেচ্ছাসেবক দলের পরিচালনার ভার নিতে হ'বে আমায়। আমার কার্য্যের ফলে যুদ্ধ-বন্দীদের বৃহত্তম শিবির নীস্থন থেকে মাত্র একজন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগদান ক'রতে গেলেন। ইনি হ'চ্ছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম কোর্টমার্শেল বিচারের ২নং সাক্ষী—সুবেদার-মেজর বাবুরাম—তিনিও গেলেন হুকুম পেয়ে। নীস্থন শিবিরের আরও কয়েকজন প্রতিনিধি অবশ্য বৈঠকে যেতে মনোনীত হ'য়েছিলেন, এঁরা বিনা নির্ব্বাচনে শুধু মনোনীত প্রতিনিধি হ'য়ে যেতে রাজী হ'ন নি।

আমাকে যেদিন কুয়েলা লামপুরে বদলি করা হ'ল—সেইদিনই ক্যাপ্টেন মোহন সিং সিলেটারে যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে

একটা সভা ক'রলেন। এই সভায় তিনি বল্‌লেন—তাঁর নিজের দলের ভিতরেই আর একটি দল গড়ে উঠছে—তিনি দেখতে পাচ্ছেন, যার চেষ্টা হ'চ্ছে তাঁর আন্দোলনকে ভণ্ডুল ক'রে দেওয়া—তিনিও দেখবেন এদের সব ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারেন কি না।

ব্যাঙ্ককে বৈঠক বসবার দিন পড়েছে ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন; সুতরাং ব্যাঙ্কক-যাত্রী প্রতিনিধিদল সিঙ্গাপুর থেকে জুনের প্রথম দিকেই রওয়ানা হ'লেন। ভারতীয় সৈন্যদল থেকে চল্‌লেন ত্রিশ জন প্রতিনিধি—আর তাঁ'দের সঙ্গে রইল ষাটটি 'প্রক্সি ভোট'। এ ছাড়া সমগ্র পূর্ব্বএশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি আসছেন বহু। মালয় থেকে আসছেন মিঃ রাঘবন্‌, মিঃ মেনন ও মিঃ গুহ। মিঃ রাসবিহারী বোসকে এই সভার সভাপতি করা হয়।

সভার উদ্বোধন-দিনে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন :—

থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব, থাইল্যাণ্ডের ইতালীয় মন্ত্রী, থাইল্যাণ্ডের জার্ম্মান মন্ত্রী, থাইল্যাণ্ডের জাপানী রাজদূত।

এইসব বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের নিজের নিজের দেশের পক্ষ থেকে সানন্দ-সখ্যের বাণী পাঠ করেন। বৈঠকে মোট সতেরটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলি প্রধানতঃ এইরূপ :—

(ক) পূর্ব্বএশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা ক'রতে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটা কর্ম্ম-

পরিষদ গঠন করা হ'বে :—মিঃ রাসবিহারী বোস (সভাপতি), ক্যাপ্টেন মোহন সিং, মিঃ এন, রাঘবন্, মিঃ কে, পি, কে, মেনন এবং লেফ্‌ট, কর্ণেল জি, কিউ, গিলানি।

(খ) পূর্ব্বএশিয়ার সর্ব্বত্র ভারতীয়-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাগুলিকে পুনরায় ভাল ক'রে গড়ে তুলতে হ'বে। এই শাখাগুলিকে জাপানের সর্ব্বপ্রকার প্রভাব-মুক্ত হ'য়ে ব্যাঙ্ককের ভারতীয়-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের অধীনে থেকে কাজ ক'রতে হ'বে।

(গ) ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড ভূখণ্ডরূপে গ্রহণ ক'রতে হ'বে,—কোন কারণেই এর ব্যতিক্রম করা চলবে না।

(ঘ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র জাতীয় প্রতিনিধি-সঙ্ঘ।

(ঙ) স্বাধীনতা ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার, পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা এই অধিকার লাভার্থে যুদ্ধ ক'রতে কৃতসঙ্কল্প।

(চ) মহামান্য নীপ্পন গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের এই অভীষ্ট লাভার্থে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রণসম্ভার দিয়ে সাহায্য ক'রবেন।

(ছ) মহামান্য নীপ্পন গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়-দের স্বাধীন দেশের অধিবাসী ব'লে গণ্য ক'রবেন এবং অন্যান্য মিত্ররাজ্যেও যাতে তাঁরা এই মর্য্যাদা পান সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবেন।

(জ) পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের কোন সম্পত্তিই শত্রু-সম্পত্তি ব'লে গণ্য করা হ'বে না। যে সকল ভারতীয় পূর্ব্ব-এশিয়া থেকে যুদ্ধের জন্য অন্যত্র গিয়েছেন—তাঁ'দের ধনসম্পত্তি ভারতীয়-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কর্ম্মপরিষদের হাতে গচ্ছিত রাখা হ'বে।

(ঝ) ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'বার পর স্বাধীন ভারত এবং জাপানের মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'বে। পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দেব এই বৈঠক ভারতবর্ষকে জাপানের সহিত কোন চুক্তি বা সর্ত্তে আবদ্ধ করেন নি।

(ঞ) মহামান্য নীপ্পন গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পূর্ব্ব-এশিয়ার ভারতীয়েরা যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব সাহায্য গ্রহণ ক'রবে, সেটা ঋণ ব'লে বিবেচিত হ'বে, স্বাধীন ভারত এ ঋণ পরিশোধ ক'রবে।

(ট) ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দী এবং অ-সামরিক ভারতীয়দের ভিতর থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ক'রে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে একটা ফৌজ গড়ে তুলতে হ'বে।

(ঠ) ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে এই নবগঠিত ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক করা হ'বে।

(ড) জাপানী গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হ'বে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের কাছে সুপারিশ পাঠাতে—তাঁরা যেন সেখান থেকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোসের পূর্ব্বএশিয়ায় আসার বন্দোবস্ত ক'রে দেন। তিনি এসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিনায়কত্ব ক'রবেন।

(ঢ) আজাদ হিন্দ ফৌজকে সমগ্র অক্ষশক্তি স্বাধীন ও মিত্রপক্ষীয় ফৌজ ব'লে গণ্য ক'রবেন।

(ণ) মহামান্য নীপ্পন গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবগুলি অনুমোদন ক'রবেন।

আমার বদলি ও কুয়েলা লামপুরে অবস্থান
(জুন—সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)

আমায় বদলি ক'রবার সময় আমার নিজের এবং আমার দলের অন্যান্য অফিসারদের বুঝতে বাকী রইল না যে ক্যাপ্টেন মোহন সিং আমাদের সত্যিকার অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছেন—তাই তিনি আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চান। এখন আর আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে জাপানীরা আমাদের দিয়ে তা'দের নিজেদের কাজ করিয়ে নিতে চায়। আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প ক'রলাম—আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে থেকে এই ফৌজ দিয়ে জাপানীদের স্বকার্য্য উদ্ধারে বাধা জন্মাব।

জুনের প্রথম দিকে মালগাড়িতে চড়ে আমি কুয়েলা লামপুরে পৌঁছলাম। আমার পৌঁছবার পর কয়েকদল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ অ-স্বেচ্ছাসেবক এসে পৌঁছল। জাপানী কম্যাণ্ডার এই যুদ্ধ-বন্দীদের 'ইনস্‌পেকশান' ক'রবেন, সুতরাং আমার প্রতি আদেশ হ'ল—এদের সব এক জায়গায় সমবেত ক'রতে। সেই আদেশানুসারে আমি এদের একত্র ক'রবার পর কম্যাণ্ডার এসে আমাদের সবাইকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—"আমি আপনাদের সবাইকে আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে পেয়ে বড়

খুশি হ'য়ে আপনাদের সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি। আমরা জাপানীরা আপনাদের যুদ্ধ-বন্দী ব'লে মনে করি না, আপনারা আমাদের ভাই—কারণ, আমরা সবাই এশিয়াবাসী। জাপানীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ভারতবর্ষ অবিলম্বে স্বাধীন হয়। আপনারা যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে পারেন এই উদ্দেশ্যেই আমরা আপনাদের পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

শেষের কথাগুলি শুনে আমাদের সবারই গা জ্বালা ক'রতে লাগল : অস্ত্রসজ্জিত হ'য়ে জাপানীদের কাছে সামরিক শিক্ষা নেবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। প্যারেডের পর যুদ্ধ-বন্দীরা তা'দের অবস্থা সত্যিকার কি দাঁড়াল ভাল ক'রে না জানা পর্য্যন্ত ঐ স্থান ত্যাগ ক'রতে অস্বীকার ক'রল।

জাপানী কম্যাণ্ডারকে আমি সঙ্গে ক'রে নিজের আফিস ঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে অন্যান্য অফিসারদের সামনে তাঁকে আমি বল্লাম—আমরা যারা স্বেচ্ছাসেবক আছি তারা জাপানীদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত; কিন্তু যারা স্বেচ্ছাসেবক নয় তারা এসব না ক'রে যুদ্ধ-বন্দী থেকে বন্দীর মত ব্যবহারই পেতে চায়। ভারতীয়-স্বাধীনতার কথা ভারতীয়েরাই ভাব্বে—কোন ভারতীয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত করা জাপানীদের উচিত হ'বে না। জাপানীদের সম্পর্কে আমি শুধু তাঁকে এই কথা বলতে পারি—ইংরেজ ও আমেরিকানদের সাথে তাঁ'দের যে যুদ্ধ হ'চ্ছে এ যুদ্ধে আমরা নিজেদের সাধ্যমত

তাঁদের সাহায্য ক'রব। আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে আমরা স্বেচ্ছাসেবকেরা ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়ে সাহায্য করব—আর যারা স্বেচ্ছাসেবক নয় তারা পিছনে থেকে রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিমানঘাঁটি ইত্যাদি নির্ম্মাণ ক'রে পরোক্ষভাবে সাহায্য ক'রবে।

আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হ'য়ে ব'ল্লেন—এ তাঁ'দের পক্ষেও ভাল: শেষোক্ত কাজই প্রথমোক্ত কাজের চেয়ে তাঁ'দের বেশী দরকারী। তিনি আরও বল্লেন—মালয়ে তাঁর অধীনস্থ সকল কম্যাণ্ডারকেই তিনি জানিয়ে দেবেন যে, স্বেচ্ছাসেবকদের যুদ্ধকার্য্যে এবং অ-স্বেচ্ছাসেবকদের শ্রমিকের কার্য্যে যেন নিযুক্ত করা হয়।

এই সময়ে সেরেম্বন শিবিরে একটি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে: সেখানকার যুদ্ধ-বন্দীরা লড়াই ক'রতে অস্বীকার করায় শিবিরের চারিদিকে 'মেশিন গান' পাতা হয় এবং শিবিরের কম্যাণ্ডার—৩।১৬শ পাঞ্জাব রাইফেলসের ক্যাপ্টেন গুলাম মোহাম্মদকে কারারুদ্ধ ক'রে যুদ্ধ-বন্দীদের চব্বিশ ঘণ্টা ভাবতে সময় দেওয়া হয়। তা'দের বলা হয়—ঐ সময়ের পরেও যদি তারা লড়তে রাজী না হয়, তবে তা'দের সবারই প্রাণদণ্ড হ'বে। কথাটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি কুয়েলা লামপুরে জাপানী কম্যাণ্ডার যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তারই কাগজপত্র সঙ্গে ক'রে সেরেম্বনে ছুট্লাম। শিবিরের কম্যাণ্ডার আমার কথা প্রথমে বুঝতেই চান না—শেষে অনেক বাদানুবাদের পর আমি তাঁকে বুঝিয়ে ছাড়লাম।

মালয়ের যেখানে যেখানে যুদ্ধ-বন্দীদের কাজে লাগান হ'য়েছিল সেই সব জায়গাই আমি গিয়ে দেখেছি—যাতে তা'দের যুদ্ধ ক'রতে বা জাপানীদের হাতে সামরিক শিক্ষা নিতে বাধ্য করা না হয়।

চব্বিশ জন যুদ্ধ-বন্দীর প্রাণদণ্ডের আয়োজন

একবার আমি শিবির ছেড়ে শফরে বেরিয়েছিলাম, সেই অবসরে ৪২তম ফিল্ড পার্ক কোং, রয়াল বম্বে এস্, এ্যাণ্ড এম্, ইউনিটের চব্বিশ জন নন্‌কমিশান্‌ড অফিসারকে প্রাণদণ্ড দেবে ব'লে ধরে নিয়ে যায়। তা'দের না কি অপরাধ তারা বড় বেশী ব্রিটিশ-পক্ষপাতী। তা'দের দিয়ে তা'দের শেষ উইল পর্য্যন্ত লিখিয়ে নেওয়া হয়। আমি ফিরে এসে এইকথা শুনবামাত্র জাপানীদের জেনারেল হেড্-কোয়ার্টারে গিয়ে তা'দের ফিরিয়ে দিতে বলি। আমি জানাই—আমি ঐ চব্বিশ জন অফিসারের কম্যাণ্ডার, সুতরাং আমাকে না জানিয়ে, আমার সম্মতি না নিয়ে তা'দের কোন কিছু করা নীতিবিরুদ্ধ। যদি জিদ ক'রে এই রকম কিছু করা হয়—তা'হলে আমি পদত্যাগ-পত্র দাখিল ক'রব। উত্তরে তাঁরা বলেন—আমি ইচ্ছা ক'রলে ওদের পনের জনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বাকী ন' জনের তাঁরা প্রাণ-দণ্ড দেবেনই, ওঁরা বড় বেশী ব্রিটিশের পক্ষপাতী। জাপানীদের হাতে বন্দী হ'য়েও ওঁরা বলেন, ইংলণ্ডের রাজার প্রতি ওঁরা আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন।

এই শপথের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ক'রে দিয়ে আমি তা'দের বল্‌লাম—ভারতীয় সৈন্যদের কেউ কোন গুরুতর অপরাধ ক'রলে নিয়ম হ'চ্ছে প্রথম একটা 'অনুসন্ধান-সভা' (Court of Enquiry) বসানো, আমি এরূপ একটা সভা আহ্বান ক'রে ওদের অপরাধ বিচার ক'রতে রাজী আছি এবং বিচারে ওরা যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে আমি নিজেই ওদের শাস্তির জন্য জাপানীদের হাতে তুলে দেব কথা দিচ্ছি।

জাপানীরা আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। আমি সেই চব্বিশ জন 'নন্‌কমিশান্‌ড' অফিসারকে তা'দের নিজের ইউনিটে ফিরিয়ে এনে একটা 'অনুসন্ধান সভা' বসানোর পর মুক্তি দিলাম।

মালয় এবং সিঙ্গাপুরে জাপানীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে যখন জোর ক'রে ভারতীয় সৈন্যদের নিযুক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রছে—সেই সময়ে ব্যাঙ্কক, বার্লিন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় নেতারা ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য সংগ্রামের আয়োজন ক'রছেন। আমরা ভারতীয় সৈন্যেরা যদিও মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতার জন্য পাগল তবু জাপানীরা যে আমাদের দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল ক'রে নেবে—এ আমাদের অসহ্য। এই মহাসঙ্কটময় অবস্থায় আমি একদিন বার্লিন রেডিও থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এক বেতার বক্তৃতা শুন্‌লাম।

জাপানীরা আমাদের রেডিও সেট সব বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিল, তা' সত্ত্বেও আমাদের কেউ কেউ অনেক কৌশলে

কয়েকটা সেট আমাদের শিবিরে লুকিয়ে রেখেছিল। নেতাজীর দৃঢ় কণ্ঠস্বর আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। বক্তৃতা বেতারে হ'লেও তা' শুনে আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম— তিনি কত বড় বক্তা। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা ক'রতে লাগলাম—তিনি আসুন, এসে নিজে ভাবতের মুক্তিসংগ্রামে আমাদের পরিচালনা করুন—জাপানীরা যে আমাদের দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেবার আয়োজন ক'রছে এ থেকে আমাদেব বক্ষা করুন।

নেতাজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ তাঁর নিজের ভাষায় এখানে উদ্ধৃত হ'ল :—

"...ব্রিটিশদেব প্রচার সত্ত্বেও কোন বুদ্ধিমান ভারতীয়ের বুঝতে বাকী নেই যে এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরে ভারতের একমাত্র শত্রু হ'চ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এই শত্রু শতাধিক বর্ষ ধবে ভারতবর্ষকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োগ ক'রে আসছে--ভারতমাতার হৃদয়শোণিত শোষণ ক'রে এ আপন দেহ পুষ্ট কবে আসছে......ত্রিশক্তির সমর্থন ক'রে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না, আমার কাজ তা' নয়,—আমার কাজ হ'চ্ছে শুধু ভারতবর্ষকে নিয়ে......ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় হ'লেই হ'বে ভারতের মুক্তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি কোনরূপে বিজয়ী হয়, ভারতবর্ষকে তা' হ'লে চিরকাল দাসত্বের জ্বালা ভোগ ক'রতে হ'বে। তাই ভারতকে আজ বেছে নিতে হ'বে—দাসত্ব আর স্বাধীনতা—এর ভিতর কোন্‌টিকে সে বরণ ক'রে নেবে।...

ব্রিটেনের বেতনভোগী প্রচারকেরা আমাকে বলে শত্রু-পক্ষের 'এজেন্ট'। নিজের দেশের লোকের কাছে আমার কোন সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সারাজীবন ধরে আমি অবিরাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি, আপোষের কথা মনেও স্থান দেই নি। আমার সদভিপ্রায়ের এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর নেই।···সারাজীবন আমি ভারতের সেবা ক'রে এসেছি এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাই ক'রব। পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন—ভারতই আমার সর্ব্বস্ব—ভারতের মঙ্গলই আমার মঙ্গল। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যুদ্ধের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে আপনারা আমারই মত সমর্থন ক'রে বল্‌বেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের সময় অতি সন্নিকট। এরই মধ্যে ভারত মহাসাগরের নৌঘাঁটিগুলি ব্রিটিশের হাতছাড়া হ'য়ে গেছে। মান্দালয়ের পতন হ'য়েছে, পরাজিত সৈন্যদল ব্রহ্মদেশ থেকে এক রকম বিতাড়িত হ'য়েছে বল্‌লেই হয়।···দেশবাসিগণ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেমন ধ্বংসের পথে চলেছে, ভারতের স্বাধীনতার দিনও তেম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আস্‌ছে। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ১৮৫৭ সালের কথা—ভারতবর্ষ যেদিন তার প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু ক'রে—আর ১৯৪২ সালের মে মাসে যা' আরম্ভ হ'য়েছে—এই হ'চ্ছে তার স্বাধীনতা লাভের শেষ সংগ্রাম। সুতরাং ভাই সব, আপনারা প্রস্তুত হ'ন, ভারতের মুক্তির দিন আজ অতি সন্নিকট······"

'ভারত ছাড়'—প্রস্তাব ও কুয়েলা লামপুরে ভারতীয় জনসমাবেশ

১৯৪২ সালের ১১ই আগষ্ট মালয়ে খবর এল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বোম্বাই-য়ে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক সভায় দাবী ক'রেছেন—ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ ক'রে যেতে হ'বে। এই সভায় দেশভক্তদের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর বাণী হ'চ্ছে—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে",—"নেতাদের আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই, নিজের বুদ্ধিতে যা' ভাল বোঝ ক'রে যাও,—ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রতে যা' প্রয়োজন বোধ কর, ক'রে যাও।"

কুয়েলা লামপুরের ভারতীয়েরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ এবং মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ নেতাদের কারাদণ্ডের প্রতিবাদ ক'রবার জন্য এক স্থানে মিলিত হ'বে সাব্যস্ত করে। ঐ দিন সকালে জাপানী লিয়েজং-অফিসার লেফটন্যাণ্ট নিউই আমার কাছে এসে বল্‌লেন,—কুয়েলা লামপুর এলেকার সেনাধ্যক্ষ জানতে চেয়েছেন—আমার সৈন্যদল ও আমি এই 'জমায়েতে' যোগদান ক'রব কি না। আমি বল্‌লাম—হ্যাঁ। তিনি বল্‌লেন—তা'হলে আমাদের দলের সামনে জাপানী পতাকা ও ভারতীয় জাতীয় পতাকা আড়াআড়ি ক'রে একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ঐ জনসভায় মার্চ্চ ক'রে যেতে হ'বে; কারণ এটা হ'বে জাপানী ও ভারতীয়দের পরস্পরের

প্রতি শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রতীক। আমি তাঁকে বল্‌লাম—তিনি যেন জেনারেলকে জানান—এরূপ ক'রে যেতে হ'লে আমি সভায় যোগদানই ক'রব না। ভারতীয়েরা এমনি ক'রে অপর দেশের পতাকা নিজেদের কাঁধে বহন ক'রতে রাজী নয়– আর যদি জাপানীদের মতলব হয়, তাঁরা জগৎবাসীকে দেখাবেন যে ভারতীয়দের দ্বারা জাপানী-পতাকা বহন করিয়েছেন—তা'হলে তাঁদের ভারতীয়দের উপর জবরদস্তি ক'রে এটা করিয়ে নিতে হ'বে, নইলে স্বেচ্ছায় এ কাজ তারা ক'রবে না। অবশেষে তাঁকে আমি স্পষ্ট বলে দিলাম—সভায় আমরা যদি যাই-ই তবে আমাদের জাতীয় পতাকা বহন ক'রেই সেখানে যাব, জাপানী-পতাকা হাতে ক'রে নয়। লেফট্‌, নিউই জেনারেলের কাছে গিয়ে আমার কথা সব বল্‌লেন। ফলে আমি যেমন ক'রে সভায় যেতে চেয়েছিলাম তেমনি ক'রে যেতে দেওয়া তো হ'লই বরং তার উপর তিনি আবার হুকুম জারী ক'রলেন—কোন অ-সামরিক লোক জাপানী পতাকা বহন বা প্রদর্শন ক'রতে পারবে না।

আমরা যথাসময়ে সভায় গিয়ে হাজির হ'লাম। সভার স্থান হ'য়েছে কুয়েলা লামপুরের এক বিরাট ময়দানে। নানাজাতীয় প্রায় ৪৫০০০ লোকের সমাবেশ হ'য়েছে এখানে—এর মধ্যে উচ্চপদস্থ অনেক জাপানী রাজকর্ম্মচারীও রয়েছেন।

ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটা বক্তৃতা দিতে বলা হ'ল আমায়। আমার বক্তৃতায় আমি বল্‌লাম—"আজাদ

হিন্দ ফৌজ জাপানীদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলি হ'তে যাচ্ছে—এ ভুল ধারণা যেন কা'রো মনে স্থান না পায়।···যদি কখনও দেখি জাপানীরা ভারতের প্রতি কোন কু-অভিসন্ধি পোষণ ক'রছেন তা'হলে তা'দের সঙ্গেই আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ করব।" আমি ভারতীয়দের আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম,—জাপানীদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলি হ'বার চেয়ে ভারতের সম্মান বজায় রাখতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়াই আমরা অধিকতর কাম্য বলে মনে ক'রব। আমার এই বক্তৃতা শুনে ভারতীয় জনতার ভিতরে একটা সাড়া পড়ে যায়, তারা সব আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে। জাপানের ভয়ে যখন সবাই সশঙ্কিত, তখন কারুর এরূপ একটা উক্তি করা বিশেষ তুঃসাহসের কাজ বলে তারা মনে ক'রে থাকবে। আমার বক্তৃতাটি 'রেকর্ডে' তুলে নেওয়া হয়। পরদিন জাপানী জেনারেল আমার সঙ্গে দেখা ক'রে আমার বক্তৃতার জন্য অভিনন্দিত ক'রে বলেন—জাপানীরা যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের স্থান অধিকার করবার অভিপ্রায় নিয়ে যান, তখন তাঁ'দের সঙ্গে যুদ্ধ করাই ভারতীয়দের কর্ত্তব্য হ'বে—নইলে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হ'বে।

১৯৪২ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি যতদিন আমি মালয়ের যুদ্ধ-বন্দীদের কম্যাণ্ডার ছিলাম, ততদিন তা'দের মঙ্গলের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি। অনেক সময় আমাকে মালগাড়িতে অনাহারে ভ্রমণ ক'রতে হ'ত—আমার অধীনস্থ লোকদের রক্ষা ক'রতে গিয়ে অনেক সময় নিম্ন-

পদস্থ জাপানী অফিসারের হাতে লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য ক'রতে হ'ত। ভারতীয় বন্দীদের আমি কখনও জাপানের স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে নিয়োগ ক'রতে দেই নি, শুধু তাই নয়—পূর্ব্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে তা'রাই আমার চেষ্টায় জাপানীদের হাতে সব চেয়ে ভাল ব্যবহার পেয়েছে।

স্বদেশের মান-মর্য্যাদাকেই আমি সবার চেয়ে বড় আসন দিতাম এবং জাপানীরা ভারতীয়দের চেয়ে নিজেদের বড় জাতি বলে বড়াই ক'রবে—এ আমি কখনও বরদাস্ত করতাম না। যে সব ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধ চলবার সময়েই সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে সৎপথে থেকে কোন কিছু ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রছে—তা'দের জাপানীরা যাতে বন্দী না করে তার ব্যবস্থাও আমি ক'রেছিলাম।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য প্রচারকার্য্য

ব্যাঙ্ককের বৈঠক থেকে প্রতিনিধিরা ফিরে এলে সেখানে গৃহীত প্রস্তাবগুলি নিয়ে বড় বড় অফিসারদের ভিতরেই শুধু আলোচনা হয়—টোকিও থেকে প্রস্তাবগুলি সরকারিভাবে মেনে নেওয়া হ'য়েছে এ খবর না আসা পর্য্যন্ত সেগুলি অন্যান্য সবার কাছে গোপন রাখা হয়।

কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অফিসারের উপর বিভিন্ন শিবিরে গিয়ে ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাবগুলি সৈনিকদের কাছে ব্যাখ্যা ক'রবার ভার দেওয়া হয়। জাতীয়তা সম্বন্ধে বহু বক্তৃতাও

দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের গুরুতর দায়িত্বের কথাও সৈনিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এইসময় যারা সৈনিকদের ভিতরে এই আন্দোলন বিনষ্ট করবার প্রয়াস পাচ্ছিল—ক্যাপ্টেন মোহন সিং তা'দের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যে সব অফিসারের মধ্যে বিরুদ্ধভাব দেখা গিয়েছিল তা'দের নিজ নিজ ইউনিট থেকে পৃথক ক'রে স্বতন্ত্র অবরোধ শিবিরে রাখা হ'য়েছিল।

মালয়ের জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুর বেতার ষ্টেশন থেকে ভারতীয়-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের প্রচার কর্ম্মসূচী ঘোষণা ক'রবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মিঃ কে, পি, কে, মেননকে সঙ্ঘের প্রচার-কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হ'ল। আই, এম্, এস্, মেজর ইর্শাদ আলি সাহেবজাদার উপর বেতার বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মপরিচালনার ভার অর্পিত হ'ল। বেতার-যোগে ভারতীয় সৈনিক ও অ-সামরিক ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষে তাঁ'দের বাণী পাঠাতে লাগলেন—ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের বিশিষ্ট সভ্যগণ ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণ নিয়মিত বক্তৃতা ক'রতে লাগলেন।

কয়েকজন অফিসার আগেই সাইগন ও ব্যাঙ্ককে গিয়ে ওখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের ভার নেন। সাইগন বেতার কেন্দ্র থেকে কর্ণেল ইশান কাদির, কর্ণেল নাগর এবং কর্ণেল আই, হাসানের বেতার বক্তৃতা ভারতবর্ষের লোকেরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন।

সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ নামে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের পরিচালনায় একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। এই পত্রিকাখানি ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, রোমান উর্দ্দু ও গুজরাটি ভাষায় মুদ্রিত হ'ত।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন

ব্যাঙ্কক বৈঠকেব কিছু পরেই মেজর ফুজিয়ারা বদলি হ'য়ে গেলেন এবং তাঁর কর্ম্মভার গ্রহণ ক'রলেন 'ইয়াকুরো কিকন' এর এক কর্ণেল। এই বিভাগ থেকে ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া হ'ত। যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা, যানবাহন ইত্যাদি জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিতে পারবে—তা' তারা ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে জানিয়ে দিলে। তারা আরও জানিয়ে দিলে—আজাদ হিন্দ ফৌজকে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে ন্যস্ত এইসব রণসম্ভার দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হ'বে।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং মেজর এম্, জেড, কিয়ানীকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিস্তারিত ব্যবস্থা ক'রবার ভার দিলেন। ঠিক হ'ল, ফৌজে নানা পদস্থ অফিসার ও সাধারণ সৈনিক মিলে মোট ১৫০০০ লোক থাকবে। ইউনিটগুলির শ্রেণী ও বিভাগ করা হ'বে এইরূপ—

তিনটি গেরিলা বাহিনী :
- গান্ধী গেরিলা রেজিমেণ্ট
- আজাদ গেরিলা রেজিমেণ্ট
- নেহরু গেরিলা রেজিমেণ্ট

একটি	স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ্…বাহাদুর
"	ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ্
"	রি-ইন্‌ফোর্সমেণ্ট গ্রুপ্
"	রেজিমেণ্ট অব্ ফিল্ড ফোর্স… প্রথম হিন্দ ফিল্ড ফোর্স
"	আর্টিলারি ইউনিট
"	সাঁজোয়া গাড়ি ইউনিট
"	ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট
"	এম, টি, কোম্পানী
"	মেডিক্যাল এইড্ পার্টি
"	বেস্ হস্‌পিটাল
"	অফিসার্স ট্রেণিং স্কুল

আজাদ হিন্দের জেনারেল ষ্টাফ্, প্রচার বিভাগ ও অন্যান্য পরিচালনা বিভাগের হেড্-কোয়ার্টার্স।

অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা, লোকসংখ্যা ও তার শ্রেণী বিভাগ, যানবাহনাদি প্রভৃতির বণ্টন ইত্যাদির ব্যবস্থা আজাদ হিন্দের হেড্-কোয়ার্টার্সের জেনারেল ষ্টাফ্ বিভাগই ক'রলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভবিষ্যতে আরও প্রসার ক'রতে গেলে আরও অফিসারের প্রয়োজন। অ-সামরিক ভারতীয় এবং নিম্নপদস্থ লোকদের শিক্ষা দিয়ে অফিসার ক'রে গড়ে তুলতে একটা অফিসার্স ট্রেণিং স্কুল খোলা হ'ল। ভারতীয় সৈন্য-দলের কয়েকজন অফিসারকে এখানকার শিক্ষক ক'রে দেওয়া হ'ল।

ভারতীয় সৈন্যদলের পুরানো ইউনিটগুলি যথাসম্ভব ঠিক রেখে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন ইউনিটভুক্ত ক'রে নেওয়া হ'ল। বিভিন্ন ইউনিটের অফিসারদের যেটুকু ওলোট-পালোট না ক'রলে নয় তাই কেবল করা হ'ল।

যে সব অফিসার এবং সৈনিক আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন নি, তাঁ'দের যুদ্ধবন্দীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক একটি হেড্-কোয়ার্টার্সের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হ'ল। এই হেড্-কোয়ার্টার্সের পরিচালনার ভার ছিল 'বাহাওয়ালপুর ষ্টেট্ ফোর্স'এর মেজর এ, বি, মির্জার উপর। আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড্-কোয়ার্টার্সের নির্দ্দেশ মত এঁকে চলতে হ'ত।

ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় অ-সামরিকদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

ব্যাঙ্ককে সভা হ'বার পর, ঐ সভার প্রস্তাব অনুসারে কর্ম্মপরিষদের তত্ত্বাবধানে পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কেন্দ্রগুলি পুনরায় ভাল ক'রে গড়ে তোলা হ'ল। প্রত্যেক কেন্দ্রে সভাপতি ও স্থানীয় অ-সামরিক লোকের কমিটি নির্ব্বাচিত হ'ল। এইসব কমিটির প্রধান কাজ হচ্ছে—তা'দের বিভিন্ন এলাকাধীন ভারতীয়দের যাতে সবদিকে মঙ্গল হয় তা' দেখা এবং প্রয়োজন মত সাহায্য করা। জাপানীরা যে সব শ্রমিক চায় তা' সংগ্রহ ও বিলিব্যবস্থা করাও এই কমিটির কাজের অন্তর্ভুক্ত।

নিজেদের এলাকায় সামরিক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা এইসব কমিটির ক'রতে হ'ত না, তবে মাঝে মাঝে বক্তৃতা-সভার ব্যবস্থা ক'রে ভারতীয়দের অপেক্ষাকৃত ভাল নাগরিক ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রতে হ'ত। কর্ম্মপরিষদ নির্দ্দেশ দেন—অ-সামরিক লোকদের আজাদ হিন্দ ফৌজের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলবার জন্য কুয়েলা লামপুরে একটা অ-সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ক'রতে হবে। বিভিন্ন অ-সামরিক কাজ ও শাসনাদি বিষয়ে শিক্ষা দে'বার জন্য পেনাং-এ এইরূপ একটা শিক্ষালয় স্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তা'দের শিক্ষা সমাপন ক'রে মালয়ের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় কমিটির কার্য্যে সহায়তা করে।

জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজ দলকে যে অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সজ্জা ইত্যাদি দিয়েছিল—সে সবই ভারতীয় ও ব্রিটিশ ধরণে তৈরী। এইজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল ষ্টাফ্ বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে ঠিক করেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শিক্ষাও ভারতীয় সৈন্যদলের শিক্ষাদান রীতিতে দেওয়া হ'বে। তাঁরা আরও সাব্যস্ত করেন—এদের শিক্ষা জাপানী রীতিতে না দিয়ে এমন একটা পদ্ধতিতে দেওয়া হ'বে যা' ভারতীয়দের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ব্রিটিশদের ওখানে ভারতীয় সৈন্যদের যে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তার চেয়ে এ হ'বে আরও বেশী উন্নত ধরণের—তা' হ'লেই আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল অধিকতর রণকুশল হ'য়ে উঠবে। জেনারেল ষ্টাফ্ এইসব পরামর্শ দিলেও প্রত্যেক

ইউনিটের কম্যাণ্ডারকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল—তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত নিজ নিজ দলের কর্ম্মোপযোগী শিক্ষা দিতে পারবেন। কোন গ্রন্থ হাতে না থাকায় এবং অভিজ্ঞতার অভাবে শিক্ষাদান সম্বন্ধে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হ'য়েছিল, কিন্তু কাজে হাত দিয়ে অফিসারেরা ক্রমে নিজের নিজের পদ্ধতি নিজেরাই স্থির ক'রে নিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের জেনারেল ষ্টাফ্ এরপর অফিসারদের ব্যবহারের জন্য 'ট্রেণিং ম্যানুয়াল' ও পুস্তিকা প্রকাশ ক'রেছিলেন।

সর্ব্বশ্রেণীর সৈনিকদের মধ্যে জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি ক'রবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের দাস-মনোভাব এবং টাকা-পয়সার লোভ—এই দুইটিই আজাদ হিন্দ ফৌজে কাজ ক'রবার পক্ষে প্রথম অন্তরায়, তাই আগেই এই দুইটিকে দূর ক'রতে চেষ্টা করা হয়। অফিসারদের বিশেষ ক'রে ব'লে দেওয়া হ'য়েছিল---তাঁরা যেন নিজ নিজ সৈন্যদলের সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে তারা সবাই ভারতীয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় অফিসার নিয়ে গঠিত—উদ্দেশ্য ভারতীয়-স্বাধীনতা অর্জ্জন—এই স্বাধীনতা আত্মমর্য্যাদা, দায়িত্ববোধ এবং জাতীয় মনোভাব ছাড়া কেউ কোনদিন লাভ ক'রতে পারে না।

সাধারণ সৈনিকদেরও শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছিল—জাতি-ধর্ম্ম তা'দের যা-ই হ'ক না কেন সর্ব্বাগ্রে তারা ভারতীয়। ক্রমে আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে বিভিন্ন জায়গায় রান্নার ব্যবস্থা এবং

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য বাধা উঠিয়ে দেওয়া হয়। আহার, বাসস্থান ও কাজ-কর্ম্মে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে সব রকম পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়।

ইংরেজী ভাষায় হুকুম দেওয়ার পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানীতে হুকুম দেওয়া হ'তে লাগল। কংগ্রেসের পতাকাকে আজাদ হিন্দের পতাকা ক'রে নেওয়া হ'ল।

সৈন্যদের শিক্ষাদান বিষয়ে জাপানীদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না নেওয়ারই চেষ্টা করা হ'ত।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরে আমার পুনরাহ্বান

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমায় আবার সিঙ্গাপুরে ডেকে ওখানকার অফিসার্স ট্রেণিং স্কুলে কম্যাড্যান্ট কর্ণেল ভগৎ সিং-এর সহকারী ক'রে দেওয়া হ'ল। পরে ভগৎ সিং ওখান থেকে বদলী হ'লে আমিই ঐ স্কুলের কম্যাড্যান্ট নিযুক্ত হলাম। ১৯৪২এর নভেম্বর মাস থেকে এই স্কুলের কাজ সুরু হয় এবং জেনারেল মোহন সিং-এর আদেশে কয়েকদিন পরেই আবার স্কুল ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের কাছে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রথমেই আমি বলি—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার এবং এ লাভ ক'রতে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমরা লড়ব—আর জাপানীদের মনে যদি কোনদিন ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব ক'রবার অভিপ্রায় আছে দেখি, তবে তা'দের সঙ্গে লড়তেও আমরা কসুর ক'রব না। আমি তা'দের বলি—প্রাক্তন সৈনিকদেরও ফৌজে যোগদান ক'রবাব অধিকার আছে, কারণ আনুগত্যের যে শপথ তারা নিয়েছিল সে তা'দের দেশের প্রতি, নিজেদের বিচারে দেশসেবার নতুন পথের সন্ধান যদি তারা পায়, তবে সেই পথ অনুসরণ ক'রে তা'দের দেশ-সেবা তারা ক'রবে তা'তে বাধা কি! প্রাক্তন সৈনিকদের বলি—তারা যদি মনে করে ফৌজে যোগদানই এখন দেশ-সেবার প্রকৃষ্ট পথ তবে তা'দের তে যোগ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আমি আমার বক্তৃতায় আরও

বলি—ভারতবর্ষ বারবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, বারবার তার সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। দেড় শ' বৎসর বিদেশীর শাসনাধীনে থেকেও তার স্বাধীন হ'বার আকাঙ্ক্ষা মন্দীভূত হয় নি—আজিকার তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক তীব্রতর। ভারতমাতা দেখেছেন—তাঁর বীর সন্তানেরা জননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন ক'রতে যাওয়ার অপরাধে অত্যাচারী শাসকের হাতে অশেষ দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা ভোগ ক'রেছে। আমাদেরও আজ ঐ একই কারণে সেই উৎপীড়কের হাতে নির্য্যাতন ভোগের পালা। যুগের পর যুগ নব নব দল অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বারবার এই একই চেষ্টা ক'রে আসছে। সংগ্রাম ও মৃত্যুর চক্র অবিরাম চলেছে—ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই! পরাজয় স্বীকার আমরা কোন দিন করি নি। অদম্য উৎসাহ নিয়ে স্বাধীনতার বহ্নিশিখা আমরা হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখেছি। যদিও ওরা আমাদের কেরাণী আর মজুরের জাতিতে পরিণত ক'রেছে—আমাদের হৃদয়-অনল নির্ব্বাপিত ক'রতে পারে নি। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ আর বন্যায় প্রাণ দিয়েছে কিন্তু যাবার আগে তারা তা'দের সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে স্বাধীনতার সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বালিত ক'রে গেছে। কালে আবার সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে বিপুল অগ্নিশিখার উদ্ভব হ'য়েছে। আজ আমাদের দিন এসেছে—আমাদের হৃদয়ের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আজ বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি ক'রবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশকে যে অন্ধ-কারাগারে

পরিণত ক'রেছে—আজ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় আমরা সেই কারা-প্রাচীর ভস্মীভূত ক'রব।

আমি নিজে তখনও জাপানীদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রতে পারি নি; সুতরাং আমি অফিসারদের ভিতরে এমন একটি মনোভাব সৃষ্টি ক'রতে লাগলাম—যাতে যখনই তাঁরা বুঝবেন জাপানীরা ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব ক'রবার উদ্যোগ ক'রছে তখনই তাঁরা তা'দের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেমে যাবেন।

যুদ্ধবন্দীদের শিবির পরিদর্শন

সিঙ্গাপুরে এসে প্রথমেই আমি সব যুদ্ধবন্দী-শিবিরগুলি পরিদর্শন করি। আমি নিজে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক হ'লেও—যেসব যুদ্ধবন্দী এতে যোগ দেয় নি তা'দের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। বস্তুতঃ তা'দের রক্ষা ক'রবার অভিপ্রায়েই আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলাম। ওদের শিবির পরিদর্শনে গিয়ে দেখ্‌লাম—আমি চ'লে আসার পর ওদের সঙ্গে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করা হ'য়েছে, তা'দের অনেককে বিশেষ ক'বে অফিসারদের নিজের নিজের দল ছাড়িয়ে পৃথক শিবিরে রাখা হ'য়েছে।

নির্য্যাতনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সিলেটের শিবিরে প্রায় ৬০০০ যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজে নাম লেখায়। তা'দের উদ্দেশ্য—এমনি ক'রে নাম লিখিয়ে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধেই লড়তে সুরু ক'রে

দেবে। এমনি ক'রে অনিচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবককে দলে টানা আমার কোনদিনই ইচ্ছা নয়—কারণ সঙ্কটকালে তারাই আমাদের বিপদে ফেলবে বেশী। ব্যাপারটি আমি জেনারেল মোহন সিং-এর কর্ণগোচর ক'র্‌লে তিনি বল্‌লেন—না, জোর জবরদস্তি বা বাধ্য ক'রে কাউকেই আজাদ হিন্দ ফৌজে ভর্ত্তি করা হয় নি। আমি নিজে তাঁকে সঙ্গে ক'রে সিলেতের শিবিরে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে কথা ব'লে তিনি বুঝলেন—আমার কথাই সত্য। যাঁরা এমনি বাধ্য হ'য়ে স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখিয়েছেন তাঁ'দের নামের তালিকা তিনি ছিঁড়ে ফেলতে হুকুম দিলেন।

আসল ব্যাপার হচ্ছে—স্থানীয় ভারতীয় শিবিরের কম্যানড্যান্টরা নিজেরা যে খুব কাজ ক'রছেন জেনারেল মোহন সিংকে তাই দেখাতে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের একটা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল ক'রতে চাইতেন। যত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা তাঁ'দের পক্ষে সম্ভব তার চেয়ে বেশী দেখাতে গিয়ে এইসব গোলমালের সৃষ্টি—অথচ আসল ব্যাপার জেনারেল মোহন সিং-এর কানে পৌঁছত না।

সমস্যা

জাপানীদের সঙ্গে পরিচয় হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই তা'দের ব্যবহারে আমরা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। মুখে তারা যা'দের রক্ষা ক'রবে বলে, তা'দের সঙ্গেই যে তারা এমন ব্যবহার কেমন ক'রে করে আশ্চর্য্য! আমাদের বিরক্তি আরও বেড়ে

উঠ্‌ল যখন আমরা স্বচক্ষে দেখ্‌লাম—জাপানী সৈন্যেরা অধিকৃত দেশে অবাধে লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি চালাচ্ছে। নিজেদের মনে প্রশ্ন জাগত,—"আমাদের সঙ্গে ভারতবর্ষে যখন ওরা যাবে তখন সেখানে গিয়েও এইরকম ক'রবে না কি?" তা' ছাড়া যতই আমরা ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌ছিলাম ততই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ জাগছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই—যখন আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে সুরু ক'রলাম, তখন ওরা আমাদের কামান বন্দুক দিল বটে কিন্তু ঠিক মত নিরিখ ক'রবার উপযোগী কোন যন্ত্রপাতি সঙ্গে দিল না। আজাদ হিন্দ দলকে বিশ্বাস ক'রে গোলা-গুলী বোমা ইত্যাদিও তারা দেয় নি। ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়িগুলি দিয়েছিল শুধু প্যারেড্‌ ক'রবার এবং প্রচার বিভাগের ফটো তোলার কার্য্যে সাহায্য ক'রবার জন্যে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে একটুও যার ধারণা আছে—তিনি দেখলেই বুঝতেন যে জাপানীরা ইচ্ছা ক'রেই আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজসজ্জা দেয় নি, আর এইসব ঠিক মত না পেলে আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত শত্রুদলের সঙ্গে ল'ড়ে জিতবার সম্ভাবনাও কারো নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনদিন সত্যি সত্যি যুদ্ধ ক'রতে হয়—এ ইচ্ছা হয় ত' জাপানীদের ছিল না। যাই হ'ক, আমরা সবাই ভাব্‌তাম—জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে বেশী শক্তিশালী ক'রতে মনে মনে ভয় পায়, নইলে তা'দের

বিশ্বাস ক'রবে না কেন? এইসব নানা কথা ভেবে আমরা জাপানীদের সম্বন্ধে ক্রমে সন্দিহান হ'য়ে উঠলাম—মুখে তারা আমাদের যতই ভাল ক'রবে বলুক না কেন, আমরা তা'দের কথায় আর বিশ্বাস ক'রতাম না।

তা' ছাড়া আমরা বেশ ভাল ক'রে জানতাম—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জাপানের রাজ্য-প্রসারণ-নীতির ঘোর বিরোধী; সুতরাং যে কোন কারণেই হ'ক জাপানকে ভারতে আনবার পরিকল্পনা কংগ্রেস অনুমোদন ক'রবেন না। ওদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেতার যোগে বার্লিন থেকে আমাদের বলছেন—ভারতবর্ষে এগিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস ক'রতে। এদিকে বাঙলা ও বিহারে যে সব ব্যাপার ঘটছে এবং ব্রিটিশেরা কি ক'রে ১৯৪২ সালের আন্দোলন দমন ক'রতে চেষ্টা ক'রছেন—সব কথাই আমাদের কানে আসছে।

এইসব নানা কারণে আমারা উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেলাম—কোন্ পথ অনুসরণ করা ঠিক হ'বে বুঝতে পারছিলাম না। আসল কথা—জাপানীদের সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা ভারতবর্ষে গিয়ে উঠি তা'হলে দেশবাসী আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে নেবে,না মুখে থুথু দেবে—এ সম্বন্ধে মনে সংশয় জাগছিল।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে আমাদের সবার মনের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময়ে জেনারেল মোহন সিং কর্ণেল গিলকে কয়েকজন নির্ব্বাচিত বিশ্বস্ত অফিসার সমভিব্যাহারে ব্রহ্ম সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন—উদ্দেশ্য,

এঁরা গোপনে ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রবেন। কথা ছিল—এইসব অফিসারেরা ভারতবর্ষের নেতাদের সংস্পর্শে এসে সেখানকার সত্যিকার অবস্থা আমাদের জানাবেন। বেতারে সংবাদ পাঠানোর যন্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এঁরা সঙ্গে নিয়ে চললেন।

সীমান্তে উপস্থিত হ'বার পর দলের একজন নামকরা অফিসার বিশ্বাসঘাতকতা ক'বে ব্রিটিশ দলে গিয়ে যোগ দিয়ে দলের সকলকে ধরিয়ে দিলেন। ইনি জেনারেল মোহন সিং-এর একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। শুনা যায়—ইনি ভারতবর্ষে এসে এঁর সিঙ্গাপুর থেকে পলায়নের অনেক অলীক রোমহর্ষণ কাহিনী বলেছেন। আসবার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের অতি গোপন তথ্যপূর্ণ কতকগুলি কাগজপত্র তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। তাঁর নিজের দেশ এবং দেশবাসীর প্রতি এই কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সভ্য" এই উপাধিতে ভূষিত করা হ'য়েছে। বেচারা কর্ণেল গিল এই বিশ্বাসঘাতকতায় এমন মর্ম্মাহত হ'লেন যে, সব চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে ভগ্ন-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন। এর পর থেকে জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। দুই দলের মধ্যে পরস্পর সন্দেহের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলল। কয়েক সপ্তাহ পরে আর একটা ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হয়—যার ফলে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে যায়, আর জেনারেল মোহন সিং হ'ন বন্দী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কট এবং ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ

১৯৪২ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে জেনারেল মোহন সিং কুয়েলা লামপুর থেকে মেজর রামস্বরূপের নেতৃত্বে কয়েকজন অফিসার ও অনেকগুলি সৈন্যকে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেন। এঁরা ওখানকার জাপানী সৈন্যদের সাথে মিলে কাজ ক'রবেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা ব্রহ্ম সীমান্তের নানা অংশে কাজ করতে থাকেন। জাপানীরা আট দশ জনের এক একটা ছোট ছোট দলে এই লোকগুলিকে ভাগ করে, তারপর বিভিন্ন দলকে এক একজন জাপানী অফিসারের অধীনে বিভিন্ন জাপানী দলের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে কাজ কর'তে বলা হয়। জাপানীরা এই লোকগুলিকে প্রচার ও গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ ক'রতে লাগল।

কর্ণেল গিল ব্রহ্মদেশে এসে যখন দেখলেন—ভারতীয় সৈন্যদের জাপানী অফিসারের অধীনে কাজ ক'রতে হচ্ছে, তখন তাঁর ক্রোধের সীমা রইল না। জাপানী হেড্-কোয়ার্টার্সের ষ্টাফ্ অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে তিনি জানলেন—সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ব্রহ্মদেশে এসে উপস্থিত হ'বে তখন তা'দেরও এইরূপ সব কাজে নিযুক্ত করা জাপানীদেব অভিপ্রায়।

১৯৪২ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক ইউনিটের কয়েকজন ক'রে লোক আগেই রেঙ্গুনে পাঠানো হয়। নভেম্বর বা ডিসেম্বরে সমগ্র আজাদ

হিন্দ ফৌজ সেখানে আসবে—তা'দের অভ্যর্থনার আয়োজন ক'রবে এরা আগে এসে।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে রেঙ্গুনে আর একটি ব্যাপার ঘটে—সেটাও জেনে রাখা দরকার। ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয়েরা জাপানীদের কাছ থেকে অনুপস্থিত ভারতীয়দের সম্পত্তি ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের হাতে অর্পণ করা হ'ক ব'লে দাবী করে। জাপানীরা এর আগেই এসব দখল ক'রে বসে আছে—তারা এ সম্পত্তি ছাড়তে রাজী হয় না। ভারতীয়েরা যখন সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য জিদ্ ক'রতে থাকে তখন 'ইয়াকুরো কিকন'এর জাপানী রাজনৈতিক পরামর্শদাতা মিঃ য়ুটনি সঙ্ঘের সভ্যদের বলেন—জাপানীদের তরফ থেকে ভারতীয় স্বাধীনতার যে সব বুলি তাঁরা শুনেছেন সে সবই বাজে, ভুঁয়ো,—জাপানীদের কাছে সুখ-সুবিধা পাওয়ার দাবীর মাত্রা যেন তাঁরা বাড়িয়ে না চলেন। জাপানী প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন ক'রে যাঁরা বসেছিলেন—এইবার মিঃ য়ুটনির কথা শুনে তাঁ'দের চোখ খুলে গেল।

কর্ণেল গিল ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে জেনারেল মোহন সিংকে সেখানকার সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্‌লেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিলেন—ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাব যদি জাপ গভর্ণমেন্ট যথানিয়মে মানিয়া না ল'ন তা'হলে তিনি যেন আর ব্রহ্মদেশে সৈন্য না পাঠান। তিনি আরও জানালেন—জাপানীরা ভারতীয়দের দ্বারা কেবল নিজেদের কাজ হাসিল

ক'রে নিচ্ছে। যে জেনারেল মোহন সিং মালয় এবং ব্রহ্মের যুদ্ধে জাপানীদের এত সহায়তা ক'রেছেন, প্রথমাবস্থায় জাপানীদের বিশ্বাস ক'রেছেন—তিনিও অবশেষে জাপানীদের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে উঠলেন। ঠিক হ'ল—ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাবাবলী জাপ গভর্ণমেন্ট মেনে না নেওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশে কোন সৈন্য প্রেরণ করা হ'বে না। জেনারেল মোহন সিং যখন এইসব সিদ্ধান্ত করছিলেন—সেইসময় কয়েকখানি জাপানী জাহাজ আজাদ হিন্দ ফৌজকে সিঙ্গাপুর থেকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাবে ব'লে বন্দরে অপেক্ষা করছিল।

এই সঙ্কটময় অবস্থায় সৈন্যদল সীমান্তে পাঠাতে অস্বীকার করার দায়িত্ব এক মাত্র নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া সমীচীন নয় বিবেচনা ক'রে জেনারেল মোহন সিং সভাপতিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম্মপরিষদের এবং ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের একটি সভা আহ্বান ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। এই সভায় যাঁরা যোগ দেন তার মধ্যে জাপানী 'লিয়াজং অর্গানিজেশানে'র অধ্যক্ষ জেনারেল ইয়াকুরোও ছিলেন। মিঃ রাঘবন জেনারেল মোহন সিংকে প্রশ্ন করেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের উপর ভারতবর্ষ ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাল মন্দ নির্ভর করে—এ সত্ত্বেও কর্ম্মপরিষদের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক (অগ্রিম দল) ব্রহ্মদেশে কেন পাঠাতে গেলেন। জেনারেল মোহন সিং এ প্রশ্নের

কোন সদুত্তর না দিতে পেরে কর্ম্মপরিষদকে না জানানোর জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রবার আগে পরিষদের অনুমতি নেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কর্ম্মপরিষদ মন্তব্য ক'রলেন—ইয়াকুরো কিকন (জাপানী লিয়াজং ডিপার্টমেণ্ট) আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কাজে বড় বেশী হস্তক্ষেপ ক'রছেন, তা'ছাড়া তাঁরা ভারতীয় আন্দোলনকে জাপানের ভারত আক্রমণের কাজে লাগাতে চেষ্টা ক'রছেন। কর্ম্মপরিষদ জাপানের এবম্বিধ প্রচেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বাধা দেবেন। তাঁরা আরও জানান—এখন থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সর্ব্বপ্রকার জাপানী প্রভাব মুক্ত হ'য়ে কেবল ভারতের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা নিজেরাই পরিচালনা ক'রবেন।

কর্ম্মপরিষদের নির্ভীক দেশভক্ত অ-সামরিক সভ্য মিঃ কে, সি, কে, মেনন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বল্‌লেন—ব্যাঙ্ককের সভা হ'য়ে গেছে পাঁচ মাস আগে, অথচ জাপ গভর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত তার প্রস্তাবগুলি সরকারী ভাবে পাকা ক'রলেন না। প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত ক'রবার আগে জাপ সরকারকে দিয়ে পাকা করিয়ে নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, তা' যখন করা হয় নি তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বে-আইনী, সুতরাং এর কাজ এখনই বন্ধ করা হ'ক।

এদিকে স্বরাজ ইনষ্টিটিউটের ব্যাপার নিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘে আর একটা গোলযোগের সূত্রপাত হ'ল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—মিঃ রাঘবন তরুণ ভারতীয়দের জাতীয় সেবা শিক্ষা দিবার জন্য পেনাং-এ একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। এখানকার শিক্ষার মূল কথা হ'ল—দেশপ্রীতি। ছেলেদের এখানে ধ্বংস প্রণালী ও 'নিপ্পনগো' শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে এক দিন রাত্রে কয়েকজন জাপানী সামরিক অফিসার ইয়াকুরো কিকনের অফিসিয়ালদের সঙ্গে এই ইনষ্টিটিউটে এসে বেছে বেছে সব চেয়ে উপযুক্ত ছেলেগুলিকে ধরে একটা লরী বোঝাই ক'রে নিয়ে চলে গেল। মিঃ রাঘবন অনেক চেষ্টা ক'রেও জানতে পারলেন না—ছেলেগুলিকে কার হুকুমে কোথায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। কর্ম্মপরিষদ জাপানী জেনারেল হেড্-কোয়ার্টার্সের কাছে প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু সেখান থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। মিঃ রাঘবন জাপানীদের জানালেন—তাঁরা যে ছেলেগুলি নিয়ে গেছেন সেগুলি যদি ফিরিয়ে না দেওয়া হয়, এবং ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করা হ'বে না—প্রকাশ্য ভাবে এমন প্রতিশ্রুতি যদি না দেওয়া হয় তা'হলে তিনি তাঁর এই ইনষ্টিটিউট্ বন্ধ ক'রে দেবেন। অ-সামরিক একজন লোকের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে এরূপ তর্জ্জন করা অবশ্য খুবই দুঃসাহসিক কাজ। জাপনী সরকার কোন সাধারণ লোকের এরূপ গর্জ্জন কখনও বরদাস্ত করেন না, সুতরাং আশঙ্কা করা যাচ্ছিল জাপানী 'গেষ্টাপো' মিঃ রাঘবনের প্রতি কোন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ক'রবেন। কিন্তু রাঘবন কিছুতেই নরম হ'লেন না—অবশেষে

জাপানী সরকার স্বীকার ক'রলেন, জাপ সামরিক লোকেরাই ছেলেগুলিকে নিয়ে গেছে। মিঃ রাঘবন প্রকাশ্যভাবে জাপানীদের এই স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র নিন্দাবাদ ক'রলেন—কিকনকে জানালেন তাঁর এই প্রতিষ্ঠান জাপানী গোয়েন্দা তৈরী ক'রবার কারখানা নয়। জাপানীদের তিনি আরও জানালেন—কোন ভারতীয়কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাপানী সামরিক বিভাগের কোন কাজে লাগানো চল্‌বে না; ভারতীয়দের বল্‌লেন—কর্ম্মপরিষদের নির্দ্দেশ না পেলে তাঁরা যেন এরূপ কোন কাজে হাত না দেন।

শেষে ১৯৪২ সালের ২৯শে নভেম্বর মিঃ রাঘবন জাপানীদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদকল্পে স্বরাজ ইন্‌ষ্টিটিউট্ বন্ধ ক'রে দিলেন। জাপানীরা এতে ভীষণ রুষ্ট হ'য়ে বল্‌লে—তিনি যে কাজ ক'রলেন এতে তা'দের সম্রাটকে অপমান করা হ'ল। ফলে মিঃ রাঘবনকে পেনাং-এ তাঁর নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ ক'রে রাখা হ'ল। কাউকে তাঁর সাথে দেখা ক'রতে দেওয়া হ'ত না। মিঃ রাঘবন ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের মালয় শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন; সুতরাং তাঁকে এমনি ভাবে আটক ক'রে রাখায় মালয়বাসী ভারতীয়দের মনটা একেবারে দমে গেল।

এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে কর্ম্মপরিষদ সিঙ্গাপুরে এক সভা ক'রে তার দাবীগুলি এক পত্রাকারে জাপ গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিশেষ ক'রে—ব্যাঙ্ককের সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট জবাব দিতে জাপ্

গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হ'ল। কর্ম্মপরিষদ আরও জানিয়ে দিলেন—জাপানীদের কাছ থেকে এক পক্ষের মধ্যে যদি কোন সন্তোষজনক জবাব না আসে তা'হলে তাঁরা তাঁ'দের আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ ভেঙ্গে দেবেন।

জেনারেল ইয়াকুরো কর্ম্মপরিষদকে জাপ্ সরকারের কাছে এরূপ পত্র পাঠাতে নিষেধ ক'রলেন। তিনি বল্‌লেন—এরূপ পত্রকে চরম পত্র ব'লে ভুল ক'রবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাঁর কথায় এই পত্র প্রত্যাহার করা হয়, জেনারেল ইয়াকুরো নিজেই জাপানী গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে তাঁ'দের প্রস্তাব সম্পর্কে একটা উত্তর এনে দেবেন—প্রতিশ্রুতি দেন এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি টোকিও ও সাইগনে দূত পাঠান।

এদের কাছে সকল কথা শুনে জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো যে সাধারণ বিবৃতি দেন তাতে তিনি বলেন—ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের ইচ্ছা জাপানের নেই। কর্ম্মপরিষদ এতে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে পূর্ব্ব পত্রই জেনারেল ইয়াকুরোর মারফত জাপানী গভর্ণমেন্টের কাছে পেশ করেন। এই পত্রের প্রধান দাবীগুলি ছিল এইরূপ—

(১) ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাবগুলি সরকারীভাবে অনুমোদন ক'রতে হ'বে।

(২) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের ব্যাপারে জাপানীদের সর্ব্বপ্রকার হস্তক্ষেপ বন্ধ ক'রতে হ'বে।

(৩) ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের জেনারেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীনে রাখতে হ'বে।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পর যে সব যুদ্ধবন্দীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বেচ্ছাসেবক হ'তে অসম্মত হয়, অথবা কোন কারণে যা'দের ফৌজে গ্রহণ করা হয় না—তা'দের উপর কর্ত্তৃত্ব ক'রবার ভার জাপানীরা নিজেদেরই একটি সরকারী বিভাগের উপর দেয়। জেনারেল মোহন সিং এদের নিজের আয়ত্তে রাখতে চান—কারণ, তাঁর মতে ভবিষ্যতে এদের অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে পারে। জাপানীরা এতে রাজী হয় না—ফলে নতুন গোলাযোগের সূত্রপাত হয়। জেনারেল মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের একটি সভা আহ্বন ক'রে এ সম্বন্ধে তাঁ'দের মত জানতে চান। উত্তরে তাঁরা সবাই এক বাক্যে বলেন—আমরা আমাদের দাবী ছাড়ব না, ওঁরা যদি পূরণ ক'রতে রাজী না হ'ন—তবে বাধ্য হ'য়ে আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে দেব।

কর্ণেল গিল এই সকল ব্যাপারের মূলে র'য়েছেন ব'লে সন্দেহ ক'রে ১৯৪২ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপানীরা তাঁকে বন্দী করে। তারা বলে—কর্ণেল গিল একজন ব্রিটিশ গুপ্তচর এবং তাঁরই প্ররোচনায় মেজর এম্, এস্, ধীলন ব্রহ্মদেশে গিয়ে শত্রু পক্ষে চ'লে গেছেন। তাঁর যে সব অনুচর ভারতীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসবার জন্য তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিল—তাঁ'দেরও তিনিই বন্দী ক'রেছেন।

কর্ণেল গিলকে বন্দী ক'রবার পরই কর্ম্মপরিষদের সকল সভ্য পদত্যাগ ক'রলেন। ভারতীয় সেনাদলের সবারই এই ধারণা—জাপানীরা কথা দিয়ে কথা রাখে নি, সুতরাং তা'দের সঙ্গে আর আমাদের কোন সংশ্রব রাখবার প্রয়োজন নেই। আমার এবং আর যা'দের জাপানীদের উপর কোনদিন আস্থা ছিল না—তা'দের মনে হ'ল জাপানীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেবার এই সুযোগ। সুতরাং আজাদ হিন্দের বিরুদ্ধে আমরা রীতিমত প্রচার কার্য্য সুরু ক'রে দিলাম এবং জেনারেল মোহন সিংকে পরামর্শ দিলাম—আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে ফেলতে।

কর্ম্মপরিষদের সভাপতি মিঃ রাসবিহারী বোসের মত এই হ'ল যে—ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সমস্ত বাধা দূর হ'তে পারে যদি আমরা সরাসরি জাপ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করি। তিনি নিজেই টোকিওয় গিয়ে প্রধান মন্ত্রী তোজোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে গোলযোগের নিষ্পত্তি ক'রবেন বল্‌লেন এবং ইত্যবসরে জেনারেল মোহন সিং-কে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন ক'রে থাকতে অনুরোধ কর্‌লেন। কিন্তু জেনারেল মোহন সিং এবং কর্ম্মপরিষদের অন্যান্য সভ্য এতে রাজী হ'লেন না—ফলে অবস্থা দিনদিনই খারাপের দিকে চল্‌ল।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি মিঃ রাসবিহারী বোস আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখবার জন্য জেনারেল মোহন সিং-এর কাছে একখানা চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে জেনারেল মোহন সিং-কে সিঙ্গাপুরে মিঃ বোসের বাড়িতে

কয়েকজন অফিসার পাঠাতে বলা হয়। মিঃ বোস তাঁ'দের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন। জেনারেল মোহন সিং এর উত্তরে রূঢ় ভাবে জানান—কোন অফিসারই তাঁর (মিঃ বোসের) সঙ্গে দেখা ক'রতে চা'ন না, আর চাইলেও জেনারেল মোহন সিং তা'দের কাউকে তাঁর ওখানে যেতে দেবেন না। এই ঘটনার পর মিঃ রাসবিহারী বোস জেনারেল মোহন সিং-কে বন্দী ক'রবার পরোয়ানা বে'র ক'রতে জাপানীদের বলেন। ফলে জেনারেল ইয়াকুরো ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর জেনারেল মোহন সিং-কে তলব ক'রে পাঠান। ঐ তারিখেই তাঁকে বন্দী করা হয়। বন্দী অবস্থাব প্রথম দিকে জাপানীরা তাঁর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহারই করে। সিঙ্গাপুরের কাছে 'সেণ্ট জন' দ্বীপে তাঁর থাকবার জন্য একটা পৃথক বাংলো দেওয়া হয় এবং তাঁর স্বকীয় 'ষ্টাফ্' হিসাবে সাতজন অফিসার, দুইজন দেহরক্ষী, কয়েকজন পাচক ও আরদালিকে তাঁর সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর তাঁকে সুমাত্রায় বদলি করা হয়, সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যদল এলে তিনি তা'দের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ন। অতঃপর তিনি দিল্লীর লাল কেল্লায় আনীত হ'ন।

জেনারেল মোহন সিং পূর্ব্বেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে বন্দী করা হ'বে—এইজন্য বন্দী হ'বার আগেই তিনি কম্যাণ্ডারদের ব'লে রেখেছিলেন যে তাঁকে বন্দী করার কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে দেন। তাঁর সেই নির্দ্দেশের ফলে বিভিন্ন দলের সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ক'রল

ও দলের ব্যাজগুলি সব পুড়িয়ে ফেল্‌ল—সামরিক শিক্ষা হ'ল বন্ধ।

এই সময় ভারতীয়দের সবাই মনে-প্রাণে জাপানের বিরোধী হ'য়ে উঠেছিল। অধিকাংশ অফিসার এবং সৈনিক ঠিক ক'রেছিলেন—আর কোনদিন তাঁরা জাপানীদের বিশ্বাস ক'রবেন না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের তরফ থেকে জাপানী 'লিয়াজং ডিপার্টমেন্ট'কে (ইয়াকুরো কিকন) একখানা চিঠি লেখা হয়। এই চিঠিতে বলা হয়—আজাদ হিন্দের অফিসারগণ ও অন্যান্য সবাই সিদ্ধান্ত ক'রেছেন এখন থেকে তাঁরা আবার যুদ্ধবন্দীর অবস্থায় ফিরে যেতে চান। জাপানীরা কিন্তু এতে রাজী হ'ল না, তারা বল্‌লে—জাপানের তরফ থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের একবার মুক্ত ব'লে ঘোষণা করা হ'য়েছে, এরপর আবার তা'দের যুদ্ধবন্দী ব'লে গণ্য করা চলে না। এ কথা শুনে আমরা জানিয়ে দিলাম—আমাদের যদি সত্যিই মুক্তি দেওয়া হ'য়ে থাকে তবে সেই অধিকারবলে আমরা শিবির ছেড়ে মার্চ ক'রে ভারতবর্ষে যাব অথবা মালয়, শ্যাম বা ব্রহ্মদেশে বসবাস ক'রে অ-সামরিক জীবন যাপন ক'রব; কিন্তু জাপানীরা জানালে—আমাদের শিবির ছেড়ে যাওয়া চল্‌বে না।

মিঃ রাসবিহারী বোস জানান—আজাদ হিন্দের নেতৃপদ পরিত্যাগ ক'রবার অধিকার জেনারেল মোহন সিং-এর নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু তাই ব'লে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গবার

অধিকার তাঁর কিছুমাত্র নেই। ফৌজ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আজাদ হিন্দ ভারতের ফৌজ, জেনারেল মোহন সিং-এর নয়। মিঃ বোস এক সরকারী ঘোষণায় বলেন—জেনারেল মোহন সিংকে বন্দী ক'রবার আদেশ তিনিই দিয়েছেন, তিনিই তাঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা ক'রে জেনারেল পদে বসিয়েছিলেন ; এখন হ'তে ও আখ্যা থেকে তিনি বঞ্চিত হ'লেন।

এই রকম অবস্থায় প্রায় দুই মাস কেটে যায়। ইত্যবসরে মিঃ রাসবিহারী বোস ও জাপানীরা—অফিসার ও অন্যান্য লোকদের আজাদ হিন্দ ফৌজে রাখবার জন্য খুব জোর প্রচার কার্য্য চালাতে থাকেন, কিন্তু এই অবস্থায় অধিকাংশ ভারতীয়ই আজাদ হিন্দের সংস্পর্শে আর থাকতে চান না। শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি নিম্নপদস্থ অফিসার জাপানীদের কথায় আজাদ হিন্দের জন্য কাজ ক'রতে থাকেন। এঁদের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয় বটে—কিন্তু এ দলটী হয় জাপানীদের হাতের ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র।

বিদাদরিতে জেনারেল ইয়াকুরোর বক্তৃতা

জাপানীরা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্রচারকার্য্য চালাবার পর ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিয়াজং ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ জেনারেল ইয়াকুরো বিদাদরিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের

আনুমানিক তিন শ' অফিসার নিয়ে একটা সভা করেন। এই সভায় তিনি যে বক্তৃতা দেন তার সারাংশ এই ঃ—

(ক) পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিরা ব্যাঙ্কক বৈঠকে যে প্রস্তাব করেন, সেই প্রস্তাব অনুসারে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হয়।

(খ) ভারতীয়েরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম সুরু ক'রতে চান জাপ সরকারের তা'তে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ভারতীয়েবা স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম পরিচালনা ক'রবার উপায় আলোচনা ক'রতে যখন ব্যাঙ্ককে মিলিত হ'বার ইচ্ছা করেন তখন জাপ সবকার তাঁ'দের সেখানে যাওয়ার সমস্ত সুযোগ ক'বে দিয়েছিলেন।

(গ) ভারতীয় প্রতিনিধিগণ একটা কর্ম্মপরিষদ গঠন ক'রে মিঃ রাসবিহারী বোসকে তার সভাপতি কবেন। মিঃ বোস ক্যাপ্টেন মোহন সিং-কে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব দেন।

(ঘ) জাপ সরকার কর্ম্মপরিষদের সভাপতিকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দেবেন—প্রতিশ্রুতি দেন।

(ঙ) জেনারেল মোহন সিং ইচ্ছা ক'রলে—আজাদ হিন্দ দলের নেতৃপদ পরিত্যাগ ক'রতে পারেন কিন্তু সভাপতির বিনানুমতিতে আজাদ হিন্দ দল ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। ফৌজ ভাঙ্গবার চেষ্টাকে বিদ্রোহ ব'লে গণ্য করা হ'বে।

এই সময়ের অবস্থা বড়ই সঙ্কটময়। এটা বেশ বুঝা যেত—জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজ রাখতে বদ্ধপরিকর, দরকার হ'লে তারা বল প্রয়োগেও পশ্চাৎপদ হ'বে না। বস্তুতঃ এই সময় তারা আজাদ হিন্দের বিরুদ্ধবাদী দলের কয়েকজন পাণ্ডাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল—কারণ, তা'দের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শাস্তি দিলে আর সবাই ভয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজেই থেকে যাবে। জাপানীদের দুরভিসন্ধি ও অযৌক্তিক মনোভাব লক্ষ্য ক'রে সবাই চুপ ক'রে রইল। আমার কিন্তু এ সব বরদাস্ত হ'ল না—আমি জেনারেল ইয়াকুরোকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলাম। আমি তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলাম যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছে জাপানীরা সাধু ভাবে নয়, জোর জবরদস্তি এবং ছলনা ক'রে। ব্যাঙ্কক বৈঠকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা আমাদের প্রতিনিধি নয়, আইনতঃ আমরা ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাব মানতে বাধ্য বটে কিন্তু সে প্রস্তাব সরল সাধু পথে গড়া আমাদের নিজস্ব প্রস্তাব নয়। ভারতীয় সৈন্যদলকে এ প্রস্তাব মানতে বাধ্য করা নীতিবিগর্হিত—ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পবিত্র আন্দোলনে প্রবঞ্চনা ও বলপ্রয়োগের কোনও স্থান নেই।

পরদিন জেনারেল ইয়াকুরো আমাকে তাঁর বাংলোয় ডেকে পাঠালেন—তিনি নাকি আমার সঙ্গে 'প্রাণ খুলে' কথাবার্ত্তা বলতে চান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে তিনি বল্‌লেন—আমার আগের দিনের কথাগুলির যৌক্তিকতা তিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রেছেন এবং তিনি চান আমার মত

কোন সুযোগ্য লোকই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আমি এ ভার গ্রহণ ক'রতে রাজী আছি কি না তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি বল্লাম—না, এ ভার গ্রহণ ক'রবার যোগ্যতা আমার নেই, তা'ছাড়া লোকেই বা আমার কথা শুনে চলবে কেন। ভারতীয়েরা এখন তা'দের নেতা এবং জাপানীদের উপর সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

এরপর সত্যিকার ভাল আজাদ হিন্দ ফৌজ কি ক'রে গঠন করা যায় এ সম্বন্ধে তিনি আমার কাছে যুক্তি চাইলেন। তিনি বল্লেন—ফৌজটা এমন ক'রে গড়তে হ'বে যাতে সবাই এতে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়। আমি তাঁকে এইরূপ পরামর্শ দিয়েছিলাম—

(ক) ভারতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে পবিত্র জ্ঞান ক'রতে হ'বে এবং তা' প্রতিষ্ঠিত হ'বে ন্যায় ও সত্যের উপর। জাপানীরা এর কোন কিছু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার ক'রতে পারবে না।

(খ) কাউকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানে বাধ্য করা হ'বে না, যারা স্বেচ্ছায় এতে যোগ দিতে চায় তা'দেরও এর পরিণাম ভেবে আসতে বলা হ'বে। যারা আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে যেতে চায় তা'দের উপর কোন দুর্ব্যবহার করা হ'বে না।

(গ) সত্যিকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়বার মত ক্ষমতা ভারতবর্ষের বাইরে শুধু একজন লোকের আছে—তিনি হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সত্যিকার আজাদ হিন্দ

ফৌজ অর্থে আমি বুঝি একটা অপরাজেয় সৈন্য বাহিনী—ফৌজের নামে প্রচারকের দল নয়।

জেনারেল ইয়াকুরো আমার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি ক'রে বল্‌লেন—নেতাজীকে জার্ম্মানী থেকে সিঙ্গাপুরে আনতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবেন। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম—নেতাজী সত্যি সত্যি সিঙ্গাপুরে আসছেন এরূপ বুঝলে বহু সংখ্যক অফিসার ও অন্যান্য লোক স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকবেন। তাঁর না আসা পর্য্যন্ত সৈন্যদলকে সিঙ্গাপুর দ্বীপ থেকে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে নেওয়া চলবে না। জেনারেল ইয়াকুরো এই সব সর্ত্ত মেনে নেওয়ায় আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে সংশ্লিষ্ট থাকতে রাজী হ'লাম। অতঃপর আমাকে 'ডিরেক্টার অব মিলিটারী বুরো'র 'চীফ্ অব জেনারেল ষ্টাফ্' করা হ'ল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠন ক'রতে গিয়ে আমরা সৈন্যদের এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলাম :—

(ক) যিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে যেতে চান তাঁকে স্বচ্ছন্দে যেতে দেওয়া হ'বে—প্রতিশোধ নেবার জন্য তাঁর উপর কোন জবরদস্তি করা হ'বে না।

(খ) যাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকবেন—জাপানীদের কোন অসৎ অভিপ্রায় দেখলে তা'দের সঙ্গেও লড়বেন তাঁরা।

(গ) জাপানীরা নিজেদের কোন স্বার্থসিদ্ধির কাজে আমাদের লাগাতে পারবে না।

যে সময়ের কথা বলছি তখন জাপানীরা অ-স্বেচ্ছাসেবক

দলগুলি (Non-Volunteers) সব নিজেদের আয়ত্তের ভিতরে নিয়ে গেছে এবং জেনারেল মোহন সিং-এর ব্যাপারের পর যে সব অফিসার ও অন্যান্য লোক আজাদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে এসেছেন তাঁরা সব জাপানীদের হাতে নির্য্যাতনের আশঙ্কা ক'রছেন। আমাদের কেবলি মনে হ'ত—ওদের বুঝি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হ'বে। ওখানকার দ্বীপগুলি সভ্যজাতীয় লোকের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ।

জেনারেল মোহন সিংকে বন্দী ক'রবার পর এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মিঃ রাসবিহারী বোস আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবির পরিচালনা এবং সৈন্যদলের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য কয়েকজন অফিসার নিয়ে একটি কমিটি গঠন ক'রলেন। এই কমিটিতে রইলেন—লেফ্‌ট, কর্ণেল এ, ডি, লোগানাধন, লেফ্‌ট, কর্ণেল জে, কে, ভোঁসলা, লেফ্‌ট, কর্ণেল এম, জেড, কিয়ানী এবং লেফ্‌ট, কর্ণেল ইশান কাদির। আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কমিটিই কাজ চালাতে থাকেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠন

সবাই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের সব চেয়ে বড় ত্রুটি ছিল তাতে শুধু একটি লোক কর্ত্তৃত্ব ক'রতেন ; সুতরাং অধিকতর সাধারণ তান্ত্রিক ভিত্তিতে দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কল্পে 'ডিরেক্টরেট অব

মিলিটারী বুরো' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত হ'ল। এই প্রতিষ্ঠান আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ক'রবে। ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভাপতির অধীনে একজন মিলিটারী অফিসার এই মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টার নিযুক্ত হ'লেন। এ ছাড়া আর্মি কম্যাণ্ডারের জন্য একটি আর্মি হেড্-কোয়ার্টার করা সাব্যস্ত হ'ল। এই আর্মি কম্যাণ্ডারই যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দের বিভিন্ন সৈন্যদল পবিচালনা ক'রবেন। সভাপতি, কর্ণেল জে, কে, ভোঁসলাকে ডিরেক্টার অব মিলিটারী বুরো এবং কর্ণেল এম, জেড্, কিয়ানীকে আর্মি কম্যাণ্ডারের পদে নিযুক্ত ক'রলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানে অনিচ্ছুক সৈন্যদের যুদ্ধবন্দীরূপে থাকবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। অফিসার এবং অন্যান্য সৈনিক মিলে প্রায় তিন হাজার লোক এই সুযোগ গ্রহণ ক'রলেন। যুদ্ধবন্দী দল থেকে নতুন স্বেচ্ছাসেবক এবং দলে দলে অ-সামরিক লোক যারা আজাদ হিন্দে যোগ দিতে আসছিল তা'দের নিয়ে দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হ'তে লাগল। জাপানী গর্ভর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজকে মিত্র বাহিনী বলে স্বীকার ক'রে নিলেন এবং আরও জানালেন—এ বাহিনীকে জাপানী বাহিনীর সমান মর্য্যাদা দেওয়া হ'বে। এ ছাড়া ব্যাঙ্কক বৈঠকের প্রস্তাবাবলী এবার সরকারীভাবে পাকা করা হ'বে এ প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল।

পূর্ব্বএশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি আহ্বান

ক'রে একটা সভা করা হ'ল—এ সভায় আলোচনা করা হ'ল কি করে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘকে পুনর্গঠিত করা যায়। সভাপতিকে সাহায্য ক'রবার জন্য একটা পরামর্শ সভার ব্যবস্থা করা হ'ল। এই সভাতেই স্থির করা হয়—নেতাজী সুভাষচন্দ্র পূর্ব্বএশিয়ায় এসে পৌঁছলে তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভাপতি করা হ'বে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের পরেও দেখা গেল—জাপানীদের সেই আগেকার স্বভাবই রয়ে গেছে: ফৌজের লোক দিয়ে সেই নিজেদের কাজ হাসিল ক'রে নেওয়া। এবার যেন সেই প্রবৃত্তি তা'দের আরও বেড়ে উঠল, ফৌজ ও সঙ্ঘ তা'দের এই চেষ্টায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটায় তার ব্যবস্থাও তারা ক'রতে লাগল। জেনারেল মোহন সিং-এর হাতে বেশী ক্ষমতা দেওয়ায় তিনিই যত গোলমাল বাধিয়ে গেছেন। এবার তারা আর সে ভুল ক'রছে না—মিঃ রাসবিহারী বোসের কাছে এক নতুন পরিকল্পনা পেশ ক'রলে তারা—যার ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

এর একটি হচ্ছে—(১) ডিরেক্টরেট অব মিলিটারী বুরো। জেনারেল ভোঁসলা এর হলেন অধ্যক্ষ, এবং সভাপতি মিঃ রাসবিহারী বোস। ডিরেক্টরেটের উপর ভার পড়ল আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ নীতি ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার দেখাশুনা করবার। সৈন্যদলের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ রইল না।

অপরটি হচ্ছে (২) সৈন্যদল। জেনারেল এম্, জেড্, কিয়ানি হ'লেন এর কম্যাণ্ডার। তিনিই এদের যাবতীয় কিছুর ব্যবস্থা ক'রবেন,—শাসন, সামরিক শিক্ষাদান, নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা— সব।

আগে অবশ্য জেনারেল মোহন সিং একাই এই দুই বিভাগের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা ক'রতেন। জাপানীরা ফৌজকে শুধু দুই ভাগে ভাগ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ল না, ভারতীয় অফিসারেরা ফৌজের লোক দিয়ে আর তা'দের নিজেদের কাজ করিয়ে নিতে দেবে না বুঝে তারা অসামরিক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র খুল্‌লে,—এখানে ওদের যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'বে তার মাঝে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছে কি ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা যায়। শিক্ষাকেন্দ্রের শিবিরগুলি সবই ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের অধীনে রইল বটে কিন্তু এগুলির পরিদর্শক হ'লেন সব জাপানী অফিসার। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসার ও সৈনিকের উপর এদের সামরিক শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হ'ল—নেতৃত্বের ভার পড়ল কর্ণেল ইশান কাদেরের উপর। কোন কোন শিবিরে অসামরিক লোক দিয়েও রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ানো হ'তে লাগল। সব শিবিরগুলিই রইল ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভাপতির অধীনে—আজাদ হিন্দের নয়।

আমরা সব আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা বেশ বুঝ্‌তে পারছিলাম—জাপানীরা অসামরিক লোকদের নিয়ে এমন

একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেষ্টা ক'রছে—যাকে দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। ফৌজ যদি কোন দিন বিগড়ে বসে তবে এদেরই ফৌজের কাজে নিযুক্ত ক'রবে তারা। এমনি ক'রে একই সময়ে তিনজন ভারতীয় অফিসার নিয়ে খেলছিল তারা, একজনকে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রছিল। কিন্তু দেশপ্রেমিক ভারতীয় অফিসারেরা তা'দের চালাকি ধর্‌তে পেরে সাবধান হ'য়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এদিক দিয়ে জাপানীদের স্বার্থসিদ্ধির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

এই সঙ্কটকালে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ মালয়ের অন্যান্য শাখা সঙ্ঘদের নিয়ে যথেষ্ট কাজ ক'রেছে—এর অনিষ্ট সাধন ক'রবার জন্য জাপানীরা এক নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে,—তার নাম ভারতীয় তরুণ-সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের সঙ্গে কিকনের বিশেষ যোগ ছিল এবং কার্য্যতঃ একে জাপানের ক্রীড়া-পুত্তলি বল্‌লে ভুল হবে না। এই সঙ্ঘই কর্ম্ম-পরিষদের অসামরিক সভ্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। কর্ম্মপরিষদ অবশ্য ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসেই ভেঙ্গে দেওয়া হ'য়েছিল। জাপানীরা যে ভারতীয়দের দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল ক'রে নিত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের পুনর্গঠনের পরও জাপানীরা তা'তে এম্‌নি ক'রে আগের মতই বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রছিল। শুধু তফাৎ এই যে—আগে প্রকাশ্য

ভাবেই এটা ক'রত আর এখন কাজ চলে গোপনে। কাজের পদ্ধতিই শুধু পালটেছে,—মনোভাবের একটুও নড়চড় হয় নি। জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা এ সব বিষয়ে মিঃ রাসবিহারী বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে তিনি সাধ্যমত এগুলি বন্ধ ক'রবার চেষ্টা ক'রলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বল্‌লেন—এ সময়ে আমাদের একটু রয়ে-সয়ে কাজ ক'রতে হবে ; কারণ শীঘ্রই নেতাজী সুভাষচন্দ্র এখানে এসে যাচ্ছেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ থেকে জুলাই পর্য্যন্ত ব্যাপার সব এম্‌নি চল্‌তে থাকে। ঐ বৎসর জুলাই মাসে নেতাজী এসে পৌঁছলেন ও মিঃ রাসবিহারী বোসের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল ভার বুঝে নিলেন।

মিঃ রাসবিহারী বোসের কথা

এই বাঙ্গালী বিপ্লবী বীর ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ ক'রে পালিয়ে জাপানে গিয়ে ওখানকার ধর্ম্মগুরু মিঃ তোয়েমার আশ্রয়ে বাস ক'রতে থাকেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তাঁর জাপানে কাটে। বিগত দ্বিতীয় মহাসমর যখন পূর্ব্বএশিয়ায় প্রসারিত হ'ল তখন তাঁর জীবনের চির ঈপ্সিত সুযোগ এল। এই সুযোগের জন্যই তিনি বহুকাল ধরে অপেক্ষা ক'রছিলেন। এই যুদ্ধ সুরু হ'বার আগেও অবশ্য তিনি চুপ ক'রে বসে ছিলেন না,—ভারতমাতার মুক্তির জন্য বিপ্লবাত্মক চেষ্টা তিনি অবিরত ক'রে আস্‌ছিলেন। ১৯২১ সালের 'কামা-গাতা-মারু'

অভিযান—তাঁরই চেষ্টার ফল। 'কামা-গাতা-মারু' নামে একখানা জাপানী জাহাজ যোগাড় ক'রে তাতে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ভর্ত্তি ক'রে তিনি গোপনে ভারতবর্ষে পাঠাতে চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশেরা খবর পেয়ে যায়, ফলে 'কামা-গাতা-মারু' এবং তার আরোহী ভারতীয় বিপ্লবী-দল ও অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ব্রিটিশের হস্তগত হয়।

জাপানের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব এবং জাপানী ইম্পিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষ ফিল্ডমার্শাল সুগিয়ামার সঙ্গে আগে থেকেই ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি যে চুক্তি ক'রেছিলেন তা'তে তাঁর বিলক্ষণ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই চুক্তিতে স্বীকৃত হ'য়েছিল—জাপান অধিকৃত প্রদেশে ভারতীয়দের শত্রু-প্রজা বলে গণ্য করা হবে না এবং এই স্বীকৃতির ফলেই পূর্ব্বএশিয়াবাসী সহস্র সহস্র ভারতবাসীর ধন, প্রাণ, সম্মান রক্ষা পেয়েছে। এইজন্য স্বদেশ-প্রেমিক রাসবিহারীর কাছে তারা চির কৃতজ্ঞ।

নেতাজী বল্‌তেন—তাঁ'দের ছেলেবেলায় তাঁরা রাসবিহারী বোসকে দেশের একজন বীর সেবক বলে পূজা ক'রতেন,—তরুণের দল তাঁর কথা স্মরণ ক'রে দেশসেবার প্রেরণা পেত।

রাসবিহারী চিরকালই বিপ্লবী দেশসেবকের জীবন যাপন ক'রে গেছেন। প্রলোভনজয়ী রাসবিহারী স্বদেশের মান-মর্য্যাদাকে সকল কিছুর উপরে স্থান দিতেন। জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি জাপানে কাটিয়ে গেলেন, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা ক'রেছিলেন,—রাসবিহারী

বোসকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় যে তা'দের সামনে এনে দিতে পারবে তাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। জাপানে বসবাস ক'রে তিনি জাপানের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহও ক'রেছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও দেশপ্রীতি তাঁর কোন দিন একটুও হ্রাস পায় নি।

পূর্ব্বএশিয়ার অন্যান্য ভারতীয়দের চেয়ে তিনি জাপানীদের অনেক বেশী ভাল ক'রে চিনতেন, জাপানী সামরিক ও রাজনৈতিক মহলে তাঁর প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট।

জাপানী সামরিক বিভাগের একটা বিশেষত্ব এই যে—সকল ঘাঁটিতেই কম্যাণ্ডার যতই নিম্ন পদস্থ হো'ক না কেন, তার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া থাকে এবং তা'দের প্রত্যেকেই মনে করে জাপানের যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে তার নিজের একটা বড় কিছু ক'রবার কর্ত্তব্য র'য়েছে।

জাপানীদের এইরূপ মনোভাবের ফলেই ইয়াকুরো কিকনের লিয়াজং অফিসারেরা ভারতীয়দের দিয়ে যথা সম্ভব নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রছিল—ভারতীয়েরা তা বুঝতে পেরে জাপানীদের উপর আর একটুও আস্থা স্থাপন ক'রতে পারতেন না, মাঝে মাঝে তাঁরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌তেন। রাসবিহারী বোস কিন্তু কোন দিন ধৈর্য্য হারান নি। জাপানীদের তিনি খুব ভাল ক'রেই চিনতেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল—টোকিওতে গিয়ে জাপানী 'হাই-কম্যাণ্ডের' সঙ্গে দেখা ক'রে আমাদের সমস্ত অসুবিধা তিনি দূর ক'রতে

পারবেন এবং এইজন্যই তিনি আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা ক'রতে বল্‌তেন।

১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বকর্ত্তৃত্বভার অর্পণ ক'রে তিনি তাঁর কর্ম্মজীবন থেকে এক রকম অবসর গ্রহণ করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ব্বএশিয়ায় আগমন

আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হ'বার পর 'ইয়াকুরো কিকন' নামক জাপানী মিলন সঙ্ঘের (Liaison Department) অধ্যক্ষ জেনারেল ইয়াকুরো জাপ গবর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে বলেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাহায্য ও নেতৃত্ব ছাড়া সত্যিকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা সম্ভব নয়। নেতাজীকে বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুরে আনবার ব্যবস্থা ক'রতে তিনিই তাঁর গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে বলেন—এই বিপদ-সঙ্কুল পথে সুদূর বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুরে আসা নেতাজীর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। আসতে গেলে জীবিতাবস্থায় এখানে পোঁছানর সম্ভাবনা শতকরা মাত্র পাঁচ। জাপ গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ইয়াকুরোকে এ অনুরোধ ক'রতে নিষেধ ক'রে দেন,—কারণ এরূপ কাজ ক'রতে গেলে নেতাজীর মৃত্যু অনিবার্য্য। সেখান থেকে আসতে গেলে আসতে হবে তাঁকে 'সাবমেরিণে' কিন্তু সমুদ্রের চারিদিকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান রণতরীর যে রকম কড়া পাহারা তা'তে তা'দের এড়িয়ে আসা একেবারে অসম্ভব। জেনারেল ইয়াকুরো এ কথা শুন্‌বার পরও জাপ গবর্ণমেণ্টকে লিখে পাঠান—পথ যতই বিপদ-সঙ্কুল হ'ক না কেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য নেতাজীর আসা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বএশিয়ায় তাঁর নেতৃত্ব ব্যতিরেকে জাপানীদের ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য কোন কিছু করা

একেবারে অসম্ভব। তিনি তাঁর চিঠিতে লিখলেন—"জানি, তাঁর এখানে নিরাপদে পৌঁছানর পথে অনেক বাধা, কিন্তু এখানকার ভারতীয়েরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—তাঁর নেতৃত্ব ব্যতিরেকে তারা ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়তে পারবে না। তিনি যদি নিরাপদে এখানে এসে না পৌঁছতে পারেন তা'হলে বুঝব—বিধাতার ইচ্ছা নয় যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। আর যদি এই ভীষণ বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়েও তিনি নিরাপদে এসে পৌঁছান তা'হলে বুঝা যাবে—ভগবানের ইচ্ছা, তাঁর চেষ্টাতেই ভারত স্বাধীন হ'ক।"

অবশেষে তিনি জাপ পার্লামেন্টকে বলেন—নেতাজীকে সব কথাই জানান হ'ক : জানান হ'ক পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়েরা তাঁর আসার পথ চেয়ে কেমন ক'রে বসে আছে ; সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানান হ'ক—তাঁর আসার পথ কেমন বিপদ-সঙ্কুল। সব কিছু শুনে তিনি নিজে যা মত করেন তাই হবে। জাপ গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে রাজী হ'লেন।

এরপর বার্লিনের জাপানী রাজদূত নেতাজীর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌লেন। তিনি তাঁকে স্পষ্ট ক'রেই জানালেন—এখন এ অবস্থায় সিঙ্গাপুরে যেতে গেলে জীবিতাবস্থায় তাঁর সেখানে পৌঁছানর সম্ভাবনা শতকরা মাত্র পাঁচ। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে এমন দুঃসাহসিক কাজ ক'রতে নিষেধই করেন—কারণ, তাঁর জীবন অতি মূল্যবান। নেতাজী সব শুনে সমস্ত বিপদ মাথায় করেই যাত্রা করা সাব্যস্ত ক'রলেন। তিনি বল্‌লেন—এরূপ ক'রতে গিয়ে যদি তাঁর মৃত্যু

হয়, তা'হলে তিনি ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণ দিলেন এই তৃপ্তি নিয়ে সেই মৃত্যু বরণ ক'রবেন।

বিশ্বস্তস্থত্রে জানা যায়—এর পর তিনি একটা জার্ম্মান সাবমেরিণে চড়ে ম্যাডাগ্যাস্কার উপকূল পর্য্যন্ত আসেন। এদিকে একখানা জাপানী সাবমেরিণ আবার পেনাং (মালয়) থেকে ভারত মহাসাগরের পথে ওখানে গিয়ে হাজির হয় তাঁকে আনতে। সেখান থেকে এই জাপানী সাবমেরিণে চড়ে তিনি পেনাং-এ এসে পৌঁছান, সেখান থেকে বিমান-যোগে যান টোকিওতে।

মিঃ রাসবিহারী বোস এই সময়ে সিঙ্গাপুরে ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ৩রা জুন তিনি টোকিওয় নেতাজীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সিঙ্গাপুরে আনবার জন্য যাত্রা করেন। যাওয়ার আগের দিন রাত্রে মিঃ বোস কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারকে বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করেন। নেতাজীর আগমন সংবাদ তখনও কাউকে জানান হয় নি। যখন মিঃ বোসের টোকিও যাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'ল, তখন তিনি তার উত্তরে বল্‌লেন,—"আমি আপনাদের জন্য একটি উপহার আনতে যাচ্ছি।"

১৯৪৩ সালের ২০শে জুন তারিখে টোকিও রেডিও ঘোষণা করে—নেতাজী স্বভাষচন্দ্র এখানে এসে গেছেন। বার্লিন থেকে টোকিও আসবার সময় তাঁর দেহরক্ষী হ'য়ে আসেন একজন মুস্‌লিম তরুণ—নাম তাঁর মিঃ আবিদ আলি হাসান। টোকিওতে নেতাজী বিপুল সম্বর্দ্ধনা পেয়েছিলেন।

শক্তিশালী বৃটিশের বিরোধী একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা হিসাবে তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখান হয়।

নেতাজী যেদিন টোকিও এসে হাজির হন সেই দিনই এক প্রেস ইস্তাহারে বলেন,—"বিগত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশেরা আমাদের দেশের নেতাদের একটা ভাঁওতা দিয়ে রেখেছিল, আমরা তাই বিশ বছর আগেই প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছি—ওদের ভাঁওতাতে আর ভুলব না। বহু যুগ ধরে আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রে যে শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় বসেছিলাম—আজ তাই এসে গেছে। আমরা বেশ ভাল জানি—আর একশ' বছরের মধ্যে এমন সুযোগ আসবে না, সুতরাং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের ক'রতেই হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের কৃষ্টি ধ্বংস ক'রে নৈতিক অধঃ-পতন এনে দরিদ্র পরাধীন জাতিতে পরিণত ক'রেছে। এখন হৃদয়ের রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রতে হবে। বহু কষ্ট, আত্মত্যাগে অর্জ্জিত স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আমরা নিজ শক্তি বলে রক্ষা ক'রতে পারব। যে শত্রু আমাদের অস্ত্রাঘাত ক'রেছে—অস্ত্রাঘাতই তার প্রত্যুত্তর। অহিংস অসহযোগকে আজ হিংসাত্মক সংগ্রামে পরিণত ক'রতে হবে। দলে দলে লোক এই অগ্নি-দীক্ষা গ্রহণ ক'রলে তবেই হবে ভারতের মুক্তি।..."

১৯৪৩ সালের ২১শে জুন নেতাজী প্রথম টোকিও থেকে বেতারে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা সমস্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ শিবিরে শোনবার ব্যবস্থা করা হয়। নেতাজী বলেন,—

"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—এখন এর নিকটের পরিস্থিতি। ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে এসে পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কোন ব্রিটিশ সেনানায়ক মনে ক'রতে পারে নি যে কোন শত্রু এর পূর্ব্বসীমান্ত দিয়ে এখানে প্রবেশ ক'রতে পারে। এতদিন তারা ভারতের উত্তর—পশ্চিম-সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা নিয়েই মাথা ঘামিয়ে এসেছে। সিঙ্গাপুরে দুর্জ্জয় নৌঘাটি নির্ম্মাণ ক'রে তারা নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখছিল। জেনারেল ইয়ামাশিটার প্রচণ্ড অভিযান তা'দের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে। ব্রিটিশের রণ-চাতুর্য্যের অভাব তাকে জগতের চক্ষে হেয় ক'রেছে। জেনারেল ওয়াভেল এখন ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষার দ্রুত আয়োজনে মনোনিবেশ ক'রেছেন। ভারতবাসী এখন ভাবছে—"বিশ বছর ধরে ওরা যে সিঙ্গাপুর গড়ে তুলেছিল তা' ত সাতদিনেই শেষ হ'য়ে গেল, এখন ওরা পূর্ব্বসীমান্ত সুরক্ষিত ক'রবার কাজে লেগেছে, ওখান থেকে সরে পড়তে হবে ওদের ক'দিনে কে জানে।" টিউনিস, টামবাক্‌টু, ল্যাম্পিডুসা বা এ্যাল্যাস্কায় কি ব্যাপার চলেছে তা' নিয়ে ভারতবাসীর মাথা ঘামানোর দরকার নেই—দরকার তা'দের ভারতের অভ্যন্তর এবং সীমান্তের বাইরের কথা নিয়ে। খুব আড়ম্বর ক'রে ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার ক'রতে গিয়ে ব্রিটিশ যে ভাবে বিতাড়িত হ'য়েছে এটা আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। সিঙ্গাপুরের পতন হ'য়েছে, ব্রহ্মদেশও হারিয়েছে তারা,—ব্রিটিশের সামরিক ইতিহাস এই লজ্জার কাহিনীতে চির-কলঙ্কিত হ'য়ে থাকবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। জগতে কত মানুষ জন্মাবে; মরবে, কত সাম্রাজ্য গড়বে, ভাঙ্গবে; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবিধ্বংসী, অবিনশ্বর—এই তা'দের ধারণা··· আপনারা একে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব বল্‌তে পারেন, বল্‌তে পারেন একে নিছক পাগলামি,—কিন্তু আমি বলি এই পাগলামিরও কারণ আছে ওদের। ভারতবর্ষই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ইংরেজই মনে করে ভারতবর্ষের সব কিছু শোষণই তা'দের কাজ। তা'দের সাম্রাজ্য মানেই—ভারতবর্ষ। সেই সাম্রাজ্য রক্ষা ক'রবার জন্য তারা এখন প্রাণপণে লড়ছে। ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন-—এই সাম্রাজ্য অর্থাৎ ভারতবর্ষ রক্ষা ক'রবার জন্য তারা প্রাণপণে শেষ পর্য্যন্ত লড়বে। এই জন্যই আমি বলছি—ব্রিটিশেরা যে তা'দের সাম্রাজ্য অবিধ্বংসী মনে করে, এ তা'দের পাগলামি নয়। পাগলামি হবে বরং আমাদের যদি আমরা ভাবি ওরা স্বেচ্ছায় এই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে···ভারতীয় কেউ যেন কোন দিন স্বপ্নেও না ভাবেন যে ব্রিটিশেরা একদিন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, ব্রিটিশ রাজনৈতিকেরা আর কোন দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আপোষ ক'রবেন না। আমার ত' মনে হ'য়েছিল ঐ রকম চেষ্টা ওঁরা এই বছরেই একবার ক'রবেন। আমি আমার দেশবাসীকে শুধু এই কথা বলতে চাই যে এসব আপোষের অর্থ শুধু ভারতবাসীকে ভাঁওতা দেওয়া,—স্বাধীনতা দেওয়া নয়···

সুদীর্ঘকাল ধরে আলাপ আলোচনা চালিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা মন্দীভূত করাও ওদের একটা কৌশল। ১৯৪১ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ওরা যে ব্যাপার ক'রলে সে এই···সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে আপোষের কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। আমাদের স্বাধীনতায় আপোষের কোন স্থান নেই। ব্রিটিশ তার মিত্র শক্তিদের দলবল নিয়ে চিরতরে ভারত ত্যাগ ক'রে গেলে তবেই আমাদের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা যাঁরা চান তাঁ'দের প্রাণপণে এর জন্য লড়তে হবে···সুতরাং দেশবাসিগণ, বন্ধুগণ,—আসুন, আমরা ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে এরই জন্য যুদ্ধ করি; আর যতদিন না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হ'য়ে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন আমরা অদম্য উৎসাহ আর অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে এই যুদ্ধ চালাতে থাকি। এই সংগ্রামে পিছিয়ে যাওয়া চল্‌বে না, ইতস্ততঃ করা চলবে না,—কেবল যুদ্ধ আর এগিয়ে যাওয়া। সম্পূর্ণ বিজয়লাভ না করা পর্য্যন্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের বিরাম নাই।"

নেতাজীর সিঙ্গাপুরে আগমন

নেতাজী ঠিক কোন সময় সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছবেন সে কথা সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হ'য়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট অসামরিক ব্যক্তিগণকে অবশ্য সে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছিল।

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই বেলা প্রায় ১১ টার সময় স্থানীয় সব বিশিষ্ট অসামরিক ভারতীয়, জাপানী রাজদূত মণ্ডলী ও মিলিটারী ষ্টাফ্ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ঊর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারিগণ সবাই বিমান ঘাঁটিতে নেতাজীকে অভ্যর্থনা ক'রতে সমবেত হ'লেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে একটা সম্মানসূচক রক্ষীদল (Guard of honour) রচনা করা হ'ল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দুই এঞ্জিন বিশিষ্ট একখানি জাপানী বিমান এসে আমাদের সামনে বিমান ঘাঁটিতে নামল। নেতাজীকে দেখবার জন্য আমাদের আর তর সইছিল না—এক এক সেকেণ্ডকে মনে হচ্ছিল এক এক ঘণ্টা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই প্লেনের দরজা খোলা হ'ল, নেতাজী বেরিয়ে এলেন,—পিছনে এলেন তাঁর সেক্রেটারী মিঃ আবিদ হাসান।

মিঃ রাসবিহারী বোস, কর্ণেল ইয়ামামোটো এবং জাপানীজ লিয়াজং ডিপার্টমেণ্টের মিঃ সেণ্ডাও টোকিও থেকে নেতাজীর সঙ্গে এই বিমানে এসেছিলেন।

বিমান থেকে নেমে নেতাজী সোজা আমাদের কাছে

এগিয়ে এলেন এবং আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে দুই একটি ক'রে কথা ব'লে যেতে লাগলেন। আমার শরীর শিউরে উঠ্ল—জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখ্লাম আমি। কত কিছুই না তাঁর কাছে প্রত্যাশা ক'রে বসে আছি। নেতাজীর গতিবিধি আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ্তে লাগ্লাম। নেতাজী একটি হালকা বাদামী রঙের অসামরিক পোষাক পরে এসেছিলেন—মাথায় ছিল গান্ধী টুপী। আমাদের সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি 'গার্ড অব্ অনার'কে পরিদর্শন ক'রলেন, তারপর তাঁর সরকারী আবাসে গিয়ে উঠ্লেন।

এর মধ্যে তাঁর আগমনবার্ত্তা চারিদিকে বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল, দলে দলে পুরুষ, নারী, ছেলেমেয়েরা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রতে ছুটে এল। শ্রদ্ধাপ্রীতির এক বিপুল উচ্ছ্বাসে সকলে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। এক বিপুল জনসমুদ্র—ভারতীয়, চীনা, মালয়বাসী, জাপানী সবাই ঠেলাঠেলি ক'রে ধাক্কা খেয়ে এই বিপ্লবী বীরকে একটি-বার দেখবার জন্য সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা কর্ছে।

গৌরবব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে খাড়া হ'য়ে মাথা তুলে মধুর স্মিতমুখে নেতাজী দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। যে দেখ্ছে সে-ই মুগ্ধ হচ্ছে। আমরা তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম—হাঁ, এইবার আমরা আমাদের ঠিক নেতা পেয়েছি—ইনিই আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারবেন।

পরদিন ১৯৪৩ সালের ৩রা জুলাই নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবৃন্দ এবং হঙ্কং, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, বোর্ণিও

প্রভৃতি দেশ থেকে আগত ভারত-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সভ্যদের নিয়ে একটা সভা ক'রলেন। এই সভায় আলোচনাকালে নেতাজীর আধুনিক যুদ্ধনীতি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জ্ঞান আমার মত সামরিক কর্ম্মচারীদের মুগ্ধ ক'রেছিল।

৪ঠা জুলাই পূর্ব্বএশিয়ার সকল ভারতীয় প্রতিনিধিরাই সিঙ্গাপুরে এসে সমবেত হ'লেন। 'ক্যাথায় বিল্ডিং' (Cathay Building)-এ এক বিরাট সভা হ'ল। এই সভায় রাসবিহারী বোস এক চিরস্মরণীয় বক্তৃতায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমস্ত ভার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপর অর্পণ ক'রলেন।

নেতাজী সসম্ভ্রমে সে ভার গ্রহণ ক'রে তাঁর বক্তৃতায় ব'ল্লেন :—

"বন্ধুগণ, স্বাধীনতা-কামী ভারতীয়দের আর বৃথা কালক্ষেপ ক'রলে চলবে না, তা'দের কাজ করবার দিন এসে গেছে। সামরিক নিয়ম, শৃঙ্খলা মেনে আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা রেখে মহাযুদ্ধের এই সঙ্কটময় দিনে আমাদের কর্ম্মপথে এগিয়ে যেতে হ'বে। আমাদের যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হ'বে তার জন্য পূর্ব্বএশিয়া-বাসী ভারতীয়দের আমি সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে প্রস্তুত হ'তে আহ্বান ক'রছি। আমি জানি—তাঁরা আমার এ আহ্বানে সাড়া দেবেন···

আমি আরও কয়েকবার বলেছি—১৯৪১ সালে যখন আমি কোন জরুরী কাজের জন্য দেশ ত্যাগ ক'রে বিদেশে যাই, তখন আমি আমার দেশবাসীর অধিকাংশের

ইচ্ছানুসারেই তা' করি। তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগের নানা বাধা সত্ত্বেও দেশবাসীর সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান আমি বজায় রেখেছি···

দেশপ্রেমিক ভারতীয়েরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও ভারতের অভ্যন্তরস্থ দেশসেবকের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য পরিচালনাই ক'রছেন। আমি এ কথা নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি—আমরা এ পর্য্যন্ত যা ক'রেছি বা ভবিষ্যতে যা ক'রব সে সবেরই উদ্দেশ্য এক—ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের যা'তে অনিষ্ট হয় অথবা ভারতবাসীর যা ইচ্ছা নয় এমন কাজ আমাদের দ্বারা কখনও হ'বে না।

আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রতে স্বাধীন ভারতের একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা আমি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি···নিজেদের চেষ্টা এবং আত্মত্যাগের দ্বারা ক্রমে আমরা এমন শক্তি অর্জ্জন ক'রব যার দ্বারা আমরা আমাদের স্বাধীনতা চির অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হ'ব···এই যুদ্ধে আমরা যে বিজয়লাভ ক'রব এ কথা সুনিশ্চিত,—কিন্তু তাই ব'লে শত্রুপক্ষের ক্ষমতাকে একটুও কম ব'লে ভাবলে চলবে না। মাঝে মাঝে হয়ত আমাদের সাময়িক পরাজয় হ'বে, তাতেও ভগ্নোদ্যম হ'লে চলবে না। যে যুদ্ধ আমাদের ক'রতে হ'বে সে বড় কঠিন—কারণ শত্রু আমাদের প্রবল, ক্রূর ও নৃশংস। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আপনাদের অনেক দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হ'বে। ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণা, অনিদ্রার কষ্ট, দুর্গম পথে অভিযান, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত

বরণ ক'রতে হ'তে পারে। এই সব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবেই মিলবে আপনাদের স্বাধীনতা। আমি জানি—আপনারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আপনাদের দরিদ্রা, পরাধীনা দেশ-মাতার উদ্ধারসাধন ক'রবেন···"

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কথা চারিদিকে ঘোষণা করা হ'ল। সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংস্-এর সামনে সৈন্যদের আনুষ্ঠানিক 'প্যারেড' হ'ল। নেতাজী তা' পরিদর্শনের পর বক্তৃতায় বল্‌লেন :—

"আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ,—আজ আমার জীবনে মহাগৌরবের দিন : ভগবানের কৃপায় আজ আমি জগৎবাসীর কাছে ঘোষণা ক'রবার সুযোগ পেয়েছি—হিন্দুস্থানের আজাদের (মুক্তির) জন্য আমরা আজ একটা ফৌজ গড়ে তুলতে পেরেছি। যে সিঙ্গাপুর একদিন ব্রিটিশের গর্ব্বের বস্তু ছিল—সেইখানে—সেই সিঙ্গাপুরে আমাদের ফৌজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই ফৌজই ভারতকে ব্রিটিশ অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত ক'রবে। ··এই ফৌজ সম্পূর্ণ ভারতীয় নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে জেনে প্রত্যেক ভারতবাসীই গর্ব্ব অনুভব ক'রবেন, তাঁরা আরও গৌরব অনুভব ক'রবেন যখন শুনবেন—এক শুভ-মুহূর্ত্তে ভারতীয় নেতৃত্বেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়েছে···ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আজ আর কোন বালকেরও বুঝ্‌তে বাকি নেই যে—ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অবসান হ'য়েছে।

"বন্ধুগণ, সৈন্যগণ,—আপনাদের রণনীতি হ'বে—দিল্লী চলো; চলো—দিল্লী। জানি না আমরা কতজন এই মুক্তি-সংগ্রামের পর বেঁচে থাকব। কিন্তু এ কথা জানি—জয় লাভ আমরা ক'রবই, আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য-দল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অপর মহাশ্মশান পুরাতন দিল্লীর লাল কেল্লায় গিয়ে বিজয়-প্রদর্শনী না করা পর্য্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না।

"রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি—ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের অন্যান্য যোগ্যতা সব কিছুই লাভ ক'রেছে, অভাব আছে তার শুধু একটি মাত্র ফৌজের। সৈন্যদল হাতে ছিল ব'লেই আমেরিকার জর্জ্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ ক'রে দেশকে স্বাধীন ক'রতে পেরেছিলেন। গ্যারিবল্ডি সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাহায্য পেয়েছিলেন ব'লে ইটালী স্বাধীন হ'ল। মুক্তিকামী ভারতের জাতীয় ফৌজ গঠন করার গৌরব আপনারাই প্রথমে লাভ ক'রলেন।...যে সব সৈনিক নিজের দেশের কাছে বিশ্বস্ত থেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ পালন ক'রতে পারে—দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে যারা প্রস্তুত, জগতে তা'দের পরাজয় নেই। সৈনিকের এই তিনটি আদর্শ আপনারা সবাই সর্ব্বদা মনে রাখবেন।

"বন্ধুগণ, আজ আপনারাই ভারতের আশা ভরসা, সুতরাং আপনারা এমন ভাবে সৈনিকের কর্ত্তব্য ক'রে যাবেন যা'তে ভারতবাসী আপনাদের প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করেন ও ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আপনাদের কথা ভেবে গৌরব অনুভব করেন। আমি নিজে আপনাদের সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে, পরাজয়ে

বিজয়ে—সর্ব্বাবস্থায় আপনাদের সাথে সাথে থাকব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আপাততঃ আমি আপনাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্ট, দুঃসাধ্য অভিযান ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দিতে পার্‌ছি না। আমাদের মধ্যে কাহারা যুদ্ধাবসানে বেঁচে থেকে স্বাধীন ভারত দেখ্‌বেন সেটা বড় কথা নয়,—সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—ভারত আমাদের স্বাধীন হবে এবং সেই স্বাধীনতা অর্জ্জনে আমাদের সব কিছু আমরা দান ক'রব। ভগবান আমাদেব ফৌজকে আশীর্ব্বাদ করুন, আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন যুদ্ধে বিজয় লাভ করি।"

৬ই জুলাই জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর অভ্যর্থনার্থে মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজের আর একটি 'প্যারেড' হয়। ফৌজের অভিবাদন গ্রহণ ক'রবার পর নেতাজী ও জেনারেল তোজো একটি ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন। এই সময় জেনারেল তোজো নেতাজীকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য অভিনন্দন জানান এবং এই আশ্বাস দেন যে জাপানীরা সর্ব্বপ্রকারে তাঁ'দের সাহায্য ক'রবে।

১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই তারিখে নেতাজী ভারতীয় অসামরিক এবং আজাদ হিন্দ দলের সকল লোককে এক জনসভায় আহ্বান করেন। এই সভায় তিনি এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় বলেন :—

"আমি আপনাদের কাছে আজ প্রাণ খুলে বল্‌তে চাই—ঘরবাড়ি' দেশ ছেড়ে বিপদ-সঙ্কুল পথে আমি কেন যাত্রা

ক'রেছিলাম। ব্রিটিশেরা আমাকে কারাগারে বন্দী ক'রে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু আমি ঐখানে থেকে নীরবে মুক্তির উপায় চিন্তা ক'রছিলাম। জীবনে আমি এগারো বার কারাদণ্ড ভোগ ক'রেছি সুতরাং কারাবাস আমার অনেকটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এইবার আমার মনে হ'তে লাগল—ভারতের বাইরে গিয়ে তার স্বাধীনতার জন্য আমার কিছু চেষ্টা করা প্রয়োজন, তা'তে যতই বিপদ হয়—হ'ক...

"তিন মাস ধরে ধ্যান-ধারণা ক'রে আমি বুঝতে চেষ্টা করি—মরণ পণ ক'রে এই কর্ত্তব্য পালন ক'রবার মত মনের বল আমার আছে কি না। ভারতবর্ষের বাইরে যাবার আগে আমার কারাগারের বাইরে আসার প্রয়োজন। কারা-মুক্তি পাবার জন্যে আমি অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করি। আমি বেশ ভালকরেই জান্‌তাম—ভারতবর্ষেই হ'ক, কি আয়ার্ল্যাণ্ডেই হ'ক—কোথাও কোন বন্দী এই পন্থা অবলম্বন ক'রে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে মুক্তি দিতে বাধ্য ক'রতে পারে নি। আমি এ-ও জান্‌তাম যে এইরকম চেষ্টা ক'রতে গিয়েই টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনী আর যতীন দাস জীবন দিয়েছেন। কিন্তু তবুও আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল কোন ঐতিহাসিক কাজ ক'রবার জন্য আমার আহ্বান এসেছে। 'যা থাকে কপালে' বলে আমি অনশন ধর্ম্মঘট সুরু ক'রে দিলাম। সাত দিন অনশনের পরই গবর্ণমেন্টের টনক নড়ল—আমার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে তাঁরা আমায় মুক্তি দিলেন। তাঁ'দের ইচ্ছা রইল—দুই এক

মাস পরে আমি একটু সুস্থ হ'লেই তাঁরা আবার আমায় ধরে জেলে পুরবেন। কিন্তু তাঁরা আমায় আবার ধরবার আগেই আমি তাঁ'দের নাগালের বাইরে এসে গেলাম…

"বন্ধুগণ, আপনারা জানেন ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পর থেকেই আমি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি। বিশ বছর ধরে আমি আইন অমান্য আন্দোলন ক'রে এসেছি। তা' ছাড়া হিংস্র হ'ক বা অহিংস্র হ'ক—কোন বিপ্লবাত্মক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে সন্দেহ ক'রে বারবার আমায় বিনা বিচারে আটক করা হ'য়েছে। এইরূপ নানা অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই ধারণা হ'য়েছিল যে শুধু ভারতের ভিতরে থেকে চেষ্টা ক'রে কোন দিনই আমরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কবল হ'তে মুক্ত ক'রতে পারব না…

"সংক্ষেপে বলতে গেলে—আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতার আন্দোলন চলেছে ভারতের বাইরে গিয়ে তা'কে সাহায্য করা…বস্তুতঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বাইরের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন হ'লেও সে সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্য। বাইরে থেকে ভারত-বাসীর এখন দুই রকম সাহায্যের প্রয়োজন—এক নৈতিক, দুই যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের। প্রথমতঃ—তা'দের বিশ্বাস-উৎপাদন ক'রতে হবে—তারা জয়লাভ ক'রবেই ; দ্বিতীয়তঃ—বাইরে থেকে তা'দের যুদ্ধ ক'রবার সরঞ্জাম ও শিক্ষিত সৈনিক যোগাতে হবে…

দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আমরা কি পন্থা অবলম্বন ক'রতে যাচ্ছি একথা জগৎবাসীকে এমন কি আমাদের শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে জানাবার দিন আজ এসেছে। আমরা ঘোষণা ক'রতে পারি যে ভারতবর্ষের বাইরের ভারতীয়েরা বিশেষ ক'রে পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়েরা এমন একটা শক্তিশালী ফৌজ গড়তে সুরু ক'রেছেন যা' ভারতের ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ ক'রবারও স্পর্দ্ধা রাখে। এই আক্রমণ যখন তারা ক'রবে তখন যে বিপ্লব সুরু হবে তা' শুধু ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে না—ব্রিটিশ বেতন ভোগী ভারতীয় সৈন্যদলের মাঝেও এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে। ভিতর বাইরে থেকে এমনি ক'রে আক্রান্ত হ'য়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান হবে, ভারতীয়েরা পাবে মুক্তি। সুতরাং আমার মতে অক্ষশক্তিগণ আমাদের এ আন্দোলন কিরূপ চোখে দেখ্‌বেন তা' ভাববার দরকার নেই। শুধু ভারতীয়েরাই যদি ভিতর বাইরে থেকে নিজের নিজের কাজ ক'রে যান তা'হলে তাঁরাই ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত ক'রে আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তি সাধন ক'রতে পারবেন।...বন্ধুগণ, আজ আমি বলি আজ থেকে ত্রিশলক্ষ পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের বুলি হ'ক—'সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য সর্ব্বস্ব পণ' (Total mobilisation for a Total War)। এই মহান উদ্দেশ্যে আমি অন্ততঃ তিন লক্ষ সৈন্য এবং তিন কোটি মুদ্রা (ডলার) পাবার আশা পোষণ করি। আমি এখান থেকে একটি ভারতীয় নারী বাহিনীও গড়ে

তুলতে চাই, এ বাহিনীর বীরাঙ্গনারা মৃত্যু ভয় কাকে বলে জানবেন না। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রামে ঝাঁসীর রাণী যেমন করে অস্ত্র ধরে ছিলেন, ঠিক তেমনি ক'রে অস্ত্র ধর্‌বেন এঁরা···

"স্বদেশবাসী ভারতীয়েরা আজ নিদারুণ কষ্টে পড়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গন কামনা ক'রছেন। আপনারা পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের সমগ্র ধনবল জনবল আমার হাতে দিন আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি ক'রব—প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের দ্বিতীয় রণাঙ্গন।"

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ

১৯৪৩ সালের ২৫শে আগষ্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা' নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :—

"ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মঙ্গলেচ্ছু হ'য়ে আমি আজ থেকে এই ফৌজের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ ক'রছি।

"আজ আমার জীবনে পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন। কারণ কোন ভারতীয়ের কাছেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা হওয়ার চেয়ে বেশী সম্মানের আর কিছু হ'তে পারে না।

"আমি নিজেকে ৩৮ কোটি ভারতবাসীর সেবক বলে মনে করি। আমি আমার কর্ত্তব্য এমন ভাবে পালন ক'রতে চাই যাতে এই ৩৮ কোটি নরনারী নিরাপদে শান্তিতে বাস ক'রে আমার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রতে পারে। অনাবিল জাতীয়তা বোধ, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই কেবল সত্যিকার আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে।

"মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রাম ঘনিয়ে আসছে,—এ সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের অতি গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য যথাযথ পালন ক'রতে হ'লে আজাদ হিন্দের লক্ষ্য থাকবে শুধু ভারতের স্বাধীনতা, আর এ স্বাধীনতা লাভ ক'রতে পণ হবে তা'দের—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'। যখন তারা দাঁড়াবে তখন মনে হবে যেন 'গ্রাণাইট্' পাথরের একটা

দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, যখন তারা মার্চ্চ ক'রে যাবে—দেখে মনে হবে যেন একটা 'ষ্টীম্‌রোলার' চলেছে।

"কাজ আমাদেব সহজ নয়, এ সংগ্রাম হ'বে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর, কিন্তু ভয় কি?—যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি সে উদ্দেশ্য আমাদের সফল হবেই, আমরা জয়লাভ ক'রব। ৩৮ কোটি নরনারী পৃথিবীর সমগ্র লোক সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ। স্বাধীনতাব অধিকার এদের জন্মগত এবং সে অধিকার লাভের জন্য মূল্য দিতে আজ তারা প্রস্তুত। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে আজ আমাদের এই জন্মগত অধিকার লাভে বঞ্চিত ক'রতে পারে।

"বন্ধুগণ,—আমাদের কাজ এরই মধ্যে সুরু হ'য়ে গেছে। 'দিল্লী চলো' হুঙ্কারে আসুন আমরা আজ আমাদের রণযাত্রা সুরু ক'রে দেই, এর পর নয়া দিল্লীর বড়লাট ভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা না ওড়া পর্য্যন্ত—ভারতের রাজধানী লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের দৃপ্ত বিজয় প্রদর্শনী না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বিরাম নেই।"

১৯৪৩ সালের ২রা অক্টোবর পূর্ব্বএশিয়ার সর্ব্বত্র মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চসপ্ততিতম জন্ম-তিথি উৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে 'ফেরের পার্কে' (Farrer Park) ভারতীয়দের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে নেতাজী বলেন :—

"ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মাজীর স্থান কোথায়—এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা ক'রব। তিনি

ভারতবর্ষ এবং তার স্বাধীনতার জন্য যা ক'রেছেন—তার তুলনা মেলে না, শুধু এইজন্যই তাঁর নাম ভারতের জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হ'য়ে থাক্‌বে।......

বিগত মহাযুদ্ধ শেষ হ'লে ভারতীয় নেতারা তাঁ'দের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার দাবী ক'রতে গিয়ে বুঝলেন যে মিষ্টি কথায় তাঁ'দের শুধু প্রতারণা করা হ'য়েছে। তাঁ'দের দাবীর উত্তরে মিল্‌ল শুধু ১৯১৯ সালের রাউলাট আইন: ফলে সামান্য যেটুকু স্বাধীনতা তাঁ'দের ছিল তাও তাঁরা হারালেন। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রতে গেলেন তাঁরা—ঘট্‌ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। গত মহাযুদ্ধে ভারতীয়েরা ব্রিটিশদের জন্য যে আত্মোৎসর্গ ক'রেছে তার প্রতিদানে হু'টি পুরস্কার তা'দের মিলেছে—রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।......

"১৯১৯ সালের এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর ভারতবাসী একেবারে স্তব্ধ, মুহ্যমান হ'য়ে রইলেন: স্বাধীনতা লাভের সকল চেষ্টা তাঁ'দের ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ সৈন্য ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে। আইনতান্ত্রিক আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন, বিপ্লব—কোন কিছুতেই স্বাধীনতার পথ সুগম হ'ল না। ভারতীয়দের মন থেকে স্বাধীনতার সকল আশা তিরোহিত হ'ল—নৈরাশ্যের নিবিড় আঁধারে তাঁরা নতুন পথ, নতুন অস্ত্র খুঁজে ফির্‌তে লাগলেন। ঠিক এই সময় গান্ধীজী দেশবাসীকে এক অভিনব পন্থার নির্দ্দেশ দিলেন—এই পন্থা হচ্ছে—অসহযোগ, সত্যাগ্রহ বা আইন-অমান্য আন্দোলন। বিধাতা-

পুরুষ নিজে যেন মহাত্মাজীর মুখ দিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন। তখনই দলে দলে ভারতীয়েরা এসে গান্ধীজীর পতাকা তলে সমবেত হ'ল। ভারত যেন একটা মহা দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেল। প্রত্যেক ভারতীয়ের মুখে আবার আশা ও আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল। আর ভয় নেই,—সিদ্ধি এবার অনিবার্য্য।... ..

"কুড়ি বৎসরেরও বেশী মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীদের নিয়ে দেশের মুক্তির জন্য সাধনা ক'রেছেন।......

"১৯২০ সালে মহাত্মা যদি এ পথের সন্ধান না দিতেন—তা'হলে ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার সীমা থাকত না—এ কথা বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। তাই ব'লছি ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি যা' ক'রেছেন তার তুলনা মিলে না। ভারতের তৎকালীন অবস্থায় একজন লোকের পক্ষে এক জীবনে এর চেয়ে বেশী করা সম্ভবপর ছিল না। মাত্র একজন লোকের সঙ্গে কেবল তাঁর তুলনা করা চলে—তিনি হচ্ছেন মুস্তাফা কামাল। বিগত মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হ'লে তিনিই তা'কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন—তুরস্কবাসী তাই তাঁর নাম রাখেন গাজি।......

"১৯২০ সাল থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভারতীয়েরা দু'টি জিনিষ শিখেছে। স্বাধীনতার জন্য এ দু'টিরই বড় প্রয়োজন। এর একটি হ'চ্ছে—জাতীয় আত্মমর্য্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়বোধ যার ফলে প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়ে আজ বিপ্লবের অগ্নিশিখা দেদীপ্যমান। দ্বিতীয়টি—সঙ্ঘবদ্ধতা,

ভারতের সুদূর নিভৃত পল্লী অঞ্চলে পর্য্যন্ত এই স্বাধীনতাকামী সঙ্ঘ তার শাখা-প্রশাখা মেলে ধরেছে।······

"মহাত্মা গান্ধী আমাদের স্বাধীনতার সরল পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি এবং দেশের অন্যান্য নেতা এখন কারাগারে বন্দীজীবন যাপন ক'রছেন। মহাত্মা গান্ধীর আরব্ধ কাজ আজ ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ ক'রতে হবে—তা তিনি ভারতের বাহিরেই থাকুন বা ভারতের অভ্যন্তরেই থাকুন।······

"আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তখন তিনি বলেছিলেন—ভারতের হাতে যদি আজ তলোয়ার থাকত, তবে সেই তলোয়ার হাতেই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ত। এই প্রসঙ্গে ব'লতে গিয়ে মহাত্মাজী আরও বলেন,—'অস্ত্র নিয়ে বিপ্লব সুরু করা যখন বর্ত্তমানে সম্ভব নয়—তখন আমাদের দেশের মুক্তির একমাত্র পন্থা হ'চ্ছে এখন অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ'। কালচক্র এগিয়ে গেছে, এখন ভারতীয়দের অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামবার দিন এসে গেছে। আজ বড় আনন্দ ও গৌরবের কথা—আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠেছে এবং দিন দিন তার সৈন্য সংখ্যা বাড়্ছে।"

সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর বেলা ১০-৩০ ঘটিকার সময় সিঙ্গাপুরের ক্যাথায় বিল্ডিংসে (Cathay Buildings) ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের এক ঐতিহাসিক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় পূর্ব্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের যাবতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী বোস সকলের সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে এক অভিভাষণ পাঠ করেন, কর্ণেল চ্যাটার্জ্জি করেন সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ। এর পর নেতাজী বক্তৃতা মঞ্চে এসে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেন। শ্রোতারা রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাঁর বক্তৃতা শুনতে থাকে। নেতাজী হিন্দুস্থানীতে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের অর্থ শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কাছে ব্যাখ্যা করেন। সিঙ্গাপুরের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীচিদামবরম্—নেতাজীর বক্তৃতা তামিলে তর্জ্জমা ক'রে শুনান।

নেতাজী যখন ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ ক'রলেন তখন চারিদিক থেকে বিরাট জয়ধ্বনি উঠে সভা-মণ্ডপকে কাঁপিয়ে তুল্‌লে। ভাবাতিশয্যে নেতাজীর কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না, তারপর তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে শপথের প্রত্যেকটি কথা অতি স্পষ্ট ক'রে পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ ক'রতে লাগলেন। সেই বিরাট জনতার ভিতরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রলেন—"আমি সুভাষচন্দ্র বোস ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ ক'রছি যে ভারতবর্ষ এবং আটত্রিশ

কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংগ্রাম করব।" এইটুকু বলবার পর তিনি একটু থামলেন,—আমাদের মনে হচ্ছিল হৃদয়াবেগ রোধ ক'রতে না পেরে এইবার তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বেন। আমরা সকলেই শপথের প্রত্যেকটি বাক্য মনে মনে আবৃত্তি ক'রেছিলাম। প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ নেতাজীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে আমরা সবাই ঝুঁকে পড়ছিলাম। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী যেন নেতাজীর মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। চারিদিকে বিপুল নিস্তব্ধতা! নিশ্চল দেহে নিরুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে আমরা নীরবে অপেক্ষা ক'রছিলাম—নেতাজী নিজেকে সামলে আবার কি বলেন। একটু পরেই গির্জের অরগ্যানের আওয়াজের মত গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বল্‌তে সুরু ক'রলেন :—

"আমি চিরকাল ভারতের সেবক থেকে আমার আটত্রিশ কোটী ভাই-বোনদের কল্যাণ সাধনে আত্ম নিয়োগ ক'রব। এই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা লাভের পরেও—এই স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে আমার দেহের শেষ রক্ত বিন্দু কাজ ক'রবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।"

এইবার আমাদের স্তব্ধভাব কেটে গেল—আমরা প্রকৃতিস্থ হ'লাম।

এরপর সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সভ্যগণ একে একে এসে এই শপথ গ্রহণ ক'রতে লাগলেন—ভগবানের নামে আমি এই পবিত্র শপথ গ্রহণ ক'রছি যে ভারতবর্ষ এবং আমার ৩৮ কোটি দেশবাসীর স্বাধীনতা অর্জ্জনে আমি অটল বিশ্বস্ততার

সহিত সুভাষচন্দ্র বসুর আদেশ পালন ক'রব—এবং ভারতের মুক্তির জন্য আমার জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত থাকব।"

ঘোষণা

এরপর নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা পাঠ ক'রলেন। এ ঘোষণা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। নেতাজী এই ঘোষণায় বল্‌লেন :—

"১৭৫৭ সালে বাংলায় ব্রিটিশের কাছে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয়েরা তাঁদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবার জন্য একশত বৎসর ধরে অবিরাম কঠোর যুদ্ধ চালান। ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায় ভারতীয়দের অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনীতে পূর্ণ। এই অধ্যায়েই বাংলার সিরাজউদ্দৌলা, মোহনলাল,—দক্ষিণ ভারতের হায়দার আলি, টিপু সুলতান, ভেলুথাম্পি,—মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব ভোঁসলা, পেশোয়া বাজীরাও,—অযোধ্যার বেগম,—পঞ্জাবের সর্দ্দার শ্যাম সিং আগরওয়ালা,—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ,—ডুমরাওঁয়ের মহারাজা কুমার সিং এবং নানা সাহেবের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বুঝতে পারেন নি যে ব্রিটিশেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে, যদি এ কথা তাঁরা বুঝতেন তা'হলে নিশ্চয়ই সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতেন। ভারতীয়েরা যখন সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝ্‌লেন তখন বড় দেরী হ'য়ে গেছে, তবু

১৮৫৭ সালে বাহাদুর সাহের নেতৃত্বে ভারতীয়েরা একবার সমবেত চেষ্টা ক'রে দেখ্লেন। স্বাধীন ভারতীয়দের এই শেষ সংগ্রাম।

ব্রিটিশেরা জোর ক'রে ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র সব কেড়ে নিলে, পাশবিক অত্যাচার সুরু ক'রলে—ফলে ভারতীয়েরা কিছুকাল তা'দের পদানত হ'য়ে রইলেন। তারপর ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'দের মধ্যে আবার নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেল। এই সাল থেকে আরম্ভ ক'রে গত মহাযুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত তাঁরা আন্দোলন, প্রচার, ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন, সন্ত্রাসবাদ, সশস্ত্র বিপ্লব প্রভৃতি নানা উপায়ে তাঁদের হৃত-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন—পারেন নি। অবশেষে নৈরাশ্যে মুহ্যমান হ'য়ে তাঁরা যখন কোন নতুন পন্থার সন্ধানে ফির্ছেন—এমন সময়ে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী এঁদের হাতে এক নতুন অস্ত্র তুলে দিলেন—এই অস্ত্র হচ্ছে অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ।

এখন থেকে ভারতীয়দের শুধু যে রাজনৈতিক চেতনা লাভ হ'ল তাই নয়,—তাঁরা একটা রাজনৈতিক ঐক্যও লাভ ক'রলেন। তাঁ'দের এখন কথা এক, ভাব এক, ইচ্ছা এক ও আদর্শ এক। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত তাঁরা ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীরূপে কাজ ক'রে তাঁ'দের শাসন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এমনি ক'রে বর্ত্তমান মহাসমরের প্রাক্কালে ভারতীয় শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়েছে।

ব্রিটিশের প্রতারণা, শোষণ, নির্য্যাতনে ভারতবাসী একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠেছেন, ব্রিটিশের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আজ আর তাঁ'দের নেই,—ব্রিটিশেরা আজ ভারতবর্ষে সহায়হীন, বন্ধুহীন। এই দূষিত শাসনের অবসান ঘটাতে প্রয়োজন শুধু একটিমাত্র অনল শিখা—এই শিখা জ্বালাবে আজ আজাদ হিন্দ ফৌজ।

মুক্তির দিন আজ কাছে এসে গেছে,—এখন ভারতীয় জনগণের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে একটা সাময়িক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ক'রে তারই পতাকাতলে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা করা। ভারতের নেতৃবৃন্দ আজ কারারুদ্ধ,—ভারতের অভ্যন্তরবাসী জনগণ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, সুতরাং মাতৃভূমিতে এখন এইরূপ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়, তা'রই নির্দ্দেশে সশস্ত্র যুদ্ধ সুরু করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এ কাজের ভার গ্রহণ ক'রতে হবে পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের। ভারতবর্ষের ভেতর এবং বাইরে থেকে ভারতীয়দের এ কাজে—অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজ দিয়ে চূড়ান্ত মুক্তি-সংগ্রাম চালানোর কাজে প্রাণপণ সাহায্য করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

এই সাময়িক গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য লাভের অধিকার রাখে এবং তাহা দাবী করে। এই গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক নাগরিককে যে কোন ধর্ম্মপন্থা অনুসরণের স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সমগ্র জাতির এবং তার শাখা-উপশাখাসমূহের সুখসমৃদ্ধির ব্যবস্থা ক'রতে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট কৃত-

সঙ্কল্প—বিদেশী সরকার স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভেদ সৃষ্টি ক'রেছিল—আজাদ হিন্দ তা' সমূলে উৎপাটন ক'রবে।

ভগবানের নামে,—আমাদের যে সব পূর্ব্বপুরুষ ভারতীয় জনগণকে এক জাতিতে পরিণত ক'রার চেষ্টা করে গেছেন তাঁ'দের নামে এবং অতীত ভারতের যে সব বীর পুরুষেরা নিজেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের ভিতরে শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের স্পৃহা জাগিয়ে রেখে গেছেন—তাঁ'দের পূতনামে আমরা প্রতি ভারতীয়কে আজাদ হিন্দ পতাকাতলে সমবেত হ'য়ে মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে আহ্বান ক'রছি। তাঁরা ব্রিটিশ এবং ভারতে অবস্থানকারী ব্রিটিশের অন্যান্য মিত্রশক্তির সঙ্গে অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় নিয়ে—শেষ বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে যুদ্ধ চালাতে থাকবেন। ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত ক'রে দেশ স্বাধীন না করা পর্য্যন্ত তাঁ'দের বিরাম নেই।"

সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হ'ল এইভাবে :—

সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র-সচিব।

ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারীসংগঠন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব।

এস্, এ, আয়ার—প্রচার সচিব।

লেফ্‌ট, কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি—অর্থসচিব।

লেফ্‌ট. কর্ণেল এন্, এস্, ভগত, লেফ্‌ট, কর্ণেল, জে, কে,

ভোঁসলা, লেফ্‌ট, কর্ণেল গুলজারা সিং, লেফ্‌ট কর্ণেল, এম্‌, জেড্‌, কিয়ানি, লেফ্‌ট, কর্ণেল, এ, ডি, লোগনাধন, লেফ্‌ট, কর্ণেল ইশান-কাদের এবং লেফ্‌ট কর্ণেল শাহ্‌-নাওয়াজ—সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি।

এ, এম, সহায়—সেক্রেটারী (সচিব সম মর্য্যাদাসম্পন্ন)।

রাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা।

করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি, এম, খান, ওয়াই, এলেপ্পা জে, থিবি এবং সর্দ্দার ঈশ্বর সিং—পরামর্শদাতৃমণ্ডলী।

এ, এন্‌, সরকার—আইন পরামর্শদাতা।

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

১৯৪৩ সালের ২৫শে অক্টোবর সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংসের সম্মুখে অসামরিক ভারতীয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিরাট জনতার কাছে নেতাজী নিম্নলিখিত ঘোষণা পাঠ করেন :—

"রাত্রি ১২-৫ মিনিটের সময় মন্ত্রী-পরিষদের দ্বিতীয় বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে : 'আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌ছে।"

এই সংবাদ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপুল উল্লাসে মহা হুঙ্কারে দিগন্ত প্রকম্পিত ক'রে এর সম্বর্দ্ধনা জানায়। প্রায় পনের মিনিট কাল পঞ্চাশ হাজারের উপর লোকের জনতা অস্থির উন্মত্তবৎ আচরণ কর্‌তে থাকে।

উত্তেজিত জনতার শৃঙ্খলা রাখা কঠিন হ'য়ে উঠ্ল, সবাই বক্তৃতা মঞ্চের কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত। তখন নেতাজী সবাইকে বললেন—যে যেখানে আছেন সেখানেই দাঁড়িয়ে শুধু হাত তুলে তাঁদের অনুমোদন জানাতে,—সঙ্গে সঙ্গে এত হাত উঠল যে দেখে মনে হয় যেন এক মহারণ্য। এর পর ফৌজের সৈন্যেরা তাদের রাইফেল কাঁধে তুলে ঠিক এমনি করে তাদের সম্মতি জানাল। সেদিন যে দৃশ্য দেখেছি তা আর আমি জীবনে ভুলব না। ঝাঁসী রাণী বাহিনীর কয়েক জন মহিলা ভাবাতিশয্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। ভূমিতলে হতচেতনাবস্থায় শায়িত হয়েই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে তাঁরা চীৎকার করছিলেন,—'চল দিল্লী, চল দিল্লী।'

সুভাষ ব্রিগেড

আজাদ হিন্দ ফৌজের সরাসরি নেতৃত্ব নেবার অল্পকাল পরেই নেতাজী তাঁর সিঙ্গাপুরেব হেডকোয়ার্টার্সে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদেব এক 'বৈঠক আহ্বান করেন। এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। মেজর জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা
২। " " এম্, জেড্ কিয়ানি
৩। " " আজিজ আহম্মদ
৪। " " শাহ নাওয়াজ
৫। কর্ণেল আই, জে, কিয়ানি
৬। " গুলজারা সিং
৭। " হাবিবুর রহমান
৮। " পি, কে, সাইগল

আগামী যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কি ভাবে নিয়োগ করা যায় এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-এশিয়ার জাপানী সৈন্যদলের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ ফিল্ড মার্শাল তেরায়ুচির সঙ্গে নেতাজীর পূর্ব্বে যে সব কথা হয় নেতাজী উল্লিখিত অফিসারদের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা করেন।

নেতাজী বলেন—কাউণ্ট তেরায়ুচির মত—আজাদ হিন্দের সৈন্যদল জাপানী সৈন্যদের মত যুদ্ধ করতে পারবে না,—কারণ প্রথমতঃ মালয়ে একবার তাদের পরাজয় হ'য়ে

তাদের মনের বল নষ্ট হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ এরা ব্রিটিশের অধীনে কাজ করে এসেছে—সেখানে প্রচুর ভাল খাবারের ব্যবস্থা ছিল—এদিকে জাপানী সৈন্য বিভাগে ঠিক তার উল্টো। জাপানী সৈনিকদের অতি সামান্য সাধারণ খাবার খেয়ে অনেক কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। তারপর যে সব সৈন্য নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হয়েছে তাদের সবাই আগে শুধু টাকা-পয়সার লোভে ব্রিটিশের অধীনে কাজ করে এসেছে, এদের রাজনৈতিক শিক্ষা বা দেশাত্মবোধ বল্‌তে কিছু নেই,—সুতরাং সুযোগ পেলেই এরা ব্রিটিশের দলে গিয়ে ভিড়বে—কারণ সেখানে আহারের ব্যবস্থা ভাল—বেতন ভাল—তা ছাড়া তারা অনেক দিন দেশে যায়নি, সেখানে গেলে ছুটি-ছাটা নিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে দেখে আসার সুবিধা আছে।

এই সব কথা বলার পর তিনি নেতাজীকে যুক্তি দেন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে সিঙ্গাপুরে রেখে দেওয়াই ভাল—কারণ তাদের আর যুদ্ধের কাজে লাগানোর দরকার হবে না। তিনি বলেন—জাপানী সৈন্যেরাই যুদ্ধ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দেবে—এ কাজে ভারতীয়দের কাছ থেকে তারা চায় শুধু শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি—নেতাজী অনুগ্রহ করে কেবল এইটুকুর ব্যবস্থা করে দেবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর এবং অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের কিছু কিছু সাহায্য অবশ্য তাদের দিতে হবে—এরা গোপনে শত্রুর এলাকায়

প্রবেশ করবে, তা ছাড়া প্রচার-কার্য্যের দ্বারা ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে।

ফিল্ড মার্শাল তেরায়ুচির কথার জবাবে নেতাজী বলেন :—

জাপানীদের সাহায্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হলে সে হবে পরাধীনতার চেয়েও অধিকতর ঘৃণ্য। মণিপুরের যুদ্ধ—ভারতীয় স্বাধীনতারই যুদ্ধ—সুতরাং এ যুদ্ধে জাপানীদের আগে যেতে দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের পিছনে থাকার কোন মানে হয় না—ইহা জাতীয় মর্য্যাদার হানিকর। আসন্ন যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজই আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর অগ্রণী হয়ে প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে—ভারতের পবিত্র ভূমিতে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম রক্তবিন্দু দেবে ভারতীয়েরা।

নেতাজী আরও বলেন—ভারতের স্বাধীনতা ভারতীয়েরা নিজেদের উদ্যমেই লাভ করতে চেষ্টা করবে—প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও যদি তারা এতে সফলকাম না হয়—তবেই তখন তারা জাপানীদের সাহায্য প্রার্থনা করবে। ফিল্ড মার্শাল তেরায়ুচি অবশেষে নেতাজীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে বলেন—প্রথমে বাছাই করা একটা ভাল ব্রিগেড শুধু যুদ্ধ করতে পাঠানো হ'ক—এরা যদি জাপানীদের মত কষ্ট সহ্য ক'রে ভাল লড়তে পারে—তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য সৈন্যদলকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে।

এই সব কথা বলার পর নেতাজী বৈঠকে উপস্থিত সকল অফিসারের মত জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে

স্থির হয় গান্ধী, আজাদ এবং নেহরু 'ব্রিগেড' থেকে বাছাই করে লোক নিয়ে—একটা নতুন সৈন্যদল গড়া হবে—নাম হবে এর ১নং গেরিলা রেজিমেণ্ট। এই দলই প্রথমে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। এই দল ভাল কাজ দেখালে পরে সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধে নামানো হবে।

আমাকে এই রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার করা হ'ল—কর্ণেল ঠাকুর সিং হলেন সহকারী কম্যাণ্ডার—আর কর্ণেল মহবুব আহম্মদ—'রেজিমেণ্টাল এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট'।

রেজিমেণ্টটি গঠন করা হ'ল—টাইপিং-এ—১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সৈন্যেরা এর নাম রাখলে 'সুভাষ ব্রিগেড'। নেতাজী এতে আপত্তি জানালেন কারণ তাঁর মত—কোন জীবিত লোকের নামে কোন ব্রিগেডের নাম রাখা উচিত হবে না। তিনি বার বার নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন,—এ ব্রিগেডকে যেন 'সুভাষ ব্রিগেড' না বলা হয়। তা সত্ত্বেও সৈন্যেরা এ ব্রিগেডের ঐ নাম না রেখে ছাড়্‌লে না।

পরে ব্রিগেডটি আবার যখন নতুন করে গড়া হ'ল, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের পরিচালনা ভার যথাক্রমে মেজর পি, এস্, রাতুরি, মেজর রণ সিং এবং মেজর পদম সিং-এর উপর অর্পিত হ'ল। আদেশ দেওয়া হ'ল—ব্রিগেডটিকে দুই মাসের মধ্যেই যুদ্ধে নামতে হবে। এই ব্রিগেড এবং ১নং সৈন্যবাহিনীর তিনটি ব্রিগেডকে অস্ত্র দেওয়া হ'ল—মাঝারি মেশিন গান, হালকা মেশিন গান, রাইফেল ও হাতবোমা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের গেরিলা বাহিনীর হাতে কোন রকমের কামান দেওয়া হয় নি, তাদের জন্য বেতার বা টেলিফোনের ব্যবস্থাও করা হয় নি। মেশিন গানগুলির উপযুক্ত টোটা সরবরাহ ছিল না—চালাতে গেলে যে যন্ত্র চোখে লাগিয়ে নিবিখ করতে হয় তা নেই—অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও ব্যবস্থা নেই—মেশিনের কোন অংশ খারাপ হয়ে গেলে তা পরিবর্ত্তনের উপায়ও নেই। তা ছাড়া মেশিন গানগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাবার জন্য কোন মটর গাড়ী বা শকট বাহনও তাদের দেওয়া হয় নি।

ব্রিগেডের সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ৩০০০ লোকের জন্য মেডিক্যাল অফিসার মাত্র পাঁচ জন। এই পাঁচ জনকেও আবার দুই ভাগ করা হয়েছিল—কতকে অগ্রগামী সৈন্যদলের দেখা শুনা করতেন—অবশিষ্ট কতকে দেখতেন পিছনের দলকে। ডাক্তারদের অস্ত্র করবার যন্ত্রপাতি এক রকম ছিল না বললেই হয়—ঔষধ-পত্রও অত্যন্ত কম। জামাকাপড় জুতোর অভাবে সৈন্যদের কষ্টের সীমা ছিল না। মালয়ের দুর্ভেদ্য—বিষাক্ত বিছা, মাকড়ভরা জঙ্গলে খালি পায়ে গিয়ে তাদের গেরিলা যুদ্ধ শিখতে হ'ত।

মাত্র দু'মাসের মধ্যে এমনি কষ্ট করে যুদ্ধ শিখে ১নং গেরিলা ব্রিগেডকে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে নাম্‌তে হয়। ডিভি-শনাল কম্যাণ্ডার এম্, জেড্ কিয়ানি ও কোয়ার্টার মাষ্টার লেফ্‌ট, কর্ণেল এন্, এন্, ভোঁসলা অন্যান্য ব্রিগেড থেকে অস্ত্র-

শস্ত্র, সাজসজ্জা, জামাকাপড় ইত্যাদি এনে—এদের সমস্ত অভাব মিটান।

জাপানীদের কাছ থেকে কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া যায় নি। নেতাজী অমানুষিক পরিশ্রম করে অসামরিক লোকদের নিকট থেকে টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁরাও স্বেচ্ছায় সানন্দে প্রচুর টাকা দিতেন। সেই টাকা দিয়ে আজাদ হিন্দের প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম নেতাজী বাজার থেকে কিনতেন। নেতাজীর মুখে সব সময়ই শুনতাম—"যুদ্ধ আমাদের,—জাপানের সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকলে আমাদের চলবে কেন?"

এর পর সৈন্যদের কঠোর মানসিক ও সামরিক শিক্ষাদান আরম্ভ হ'ল। জঙ্গলে কি ক'রে লড়্তে হয়—তার দিকেই বেশী নজর দেওয়া হ'ল। নেতাজী সৈন্যদলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে—স্পষ্ট সোজা কথায় বল্লেন—এই যুদ্ধে অনেক কষ্ট তাদের সহ্য করতে হবে। যারা এ কষ্ট সহ্য করতে রাজী নয়—তারা বরং পিছনে থাকুক—যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করবার তাদের দরকার নেই। এ কথায় সৈন্যেরা সব এক কণ্ঠে বলে উঠল,—"না, নেতাজী,—আমরা পারব—আমাদের একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন আমরা কি করতে পারি—ব্রিটিশের অধীনে একদিন মাইনে নিয়ে লড়েছি বলে আমরা অবজ্ঞার পাত্র হয়েছি—কিন্তু আপনি আমাদের সুযোগ দিয়ে দেখুন, দেশের মুক্তি-কামনায় আমরা কেমন লড়ি। জগতের যে কোন দেশের সৈন্যের চেয়ে আমরা

কম যাব না।” নেতাজী সৈন্যদের বলে দিলেন তারা যেন কোন দিন জাপানীদের নির্দ্দেশে না চলে—তাদেরকে নিজেদের চেয়ে কোন অংশে বড় মনে না করে। নেতাজী তাদের জোর দিয়ে বললেন—তারা যে ভারতীয় এ কথা ভেবে তারা যেন গৌরব অনুভব করে—ভারতীয়েরা অন্যান্য দেশের কোন জাতির চেয়ে কম নয়।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানীরা যে আমাদের সাহায্য করছে—এর দ্বারা আমাদের কোন অনুগ্রহ করা হচ্ছে না। এতে তাদের নিজেদের স্বার্থ আছে। ব্রিটিশেরা যতদিন ভারতে থাকবে—ততদিন সেখান থেকে জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে—সুতরাং জাপানীরা পূর্ব্ব-এশিয়ায় নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যসুখ ভোগ করতে পারবে না,—এই জন্যই ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে সাহায্য করছে। এ ছাড়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে—সেখানে ব্যবসাবাণিজ্যে জিনিসপত্র আদান প্রদান করবারও অনেক সুবিধা হবে।

সে যাই হ’ক ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ব্যাপারে—ভারতীয়দের কারো উপর নির্ভর করা চলবে না—কাউকে বিশ্বাস করাও চলবে না—এমন কি তাদের মিত্রপক্ষ জাপানকেও না—তাদের একমাত্র ভরসা তাদের নিজেদের বাহুবল—আর ভারতবর্ষে একবার যদি তারা প্রবেশ করতে পারে তবে এই বল তাদের শতগুণ বেড়ে যাবে। নেতাজীর এ কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষে গিয়ে

যদি দেখা যায় জাপানীরা ভারতবর্ষের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে তখন তাদের উপরই ভারতীয়দের বন্দুক চালাতে হবে—ব্রিটিশদের সঙ্গে তারা যেমন ক'রে লড়্‌বে—ঠিক তেমনি করে লড়্‌তে হবে এদের সঙ্গেও।

আজাদ হিন্দ দলের সৈন্যেরা যে দেশের অধিবাসী সেখানকার লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে—অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হয় সেই কথা মনে করে সৈন্যদেরও সর্ব্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন করে বাঙ্গালার অধিবাসীদের মত নাম মাত্র আহার্য্য গ্রহণ করে লড়্‌তে হবে। নেতাজী তাদের বলেন—"ভারতীয় জনগণের পরিত্রাতা তোমরা, সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কোন দিন লুণ্ঠন বা নারীধর্ষণ না করে—কোন ভারতীয় বা জাপানীকে এরূপ কিছু কর্‌তে দেখলে তক্ষুণি তোমরা তাকে গুলি করে মারবে।" নেতাজী সৈন্যদের ভারতীয় নারীদের নিজের মা বোনের মত মনে করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

নেতাজী তাঁর দলের সৈন্যদের সঙ্গে প্রাণ খুলে বন্ধুর মত কথা বলতেন—সৈন্যেরা যুদ্ধের সময় তাঁরই প্রেরণায় প্রাণপণে লড়্‌ত। সৈন্যদের প্রত্যেককে তিনি বিশ্বাস করতেন, তারাও তাই তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা কর্‌ত, প্রাণ ভ'রে ভালবাসত। হাজার হাজার সৈন্য তাঁর কথায় অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে তিনি যে বক্তৃতা দেন—তাতে তিনি আজাদ হিন্দ দলেব উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ও সৈনিকদের বলেন যে তিনি হচ্ছেন ফকির—সৈনিকদের সাজিয়ে দেবার মত

বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন প্রভৃতি রণ-সরঞ্জাম তাঁর কিছু নেই, সৈন্যদের আরামে, বিলাসে রাখবার মত টাকা পয়সাও তাঁর নেই। তিনি বলেছেন—"দিল্লী অভিযানে আমি তোমাদের দিতে পারি—শুধু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কষ্টসাধ্য অগ্রগমন, অবশেষে হয়ত মৃত্যু···তোমরা দেশের জন্য রক্ত দাও, তবেই দিতে পারব আমি দেশের স্বাধীনতা।" সৈন্যেরা এককণ্ঠে উত্তর দিয়েছে—"নেতাজী, আমরা রক্ত দিলে যদি দেশ স্বাধীন হয় তবে সে রক্ত আমরা দেব, এত রক্ত দেব যে তাতে মণিপুরের সমতল-ভূমি প্লাবিত হয়ে যাবে।" ১৯৪৪ সালের এপ্রিল ও মে মাসে তারা তাদের সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে: আজাদ হিন্দের প্রায় ৪০০০ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সর্ব্বশ্রেণীর লোক একই উদ্দেশ্যে, একই অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজেদের দেহের শোণিতে মণিপুরের রণক্ষেত্রে রক্তগঙ্গার সৃষ্টি করেছে।

এইরূপই এক মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে—এইরূপ এক নেতার নেতৃত্বে সুভাষ, গান্ধী, আজাদ ও নেহরু ব্রিগেডের সৈন্যগণ গুপ্তচর বিভাগ ও বাহাদুর গ্রুপের লোকদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে দুর্জ্জয় ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের পূর্ণ-বিবৃতি এই গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হ'ল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্রহ্ম-অভিযান

সামরিক শিক্ষা শেষ ক'রে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রণসজ্জার খাঁক্‌তি কিছুটা পুরিয়ে নিয়ে ১নং (সুভাষ ব্রিগেড) রেজিমেণ্ট ১৯৪৩ সালের ৯ই নভেম্বর তাইপিং থেকে ট্রেণযোগে রেঙ্গুন যাত্রা করে। শেষ দল ২৪শে নভেম্বর তাইপিং থেকে যাত্রা করে।

যাত্রার দিন তাইপিং রেলওয়ে-ষ্টেশনে যে দৃশ্য দেখেছি সে দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। যে সব রুগ্ন অশক্ত সৈন্যদের ডাক্তার তাইপিং ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন, তারা ষ্টেশনে এসে গাড়ীর এঞ্জিনের সামনে শুয়ে পড়্‌ল, তাদের সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে তারা গাড়ি ছাড়্‌তে দেবে না। তারা বলতে লাগল—"আমরা নেতাজীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে দেশের কাজে আমরা জীবন দেবো, আমাদের এখানে ফেলে রেখে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে আমরা দেবো না"—তাদের যখন অনেক করে বুঝিয়ে বলা হ'ল—আশ্বাস দেওয়া হ'ল যে তারা সুস্থ হয়ে উঠ্‌লেই তাদের আবার রেজিমেণ্টে যোগদান করবার সুযোগ দেওয়া হবে, তখন তারা এই এঞ্জিনের সামনে থেকে উঠল।

রেজিমেণ্ট তাইপিং থেকে পেনাং হয়ে শ্যামের (থাই-ল্যাণ্ড) অন্তর্ব্বর্ত্তী ছুম্পনে যায় ট্রেণে। (২) ছুম্পন—কাওয়াশি (ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট) এই ৯০ মাইল পথ কোন কোন দল পায়ে হেঁটে, কোন কোন দল মটরলরীতে। (৩) ছুম্পন—মারগুই ষ্টীমার ও নৌকায় (৪) মারগুই—ত্যাভয়—য়ি—

বেশীর ভাগ পায়ে হেঁটে এবং (৫) অবশেষে য়ি—মৌলমেন—রেঙ্গুন ট্রেণে।

রেজিমেণ্টের অধিকাংশ সৈন্য ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে রেঙ্গুনে গিয়ে পৌঁছে।

তাইপিং থেকে রেঙ্গুনে যেতে সময় লাগে পাঁচ সপ্তাহ। এই পাঁচ সপ্তাহে সৈন্যদলের প্রায় ৪০০ মাইল পদব্রজে যেতে হয়। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় মাঝে মাঝে জাপানীদের সাথে দু'একবার ছোটখাটো সংঘর্ষ হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি, আর এ সংঘর্ষে কোন পক্ষ কোন অস্ত্র ব্যবহারও করেনি। শীঘ্র গিয়ে হাজির হবার উৎসাহে আমাদের সৈন্যদল দু'দিনে যত পথ হেঁটেছে—জাপানীদের সেই পথ হাঁটতে লাগে পাঁচদিন।

আমাদের সৈন্যেরা প্রায় এক এক মণ জিনিষ বহন ক'রে দিনে গড়ে প্রায় ২৫ মাইল করে হাঁটত। 'পর্ব্বণ' (Parwana), 'জঙ্গজু' (Jangju) নামে দুটি দল দিনে ৩৮ মাইল হাঁটত। এই দুইটি দলের নেতা ছিলেন—যথাক্রমে ক্যাপ্টেন অম্রিক সিং, সহিদ্-ই-ভারত ও ক্যাপ্টেন শাস্তা সিং।

পেগুর প্রায় বিশ মাইল পূর্ব্বে 'ওয়া' বলে একটা জায়গায় আমাদের ট্রেণ ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণে আমাদের বেশী কিছু ক্ষতি করতে পারে নি, আমাদের মাত্র একজন নিহত এবং দুইজন আহত হয়। এই একই ট্রেণে কিছু জাপানী সৈন্যও চলেছিল, তাদের আটজন নিহত এবং ছ'জন আহত হয়।

আমাদের দলের যে লোক মারা গেছে, তার নাম জিৎ সিং। গাড়োয়ালের অধিবাসী সে। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সহিদের উপযুক্ত সামরিক সম্মান দিয়ে ওয়ায় তার অগ্নিসংকার করা হয়।

রেঙ্গুনে অবস্থান

রেঙ্গুনে উপস্থিত হ'লে 'মিঙলাডোনের' সামরিক নিবাস-গুলিতে (Military Barracks) আমাদের থাকবার জায়গা করে দেওয়া হয়,—ইত্যবসরে ব্রিগেডকে রণাঙ্গনে পাঠানোর আয়োজন চলতে থাকে।

রেঙ্গুন-অবস্থানকালে আমাদের নানাদিক দিয়ে নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে, সেগুলি সংক্ষেপে বলতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

(১) যানবাহন : খাদ্যদ্রব্য, গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধ-সরঞ্জাম এবং আহত ও রুগ্ন সৈন্য এই সব বহন করবার জন্য মাত্র পাঁচটি লরী ছিল, অথচ তা মেরামত করবার জন্য কোন কারখানা ছিল না। লরীর কোন অংশ খারাপ হ'য়ে গেলে তা বদ্‌লাবার জন্য কোন নতুন অংশও পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে জাপানী ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর সাহায্য পাওয়া যেত বটে, কিন্তু সে সাহায্য খুব অপর্য্যাপ্ত। জাপানীদের কাছে বার বার আরও কিছু যানবাহন চেয়েও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। মালপত্র ব'য়ে নিয়ে যাবার মত কোন ভারবাহী পশুর ব্যবস্থাও ছিল না। ফলে সব

কিছুই সৈন্যদের বহন করতে হ'ত—গোলাবারুদ, ভারী মেসিনগান, ঔষধপত্র—সব।

(২) জামাকাপড় ইত্যাদি : আজাদ হিন্দ ফৌজের গরম জামাকাপড়েরও বিশেষ অভাব ছিল। ছিন পাহাড় (Chin Hill) ও কালাদন উপত্যকার যে জায়গায় তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—সেখানে শীতকালে ভয়ঙ্কর শীত, অথচ এই শীত থেকে আত্মরক্ষা করতে তাদের এক একটা তুলর কম্বল ও গরম সার্ট ছাড়া আর কিছু সম্বল ছিল না। বিশেষ চেষ্টা করেও বড় গরম কোট ও অন্যান্য গরম কাপড় সংগ্রহ হয় নি।

(৩) মশারি : বিগ্রেডকে 'কাবাওয়া ভ্যালি-গঙ্গা তামু' এবং কালাদন উপত্যকা প্রভৃতি জায়গায় থেকে যুদ্ধ করতে হবে। এই সব জায়গায় ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—অথচ সৈন্যদের জন্য মশারির তেমন ব্যবস্থা ছিল না।

(৪) জরুরী রসদ : আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য জরুরী রসদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রেঙ্গুনে আসবার পর নেতাজী সৈন্যদের জন্য 'শকরপরা বিস্কুট' নামে একরকম বিস্কুট তৈরী করিয়েছিলেন—এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র জরুরী খাদ্য।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী নেতাজী একখানা বিমানে করে রেঙ্গুনে এসে হাজির হ'ন এবং এইখানে তাঁর সম্মুখ-অভিযানের হেড্ কোয়ার্টার্স স্থাপন করেন। অতি অল্প সময়ের আয়োজনে আক্রমণ করতে যাওয়া হচ্ছে—সুতরাং

নেতাজী আমাদের যুদ্ধ-যাত্রার সব কিছু আয়োজনের তদ্‌বির নিজে কর্‌তে লাগলেন। তাঁব যা সাধ্য তা তিনি প্রাণপণে কর্‌লেন কিন্তু জাপানীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করা মানে তাঁর পাষাণে মাথা খোঁড়া। যা তাদের পক্ষে দেওয়া অতি সহজ ছিল—তাও তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। তারা কেবল মুখে বল্‌তে লাগ্‌ল—যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হ'লে তারা সব কিছু দেবে কিন্তু কার্য্যতঃ তাব কিছুই হ'ল না। যত শীঘ্র পারা যায় এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করাই হ'ল প্রধান লক্ষ্য। সৈন্যেরা নেতাজী এবং অফিসারদের বল্‌লে—গরম জামা-কাপড় আর যানবাহন সংগ্রহের চেষ্টায় ব'সে থেকে অনর্থক সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই,—তারা যত শীঘ্র পারে যুদ্ধে যেতে চায়;—সেখানে গিয়ে "চার্চ্চহিলের সরবরাহ" থেকে তারা তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগাড় ক'রে নিতে পারবে।

জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে বোঝাপড়া

এই সময়ে জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ কিরূপ সহযোগিতায় কাজ করবে—সেটা বোঝাপড়া করা নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়ে।

ব্রহ্মদেশের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ জেনারেল কাওয়াবি এর আগেই নেতাজীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেছেন—নেতাজী· ভদ্রতা রক্ষার জন্য এইবার পাল্টা দেখা করতে

গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। সেখানে জেনারেল কাওয়াবির সঙ্গে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজকে কি কাজে লাগান যায়—জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে কিরূপ সহযোগিতা ক'রে তারা লড়তে পারে—এই সব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। জেনারেল কাওয়াবি বললেন—নেতাজীর আদেশ পাওয়ামাত্র জাপানী সৈন্য শত্রুকে আক্রমণ করবে। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে বড় বড় জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়াই ছিল জেনারেল কাওয়াবির মত।

নেতাজী এ কথায় রাজী হ'লেন না—তিনি বললেন—এরূপ করলে 'সুভাষ ব্রিগেডে'র কোন অস্তিত্ব থাকে না। নেতাজী বিশেষ ক'রে বল্‌লেন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে এক একটি 'ব্যাটেলিয়ান'-এর চেয়ে ছোট দলে ভাগ করা কিছুতেই চল্‌তে পারে না,—তা' ছাড়া এর ইউনিটগুলির পরিচালনার ভার থাকবে—ভারতীয় অফিসারদেরই হাতে। জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ শেষ পর্য্যন্ত নেতাজীর কথাতেই রাজী হ'লেন। স্থির হ'ল নেতাজী এবং জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ দুই জনে মিলে আক্রমণের একটি পদ্ধতি ঠিক করবেন এবং সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ইউনিটগুলি কাজ ক'রে যাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি চিহ্নিত স্বতন্ত্র স্থানে থেকে যুদ্ধ ক'রবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনীকৃত স্থানগুলি আজাদ হিন্দের হাতে ছেড়ে দিতে হবে,—এই অংশগুলির গবর্ণর হবেন—

মেজর জেনারেল চ্যাটার্জ্জি। শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য যা-কিছু পাওয়া যায় সব তুলে দিতে হবে—সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের হাতে।

জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও এই দিন আলোচনা হয়। জেনারেল কাওয়াবি তাঁর পূর্ব্বের উক্তির পুনরুল্লেখ ক'রে বলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে মিত্রবাহিনী ব'লেই গণ্য করা হবে এবং জাপানী-বাহিনীর সম-মর্য্যাদাই তাকে দেওয়া হবে। অভিবাদন জানানোর সময়ও দুই দলের একই নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে :—যে কোন দলের নিম্নতন কর্ম্মচারী অপর দলের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে দেখলে—অভিবাদন জানাবে। সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অভিবাদনের রীতি কেমন হবে—অর্থাৎ কোন্ দলের লোক আগে অভিবাদন জানাবে —এই নিয়ে একটু মুস্কিল বাধে। জেনারেল কাওয়াবি বলেন—জাপানী সৈন্যদল অনেক আগেকার, আজাদ হিন্দ ফৌজ সবে গড়া হ'য়েছে—সুতরাং দুই দলের সমান মর্য্যাদার অফিসারের দেখা হ'লে—আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারকেই প্রথম অভিবাদন জানানো উচিত হবে। নেতাজী এতে ঘোরতর আপত্তি ক'রে বলেন—"এ কখনও হ'তে পারে না—এতে জাতিগত মর্য্যাদায় ভারতীয়দের ছোট করা হয়।" নেতাজী প্রস্তাব করেন—দুই দলের সমপদস্থ দুই ব্যক্তির দেখা হ'লে—তাঁরা দুইজনই এক

সঙ্গে দুইজনকে অভিবাদন করবেন। জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্‌কে নেতাজীর প্রস্তাব মেনে নিতে হয়।

এর পর আলোচনা হয়—আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন 'জাপানী জেনারেল হেড্ কোয়ার্টার্সের নির্দ্দেশে যুদ্ধ করবে তখন তাদের জাপানী সামরিক আইন-কানুন মেনে চল্‌তে হবে কিনা। জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ এ সম্পর্কে বলেন—অন্যান্য মিত্রবাহিনী, যথা—মাঞ্চুরিয়ার বাহিনী, নানকিং বাহিনী, ব্রহ্মদেশীয় বাহিনী যখন এই আইন-কানুনই মেনে চলেছে তখন আজাদ হিন্দ ফৌজেরও তা মেনে চলাই উচিত। এটা মানতে গেলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, জাপানী মিলিটারী পুলিশ দরকার হ'লে নেতাজীর অনুমতি না নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সৈন্য বা অফিসারকে গ্রেফ্‌তার কর্‌তে পার্‌বে। সুতরাং নেতাজী জেনারেল কাওয়াবির এ প্রস্তাবেও রাজী হলেন না। তিনি জেনারেলকে জানালেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের নিজস্ব সামরিক আইন-কানুন আছে—সুতরাং ফৌজের শাসন বা নিয়ম-শৃঙ্খলা রাখার ব্যাপারে তিনি জাপানীদের হস্তক্ষেপ করতে দিতে রাজী ন'ন। জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্ এতে একটু বিচলিত হ'য়ে বললেন—এ ব্যাপারে তাঁর নিজের 'হাঁ' বা 'না' বলবার কোন অধিকার নেই,—তিনি টোকিওতে কর্ত্তৃপক্ষকে এ কথা জানাবেন,—কিন্তু তাঁর যতদূর মনে হয় তাঁরা এমন কথায় রাজী হবেন না। নেতাজী জানালেন—সে যাই হ'ক এই তাঁর নৈতিক আদর্শ এবং জাপানীদের কথায় তিনি তাঁর আদর্শ ত্যাগ করতে

পারবেন না। পরে অবশ্য টোকিও গবর্ণমেণ্টকে নেতাজীর কথাতেই রাজী হ'তে হয়েছিল।

নেতাজী শেষে জেনারেল কাওয়াবিকে বুঝিয়ে বলেন—যে যুদ্ধের কথা নিয়ে তাঁদের আলোচনা হচ্ছে—একে পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ এবং তিনি নিজে প্রধানতঃ ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ব'লে মনে করেন, সুতরাং ভারতীয়েরাই এতে প্রাণপণে লড়্‌বে, জীবন দেবে,—তা'তে হবে ভারতের গৌরব। নেতাজীর ইচ্ছা—আজাদ হিন্দ ফৌজই আক্রমণকারী সৈন্য-বাহিনীর অগ্রণী হ'য়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ কর্‌বে এবং ভারতের পবিত্র ভূমিতে প্রথম রক্ত-বিন্দু পাত আজাদ হিন্দ সৈন্যই কর্‌বে। নেতাজী জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্‌কে আরও জানান—তিনি (নেতাজী) তাঁর দেশবাসীকে ব'লে রেখেছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ-অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত কর্‌তে চলেছে এবং তাঁর কঠোর আদেশ—তারা সেখানে গিয়ে কোন লুণ্ঠন বা নারীধর্ষণ কর্‌বে না। জাপানী কম্যাণ্ডাব-ইন-চীফ্‌ নেতাজীর কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি ক'রে বলেন—তিনিও জাপানী সৈন্যদের অনুরূপ আদেশ দেবেন। নেতাজী জেনারেল কাওয়াবিকে ব'লে রাখেন যে ভারতভূমিতে ভারতের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা ভিন্ন অন্য পতাকা উড়ান চল্‌বে না। আলোচনার উপসংহারে জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্‌ নেতাজীকে জানান—জাপানীরা ব্রহ্মদেশের আজাদ হিন্দ ফৌজকে রসদ ও ঔষধ সরবরাহ এবং আহতদের অপসারণ ইত্যাদি ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য কর্‌বে।

দুই সৈন্যবাহিনীর পরস্পরের সহযোগিতা সম্বন্ধে সকল প্রকার বোঝাপড়া শেষ ক'রে নেতাজী তাঁর নিজের হেড-কোয়ার্টার্সে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের জন্য সর্ব্বপ্রকার জিনিষপত্রের ব্যবস্থা কর্‌তে মনোনিবেশ করেন। তিনি দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে ফৌজ এবং পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী অসামরিক ভারতীয়দের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মদেশের বহু ভারতীয় তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টকে দান করেন,—এঁদের মধ্যে মিঃ হাবিব বেতাই ও মিঃ খান্নার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই স্বদেশপ্রেমিক কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান ক'রে একেবারে ফকির সাজ্‌লেন। প্রতিদানে তাঁরা শুধু চেয়েছেন তাঁদের "সেবক-ই-হিন্দ" (হিন্দুস্থানের সেবক) খেতাব দেওয়া হ'ক্ এবং এই পুরস্কারই তাঁরা পেয়েছেন।

আজাদ হিন্দ দলের লোকদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখ্‌বার জন্য নেতাজীর চেষ্টার বিরাম ছিল না। সৈন্যদের আহার, বাসস্থান, হাসপাতালের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিজের চোখে দেখে বেড়াতেন—তাদের সামরিক শিক্ষা কেমন হ'চ্ছে তা প্রায়ই পরিদর্শন কর্‌তে আস্‌তেন। ইতিমধ্যে সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট ও ফৌজের সুপ্রীম হেড কোয়ার্টার্স তিনি ব্রহ্মদেশে স্থানান্তরিত কর্‌তে আদেশ দেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা

১৯৪৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী ব্রহ্মদেশস্থ জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের জেনারেল ষ্টাফের প্রধান কর্ম্মচারী জেনারেল কাতাকুর নেতাজীর সঙ্গে দেখা করেন ও ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর আক্রমণে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কি কৌশলে লড়্তে হবে তা বিস্তৃত ভাবে নেতাজীকে জানান। সবার অলক্ষ্যে অতি গোপনে একটি রুদ্ধ কক্ষে এই সব কথা হয়। সে ঘরে মাত্র তিনটি প্রাণী উপস্থিত,—নেতাজী, আমি এবং জেনারেল কাতাকুর। এই কথোপকথনের সময় নেতাজীর যুদ্ধবিদ্যায় পাণ্ডিত্য দেখে আমরা দু'জন মুগ্ধ হই। নেতাজী নিজে এমন কতকগুলি অভিনব প্রস্তাব দেন যা জেনারেল কাতাকুর গ্রহণ না ক'রে পার্লেন না। অবশেষে নেতাজীর প্রস্তাবে জাপানী হেড্-কোয়ার্টার্স'ও সম্মতি দিয়েছিলেন। এই দিনের কথোপ-কথনের সময়ই জেনারেল কাতাকুর প্রকাশ করেন—জাপানীরা ঠিক করেছে—স্থলপথে সৈন্য প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা কলকাতায় ভীষণভাবে বিমান আক্রমণ চালাবে। নেতাজী এর ঘোরতর প্রতিবাদ ক'রে বলেন—এ হ'তে পারে না, ভারতীয় অসামরিক জনগণের উপর এমন অকারণে বোমা ফেল্লে তাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাক্‌বে না, তা ছাড়া তারা আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে এবং নেতাজীর উপর বিশ্বাস হারাবে। জেনারেল কাতাকুর নেতাজীর কথাই মেনে নিলেন।

জাপানীদের সংশোধিত প্রস্তাব নেতাজী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অনুমোদিত হবার পর ১নং রেজিমেণ্ট (সুভাষ বিগ্রেড) যুদ্ধার্থে ব্রহ্মদেশস্থ 'মোরি বুটাই' নামক 'জাপানীজ জেনারেল হেড্ কোয়ার্টার্স'এর নেতৃত্বাধীনে রাখা হ'ল।

১৯৪৪ সালের ২৭শে জানুয়ারী আমি জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে দেখা করলে, তিনি আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার আদেশ দিলেন। তিনি আমায় বলে দিলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে আমার দলই (সুভাষ বিগ্রেড) প্রথম যাত্রা কর্‌ছে, এদের কর্ম্মতৎপরতা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হবে। জাপানী সৈন্যদলের মত কষ্ট সহ্য ক'রে এরা যদি ভাল লড়াই করতে পারে তবেই আজাদ হিন্দের অন্যান্য দলকে যুদ্ধে নামান হবে। মোট কথা, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধক্ষমতা বেশ ভাল ক'রে পরখ ক'রে নিতে চান। আমি তাঁকে জানাই, আমরা সব কিছুতেই প্রস্তুত। এর পর তিনি ১নং গেরিলা রেজিমেণ্টের (সুভাষ বিগ্রেড) কোথায় কি কর্‌তে হবে বিস্তার ক'রে বললেন। তিনি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললেন, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্য কোথায় কত সংখ্যক আছে এবং সীমান্তে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যাই বা মোট কত হবে। তিনি আরও বললেন—ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সৈন্যদলকে প্রধানতঃ সাদিয়া-ইম্ফল-তামু ও তিদ্দিমে জমায়েত করা হ'য়েছে। এখানে থেকে তারা ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করবার আয়োজন কর্‌ছে। জাপানী ব্যূহের বাম দিকে আক্রমণ কর্‌বে ব'লে

দুইদল শক্তিশালী বৃটিশ সৈন্য আইজল এবং লাংলে-তে অবস্থান কর্‌ছে। কালেওয়ার দিকে অগ্রসর হ'য়ে জাপানী সৈন্যদলের সরবরাহের পথ রোধ কর্‌বে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। সুতরাং তিদ্দিম-তামু ও ইম্ফল থেকে ওদের বিতাড়িত করাই এখন আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

১নং ব্রিগ্রেডের কর্ম্মসূচী এই ভাবে ধার্য্য করা হয়েছিল :—

(ক) ১নং ব্যাটেলিয়ান-মেজর পি, এস্, রাতুরির নেতৃত্বে প্রোম-তাউনগুপ-মাইও-হাউং-কাউকট-প্যালেটোয়া হ'য়ে কালাদন উপত্যকার দিকে যাত্রা করবে। এখানে ব্রিটিশেরা তাদের বহু প্রশংসিত পশ্চিম আফ্রিকার সৈন্যদল আমদানী করেছে।

(খ) ২ ও ৩নং ব্যাটেলিয়ান তাদের নিজ নিজ নেতা মেজর রণ সিং ও মেজর পদম সিং-এর নেতৃত্বে মান্দালয়-কালেওয়ার পথে হাকা ও ছিন পাহাড় এলেকার ফালামের দিকে যাবে। এ সবেরই পরিচালনা-ভার আমার উপর।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপন সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত নির্দ্দেশ দেবেন উত্তর ব্রহ্মের জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ। কয়েকজন ক'রে জাপানী অফিসার ও 'নন্-কমিশানড্' অফিসার প্রত্যেক আজাদ হিন্দ ব্যাটেলিয়ানের সঙ্গে থাকবেন—এঁরা জাপানী হেড্ কোয়ার্টার্স ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মাঝে 'লিয়াজং' অফিসারের কাজ কর্‌বেন। এঁদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল জাপানী হেড

কোয়ার্টার্সের সঙ্গে নিকটবর্ত্তী ইউনিটগুলির যোগাযোগ রক্ষা করা,—একের ভাষা অন্যকে তর্জ্জমা করে বুঝানো,—জাপানী সরবরাহ কেন্দ্র থেকে খাদ্যদ্রব্য, যানবাহন, ঔষধ-পত্রাদির বিলি-ব্যবস্থা করা।

১৯৪৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী নেতাজী এই রেজিমেণ্টকে বিদায় দিতে এসে এক বক্তৃতা দেন। পূর্ব্ব-এশিয়ায় নেতাজী এমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা বুঝি আর দেন নাই।

তিন হাজার সৈন্য তাদের সব জিনিষ-পত্র নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দেড় ঘণ্টাকাল অ্যাটেন্‌শান অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেতাজীর বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা কান পেতে শোনে। নেতাজী তাদের লক্ষ্য করে বলেন,—"তোমরাই আমার বাহুবল এবং এই বলেই আমি আমাদের অধিকার রক্ষা করব,—তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যা ক'রবে তারই উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছে। সৈন্যদের তিনি সাবধান করে দিয়ে বললেন,—তারাই যখন প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে তখন জাপানীরা তাদের উপর নানা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজের ভার দিয়ে যাচাই করে নিতে চাইবে—এই কষ্ট যদি কেউ বরণ করে নিতে না চায়—সে বরং যুদ্ধে না গিয়ে পিছনেই থাকুক। সৈন্যেরা নেতাজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বল্‌লে—তারা যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ক'রে ভারতবর্ষের নাম কখনও কলঙ্কিত ক'রবে না।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১নং ব্যাটেলিয়ান প্রোমের

দিকে এবং ২ ও ৩নং ব্যাটেলিয়ান মান্দালয়ের দিকে ট্রেন-যোগে যাত্রা করলে।

১নং গেরিলা বাহিনী যুদ্ধে যাবার আগেই অনেকগুলি আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক সেখানে গিয়েছিল। এরা সব বাহাদুর ও গুপ্তচর দলের লোক। এই দুই দল থেকে আট-দশ জন করে লোক নিয়ে এক একটা ছোট ছোট দল করা হয়েছিল,—ঐ ছোট ছোট দলের প্রত্যেকটি আবার এক একটি জাপানী সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। এরা নানা জায়গা থেকে সংবাদ এনে দিত, যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিত এবং লাউড স্পীকার, পুস্তিকা ও মুদ্রিত পত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাত।

এই ছোট ছোট দলগুলিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রাখা হয়েছিল, বিভাগগুলি এইরূপ—

(ক) আরাকান সেক্টর—নেতৃত্ব নিয়েছিলেন শহীদ কর্ণেল মিশ্র সর্দ্দার-ই-জং ও মেজর মেহর দাস সর্দ্দার-ই-জং।

(খ) বিষাণপুর সেক্টর—কর্ণেল এস্, এ, মালিক সর্দ্দার-ই-জঙের নেতৃত্বাধীনে।

(গ) কোহিমা সেক্টর,—নেতৃত্ব শহীদ মেজর মঘর সিং ও শহীদ মেজর আজমীর সিং-এর।

পরে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে এই সব দলের লোকগুলি প্রাণ-পণে লড়েছে—তা' ছাড়া গোপন তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিজেদের

পক্ষের অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাউণ্ড-বুথিয়াডঙে ব্রিটিশের ৭ম ডিভিসানকে চারিদিকে ঘিরে যে নিশ্চিহ্ন-প্রায় করা হয়—তার মূলে রয়েছে কর্ণেল এল্, এস্, মিশ্র ও মেজর মেহর দাসের অধীনস্থ এইরূপ একটি ছোট দলেরই কর্ম্মতৎপরতা। এই সেক্টরের লেফ্‌ট, হরি সিং একা সাতটি ব্রিটিশ সৈন্যকে নিহত ক'রে শের-ই-হিন্দ পদক লাভ করেন। মর্য্যাদায় এ পদক ওদের ভিক্টোরিয়া ক্রসেরই সমান। বিষাণপুর সেক্টরের গ্রুপ কম্যাণ্ডার কর্ণেল এস্, এ, মালিকও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন, তিনি এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে সেখান থেকে ইম্ফল মাত্র দুই মাইল। কর্ণেল মালিক মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনীকৃত অংশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কোহিমা সেক্টরে মেজর মঘর সিং-এর দলগুলিও খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। এদের ভিতরে শহীদ ক্যাপ্টেন গুরবচন সিং, শহীদ লেফ্‌ট, সোহনলাল, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হোসেন এবং লেফ্‌ট, আসিফের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুভাষ ব্রিগেডের ১নং ব্যাটেলিয়ানের কর্ম্মতৎপরতা

যাত্রার আদেশ পাওয়ার পর ব্যাটেলিয়ানের অগ্রবর্ত্তী দল ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন থেকে ট্রেনে প্রোম যাত্রা করে। ইউনিটের প্রধান দল রওনা হয় ৫ই ও ৬ই তারিখে—মেজর পি, এস্, রাতুরির নেতৃত্বাধীনে। পথে রেলওয়ে লাইন ও ব্রিজ শত্রুদের বিমান আক্রমণে অনেক

কালাডান উপত্যকার যুদ্ধ
(এপ্রিল-জুন ১৯৪৪ সালে)
বিভিন্ন শক্তির সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি
সাত কানিয়া
আধুনগব
হাববাং
লামু
ইদ্‌গাঁও
কক্স বাজার
রামু
ব্র হ্ম দে শ
ওক্রি
পালে-ওয়া
কালাডান্
মাঁউউ
ব ঙ্গো প
সা গ র
সংকেত
আই.এন.এ.
ব্রিটিশ
জাপান.
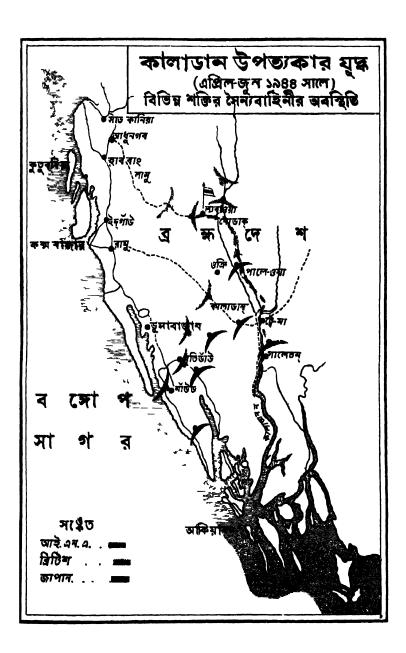
জায়গায় বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল,—তা সত্ত্বেও এদের প্রোমে পৌঁছতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি। প্রোম থেকে তাউন-গুপ প্রায় একশ' মাইল পথ, এই একশ' মাইল তারা পায়ে হেঁটে যায়,—ভারী মালপত্র সব যায় জাপানী লরীতে। এর পর তাউন-গুপ থেকে মিও হাউং প্রায় দেড়শ' মাইল,—এ দেড়শ' মাইলও তারা পদব্রজে গিয়েছে,—মালপত্র গিয়েছে নদীপথে নৌকায়।

তাউন-গুপে থাকবার সময়—শত্রুবিমান থেকে আমাদের শিবিরের উপর ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ হয়—এতে আমাদের ষোলটি লোক মারা যায়। যে সব নৌকায় আমাদের জিনিষপত্র আস্‌ছিল তার কতকগুলি শত্রুপক্ষীয় জঙ্গী বিমান থেকে মেসিনগান চালানোর ফলে ডুবে যায়। ব্যাটেলিয়ান অনেক বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে অবশেষে ১৯৪৪এর মার্চ্চের মাঝামাঝি কিয়াকটয়ে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে।

কয়েকদিন পরে খবর পাওয়া গেল পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রো সৈন্যদের একটা পুরো ডিভিশান কালাদন নদের পূর্ব্বতীর দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। আস্‌বার সময় তারা একটা রাস্তা তৈরী ক'রতে ক'রতে আস্‌ছে। কালাদনের পূর্ব্ব তীরের সমান্তরালে যে রাস্তা গিয়েছে—তার সাথে সংযোগ স্থাপন ক'রবার জন্যে ওর পশ্চিম তীর থেকেও আর একটা রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে।

এই জায়গাটার নাম হচ্ছে তেতমা। পশ্চিম-আফ্রিকা-

বাসী নিগ্রো সৈন্যদল এইখানে কালাদন নদের উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করে'—দুই রাস্তার সংযোগ স্থাপনে প্রবৃত্ত ছিল। মেজর রাতুরির উপর ভার পড়্‌ল—তিনি দেখ্‌বেন—কালাদনের পশ্চিম তীর থেকে নিগ্রো সৈন্যদল পূর্ব্ব তীরে এসে যেন ঘাঁটি করে না বসে।

মেজর পি, এস্, রাতুরি তিন দলে প্রায় তিনশ' সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন—কিন্তু তিনি তেতমা পৌঁছবার আগেই শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য সেতু পার হ'য়ে কালাদনের পূর্ব্ব তীরের পাহাড়গুলিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। মেজর রাতুরি অবিলম্বে তাদের আক্রমণ করা সাব্যস্ত ক'রলেন। তদনুসারে কৌশলে বাঁশ বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে উত্তর ও দক্ষিণ তেতমা—দু'টি গ্রামেই সমস্ত শত্রু সৈন্যের বিনাশ-সাধন করলেন। এই দু'টি গ্রাম অধিকার করবার পর তিনি কালাদনের উজানে যাত্রা করবার উদ্যোগ করলেন। তাঁর স্কাউটেরা খবর এনে দিলে প্রায় পুরো এক ব্যাটেলিয়ানের মত শত্রুসৈন্য একটা উঁচু পাহাড়ে পরিখা খনন করে দৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করবার আয়োজন কর্‌ছে। এ কথা শুনে তিনি তাদের রাত্রে আক্রমণ করা সাব্যস্ত করলেন। যথাসময়ে তিনি দুইদল ক্ষিপ্র সৈন্য নিয়ে গুঁড়ি মেরে শত্রু ঘাঁটির কাছাকাছি গিয়ে হাজির হ'লেন। তিনি ইঙ্গিত দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্যেরা সঙ্গিন উঁচিয়ে পরিখার মাঝে লাফিয়ে পড়্‌ল। সেখানে শত্রুদলের সঙ্গে তাদের ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ হ'ল। আমাদের সৈন্যেরা মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে—"ভারত

মাতা কি জয়”, “নেতাজী কি জয়”। নিজের জায়গা থেকে তারা এক পা পিছচ্ছে না। কিছুক্ষণ যুদ্ধ ক’রবার পর শত্রুদল যখন বুঝ্‌লে বিপক্ষদল তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী তখন তারা হঠাৎ ভড়্‌কে গিয়ে নদীর দিকে ছুট্‌ল। সেখানে তা’দের নৌকা বাঁধা আছে—সেই নৌকায় চ’ড়ে তারা পশ্চিম তীরে তা’দের প্রধান দল যেখানে বড় বড় কামান নিয়ে অবস্থান ক’রছে, সেইখানে গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা অত সহজে তা’দের ছেড়ে দিলে না—এরা ওদের পিছু পিছু ধাওয়া ক’রে তীর থেকে মেসিনগান চালিয়ে ওদের অন্ততঃ ১৬ খানা নৌকা ডুবিয়ে দিলে। শত্রুপক্ষ নদীর পশ্চিম তীর থেকে বড় বড় কামান ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের দলের সৈন্যদের ছিল কেবল রাইফেল আর হাত বোমা, সুতরাং পাল্টা আক্রমণ চালাবার তেমন সুযোগ পেল না তারা—ফলে আমাদের ১৪টি সৈন্য গেল মারা আর ২২টি হ’ল আহত। সকাল বেলা দেখা গেল—শত্রুদের সবাই পূর্ব্ব তীর থেকে পশ্চিম তীরে বিতাড়িত হ’য়েছে। হিসাব ক’রে দেখা গেল ওদের প্রায় ২৫০ জন লোক মারা গেছে, তা’ ছাড়া ফেলে গেছে বন্দুক, কামান, গোলাগুলি ও সুস্বাদু খাবার। ভালই হ’ল—ভাল খাবার আমাদের সৈন্যরা অনেকদিন খেতে পায় নি। শত্রুপক্ষের মৃত সৈনিকদের কাছ থেকেও অনেক কিছু অস্ত্র পাওয়া গেল।

এর মধ্যে আরও জাপানী সৈন্য এসে মিশ্‌লো আমাদের দলে। আমরা কালাদনের দুই তীর দিয়ে এগিয়ে যেতে

লাগ্‌লাম। প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে পালেটোয়া ব'লে একটা জায়গায় ভীষণ যুদ্ধ হ'ল—যুদ্ধে আমরাই জয়লাভ ক'রলাম। পালেটোয়া আমাদের অধিকারে এল, কিছুদিন পরে দালেৎমি-ও আমরা অধিকার ক'রে নিলাম।

সৈন্যদল পুনর্গঠন ক'রবার জন্য কয়েকদিন বিশ্রাম ক'রবার পর আমাদের সৈন্যদল আবার এগিয়ে চল্‌ল। দালেৎমি থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে ভারত-সীমান্ত দেখা যাচ্ছিল—সেখানে গিয়ে জাতীয় পতাকা ওড়াতে আমাদের সৈন্যদল ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তারা প্রায়ই তা'দের অফিসারদের কাছে এসে বল্‌ত,—"সাহেব, আমাদের নেতাজীর আদেশ—যতশীঘ্র পারি ভারতভূমিতে গিয়ে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়াতে হবে, সুতরাং বিশ্রাম না ক'রে আমরা শুধু এগিয়ে যেতে চাই।"

যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখন ১৯৪৪ সালের মে মাস সবে প'ড়েছে। ভারতবর্ষের দিকে ব্রিটিশদের সব চেয়ে কাছের ঘাঁটি হচ্ছে—মোডক। মেজর রাতুরি যথা-সত্বর এই ঘাঁটি আক্রমণ করা সাব্যস্ত ক'রলেন। অবিরত পশ্চাদপসরণ আর বাধা-বিপত্তির ফলে শত্রুসৈন্যদের মনের বল নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল—এদিকে আমাদের সৈন্যরা নবোৎসাহে উদ্দীপ্ত। সুতরাং শত্রুদলকে তারা বিপর্য্যস্ত ক'রে ছাড়্‌ল।

একদিন রাত্রিতে আমাদের সৈন্যদল মোডক ঘাঁটিতে বিদ্যুদ্বেগে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। শত্রুদল অকস্মাৎ এমনি ভাবে

আক্রান্ত হ'য়ে তা'দের যথাসর্ব্বস্ব ফেলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে পালাতে আরম্ভ ক'রলে। ওরা ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার পর সেখানে আমাদের অনেক আটা, ঘি, চিনি প্রভৃতি খাবার জিনিস এবং ৩ ইঞ্চি কামান, অনেকগুলি বন্দুক, গোলা-বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ লাভ হ'ল। কামান পেয়ে আমাদের খুব সুবিধা হ'ল—কারণ এই জিনিসের আমাদের বড় অভাব ছিল।

ভারতভূমিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যেদিন প্রথম প্রবেশ ক'রলে সেদিন সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সৈন্যরা মাটিতে উপুড় হ'য়ে পড়ে উন্মাদের মত মাতৃভূমির পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন ক'রতে লাগ্‌ল : এরই উদ্ধার-সাধনে তারা জীবনপণে যুদ্ধে নেমেছে। এর পর মহাসমারোহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। এই উপলক্ষে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হ'য়েছিল তাহা এই :—

সব সুখ চায়েন কী বর্‌খা বরষে, ভারত ভাগ হ্যায় জাগা
পঞ্জাব, সিন্ধ্‌, গুজরাট্, মারাঠা, দ্রবিড়, উৎকল, বংগা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্‌ হিমালা, নীলা যমুনা গংগা
তেরে নিত্‌ গুণ গাঁয়েঁ, তুঝ্‌ সে জীওন পাঁয়েঁ
সব তন্ পাঁয়েঁ আশা
সূরয্‌ বন্ কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো ; জয়, জয়, জয়, জয় হো,
ভারত নাম সুভাগা।

সব কে দিলমে প্রীতি বসে, তেরী মিঠি বাণী,
হর স্থবে কে রহনে ওআলে, হর মজহব কে প্রাণী,
সব ভেদ ঔর ফার্‌ক্ মিট কে, সব গোদমেঁ তেরী আয়কে
গুন্‌ধে প্রেম কী মালা
সূরয্ বন্ কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম স্থভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো ; জয়, জয়, জয়, জয় হো,
ভারত নাম স্থভাগা।

স্থবা সবেরে পাংখা পাখেরু তেরেহি নিত্ গুণ গাঁয়েঁ
বাস ভরী ভরপূর হাওয়েঁ, জীওন মেঁ রুং লাঁয়েঁ
সব মিল কর হিন্দ পুকারে, জয় আজাদ হিন্দ কি নারে,
পিয়ারে দেশ হামারে
সূরয্ বন্ কর জগ পর চমকেঁ, ভারত নাম স্থভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো ; জয়, জয়, জয়, জয় হো,
ভারত নাম স্থভাগা।

মোডক অধিকারের পর তার চারিদিকে আমাদের অনেকগুলি ঘাঁটি স্থাপন করা হ'য়েছিল। খাদ্য সরবরাহ নিয়ে এই সময় আমাদের বড় অস্থবিধা ভোগ ক'রতে হয়। আমাদের যাবতীয় আহার্য্য প্যালেটোয়া সরবরাহ-কেন্দ্র থেকে নৌকা-যোগে আনা হ'ত—অথচ তার উপর শত্রুবিমান দিবারাত্র হানা দিয়ে ফির্‌ছে।

এই সব কারণেও বটে—আবার মাউংদ বুথিডায়াং-এর ওদিক থেকে ব্রিটিশদের পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা আছে,

কতকটা সে কারণেও বটে—মোডকের জাপানী কম্যাণ্ডার তাঁর সৈন্যদল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত ক'রলেন—সঙ্গে সঙ্গে মেজর রাতুরিকেও তিনি সেই উপদেশ দিলেন। মেজর রাতুরি তাঁর অফিসারদের নিয়ে এক সভা ক'রে তাঁ'দের কাছে সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্‌লেন—তাঁ'দের ডান, বাঁ দু'দিক্ থেকে জাপানীরা তা'দের সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এখন আজাদ হিন্দ ফৌজের কি করা সমীচীন? অফিসারেরা এক বাক্যে মেজর রাতুরিকে বল্‌লেন, "জাপানীরা তা'দের সৈন্য নিয়ে যেতে চায় যা'ক, আমরাযাবনা—আমরা হুকুম পেয়েছি দিল্লী যেতে—দিল্লী আমাদের সম্মুখে, আমরা ফিরে যাব না। ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উড়িয়েছি—শত্রুদেরও যেখানে পেয়েছি সেইখানেই পরাজিত করেছি। সেই শত্রুদের সম্মুখ থেকে জাতীয় পতাকা তুলে নিয়ে আমরা কি ক'রে পশ্চাদপসরণ ক'র্‌ব? না স্যার, এ হ'তে পারে না। জাপানীরা পশ্চাদপসরণ ক'র্‌তে পারে—কারণ তা'দের টোকিও পড়ে সেইদিকে—কিন্তু আমাদের দিল্লীর লালকেল্লা পড়ে সম্মুখে। আমরা সেইদিকেই যাব, ফেরা আমাদের হবে না।"

মজুদ রসদ ও যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা ক'রে রাতুরি মোডকে জাতীয় পতাকা পাহারা দেবার জন্য ক্যাপ্টেন সূরজমলের নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য রেখে অবশিষ্ট সৈন্যদলকে সরবরাহ কেন্দ্রের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত ক'রলেন। যে সৈন্যদল মোডকে রইল তা'দের

অবস্থা একেবারে সঙ্কটজনক : মৃত্যুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি বল্‌লেই হয়। তা'দের সম্মুখে ব্রিটিশেরা তা'দের সৈন্যদলকে ক্রমশঃই শক্তিশালী ক'রে তুল্‌ছে-- যে কোন মুহূর্ত্তেই তারা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের কিছুটা অংশ অধিকার ক'রেছে, এ অংশ তারা ছেড়ে যাবে না—এই তা'দের প্রতিজ্ঞা। জাপানীরা ভারতীয়দের সাহসে মুগ্ধ হ'য়ে তা'দের এক 'প্লেটুন' সৈন্য এদের কাছেই রেখে গেল : আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাগ্যে যা ঘটে তা'দেরও তাই ঘট্‌বে। জাপানী সৈন্যদল ক্যাপ্টেন সূরজমলের নেতৃত্বাধীনেই রইল। জাপানী সৈন্য বিদেশী অফিসারের অধীনে রাখা—জাপানী ইতিহাসে এই প্রথম।

মেজর রাতুরি ও ক্যাপ্টেন সূরজমল এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ তা'দের সাহস এবং আত্মত্যাগের দ্বারা জাপানীদের দেখিয়ে দিয়েছিল যে স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ভারতীয়ের বীরত্ব অন্যান্য দেশের সৈনিকদের চেয়ে বেশী বৈ কম নয়। জাপানীরা আগে বিশ্বাস ক'রতে পারে নি যে ভারতীয়েরা এত কষ্ট সহ্য ক'রে লড়াই ক'রতে পার্‌বে। কিন্তু এখন তারা এদের বীরত্ব আর কষ্টসহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হ'য়ে তা'দের নিজেদের একদল সৈন্যই ভারতীয় অফিসারের নেতৃত্বাধীনে স্বেচ্ছায় রেখে গেল। ব্রহ্মদেশের জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ্ নেতাজীর কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে বল্‌লেন,—"আমাদেরই ভুল হ'য়েছিল, আপনার আজাদ হিন্দ ফৌজকে আগে আমরা চিন্‌তে পারি

নি—এখন বুঝ্ছি এরা সত্যিই দেশকে ভালবেসে যুদ্ধে নেমেছে, টাকা পয়সার লোভে বা পেটের দায়ে নয়।”

ক্যাপ্টেন সুরজমল তাঁর সাহসী ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে ১৯৪৪ সালের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোডকেই থেকে যান। এই সময় প্রায় প্রত্যহই ব্রিটিশেরা তা'দের আক্রমণ ক'রত কিন্তু কোন অবস্থাতেই তারা কোনদিন এক পা পিছিয়ে আসে নি। আমাদের সৈন্যরা কি রকম ভাবে যুদ্ধ ক'রত তার একটা দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল :—

লালারুয়াতে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ছোট ঘাঁটি ছিল, এখানে ২য় লেফ্ট, অমরসিং-এর নেতৃত্বে মাত্র ২০ জন সৈন্য রাখা হ'য়েছিল। একদিন সকালে প্রায় ৮টার সময় অনুমান ১৫০ ব্রিটিশ সৈন্য অনেক কামান নিয়ে এই ঘাঁটি আক্রমণ করলে। ধূঁয়ার আস্তরণ সৃষ্টি ক'রবার মত সরঞ্জামও এদের ছিল।

আমাদের সৈন্যদের ছিল কেবল মেসিনগান আর রাইফেল, তা' ছাড়া ছুঁড়্বার গোলাগুলিও অত্যন্ত কম। এরা প্রথমে একটিও গুলি না ছুঁড়ে একেবারেই চুপ ক'রে রইল, তারপর শত্রুদল অনেকটা কাছে এসে গেলে অকস্মাৎ তা'দের উপর ভীষণ ভাবে গুলিবর্ষণ সুরু ক'রে দিলে—ফলে শত্রুদলের অনেকে মারা পড়্ল, বাকী সব ভয়ে পালিয়ে গেল। দুপুরের কাছাকাছি তারা আবার আক্রমণ ক'র্লে। প্রথম আমাদের ঘাঁটির উপর ধূঁয়ার আস্তরণ সৃষ্টি ক'রে শেষে ভীষণ ভাবে কামানের গোলা ছুঁড়্তে লাগ্ল।

এবারেও আমাদের সেই অল্প কয়েকজন সৈন্য অতি ধীর ও শান্তভাবে তা'দের যথাকর্ত্তব্য ক'রলে—শক্রদের কয়েকজন মারা পড়্‌ল, বাকী সব এবারেও পালিয়ে গেল। বুঝা গেল, সেদিন শত্রুদল আমাদের ঘাঁটি অধিকার ক'রবে ব'লে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এসেছিল; আমাদের সৈন্যদেরও এদিকে দৃঢ় সঙ্কল্প—ঘাঁটি তারা কিছুতেই অধিকার ক'রতে দেবে না। আমাদের দলের প্রত্যেকেরই পণ—তা'দের জান যায় যাক্ তবু ঘাঁটি থেকে তারা কিছুতেই ন'ড়বে না। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় শত্রুদল তৃতীয়বার আক্রমণ ক'রলে আমাদের ঘাঁটি। আগেকার দু'বারের চেয়ে এবার আরও বেশী তোড়-জোড় ক'রে এসেছিল। এবার তারা আগে বিমান আক্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। ছয়খানি জঙ্গীবিমান আমাদের ঘাঁটির উপর ঘণ্টাখানেকেরও বেশী ঘুরে ঘুরে বড় আকারের বোমা ফেল্‌তে লাগ্‌ল—তারপর আমাদের পরিখার মাঝে মেসিনগানের গুলি ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। সে সব গুলিও আবার সাধারণ গুলি নয়—২০ মিলিমিটার গুলি —যে গুলি সাধারণতঃ ট্যাঙ্ক এবং সাজোয়া গাড়ির উপর ছোড়া হ'য়ে থাকে। এরপর চালালো শক্তিশালী কামান। এই সব করার পর ওরা হয়ত মনে ক'রেছিল আমাদের দল একেবারে নিশ্চিহ্নই হ'য়ে গেছে—তাই আমাদের ঘাঁটির দিকে ওরা বীর-বিক্রমে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল কিন্তু ভগবানের দয়ায়—ওরা এত করা সত্ত্বেও আমাদের একটির বেশী লোক মরে নি। আমাদের সৈন্যরা প্রথমে

কোন গুলি না ছুঁড়ে একেবারে চুপ ক'রে রইল কিন্তু শত্রুদল খুব নিকটে এসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ অব্যর্থ লক্ষ্যে তা'দের উপর গুলি ছুঁড়্তে লাগ্ল। এবারে শত্রুদল আমাদের দিক থেকে কোনরূপ বাধা পাবে আশা করে নি, সুতরাং এরূপভাবে আক্রান্ত হ'য়ে কি ক'রবে দিশে না পেয়ে দ্রুত পালাতে সুরু ক'রলে। এই সময় ক্যাপ্টেন সূরজমল কয়েক মাইল দূরে প্রধান শিবিরে অবস্থান কর্ছিলেন—খবর পেয়ে তিনি ৫০ জন সৈন্য নিয়ে লালারুয়া ঘাঁটি অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। এসে দেখেন, ঘাঁটিতে সৈন্যরা বেশ মনের আনন্দে আছে, শত্রুদলের বারবার আক্রমণে তারা একটুও মুষড়ে পড়ে নি। সূরজমল শত্রুদলকে পাল্টা আক্রমণ ক'রবেন সাব্যস্ত ক'রলেন। শত্রু-শিবির কয়েক মাইল দূরে। সন্ধ্যার কাছাকাছি ৫০টি সৈন্য নিয়ে গুড়ি মেরে তিনি এগিয়ে চল্লেন শত্রু-শিবিরের দিকে, তারপর হঠাৎ তিনি যখন তা'দের আক্রমণ ক'রলেন তখন তারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে এদিক্ ওদিক্ ছুটে পালাল: এইরকম আক্রমণ হ'তে পারে এ ধারণাই তারা ক'রতে পারে নি। শত্রু-শিবির বিপর্য্যস্ত ক'রে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে ক্যাপ্টেন সূরজমল নিজের শিবিরে ফিরে এলেন। শত্রুদল ক্যাপ্টেন সূরজমলের এই অতর্কিত আক্রমণে এমন ভড়্কে গিয়েছিল যে, কিছুদিন পর্য্যন্ত আমাদের দল সেখানে বেশ নিরুপদ্রবেই কাল কাটাতে পেরেছিল।

যখন এই সব ব্যাপার ঘটে তখন মেজর রাতুরি ক্যাপ্টেন

সুরজমলের দলের খাদ্য সরবরাহ ক'রতেন। তিনি তাঁর দলের সৈন্যদের বেশ ভাল ক'রে নৌকা বাওয়া শিখিয়েছিলেন, তারা কালাদনের উজানের ঘাঁটিগুলিতে খাদ্য-দ্রব্য পৌঁছে দিত—এ ছাড়া তাঁর ব্যাটেলিয়ানকে প্যারাস্যুট ও গেরিলা আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রবার ভার দিয়েছিলেন। এই কাজের জন্য সামি, অপুকাওয়া এবং কাউকটাক—এই তিনটি জায়গায় তিনি তিন দল সৈন্য রেখে দেন।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইম্ফল অভিযান নিষ্ফল হওয়ায় নেতাজী তাঁর সব সৈন্যদলকেই পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। ১নং ব্যাটেলিয়ানকে রেঙ্গুনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হ'ল। সৈন্যরা প্রথমে এ আদেশ মান্‌তে চায় নি—তা'দের ধারণা, এ আদেশ কিছুতেই নেতাজীর কাছ থেকে আসে নি কিন্তু তা'দের যখন সব কথা বুঝিয়ে বলা হ'ল—তখন তারা আদেশ মান্‌তে রাজী হ'ল বটে কিন্তু রেঙ্গুনে ফিরে যেতে তা'দের বুকটা একেবারে ভেঙ্গে যেতে লাগ্‌ল। যত যুদ্ধ ক'রেছে তারা প্রত্যেকটিতে বিজয়ী হ'য়েছে—তবু তা'দের ভাগ্যে বিধাতা এ লিখ্‌লেন কেন? ব্যাটেলিয়ান রেঙ্গুনে এসে হাজির হ'ল নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

যুদ্ধে এই ব্যাটেলিয়ান তা'দের এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট্‌ বীরবর ক্যাপ্টেন কাবুল সিং এবং অন্যান্য ৩০ জন শহীদকে হারিয়েছে। তারা যেখানে থেকে যুদ্ধ ক'রে এসেছে সে জায়গাটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ওখানে থাক্‌বার সময়ই তারা ম্যালেরিয়া

আর আমাশয়ে খুব ভুগেছে—রেঙ্গুনে যখন ফিরে এল তখনও তা'দের প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে।

২ ও ৩ নং ব্যাটেলিয়ানের কার্য্যকলাপ

২ ও ৩ নং ব্যাটেলিয়ান ও রেজিমেণ্টাল হেড্‌কোয়ার্টার্সের অগ্রবর্ত্তী দল ১৯৪৪ সালের ৪ঠা।৫ই ফেব্রুয়ারী ট্রেণ যোগে রেঙ্গুন থেকে মান্দালয় যাত্রা করে। শত্রুবিমান আক্রমণে রেলওয়ের অনেকগুলি সেতু ভেঙ্গে গিয়েছিল, সেইজন্য সৈন্যদলকে অনেক পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়।

মেজর মহবুব আহম্মদ, মেজর রামস্বরূপ ও আমি ৫ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন থেকে মোটরে রওয়ানা হ'য়ে ৮ই ফেব্রুয়ারী মান্দালয়ে পৌঁছি।

জেনারেল মুতাগুচি উত্তর ব্রহ্মে জাপানী সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী আমি তাঁর সাথে দেখা ক'রতে গেলে তিনি আসন্ন যুদ্ধে আমার রেজিমেণ্টের কর্ম্মসূচী ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, ১নং রেজিমেণ্ট হাকা-ফালম অঞ্চলে গিয়ে ঐ এলেকা রক্ষা ক'রবার ভার নেবে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ পক্ষের দু'টি ব্রিগেড রয়েছে—একটির নাম লুশাই ব্রিগেড অপরটি আইজল ব্রিগেড।

এই দু'টি ব্রিগেড কালেওয়ার দিকে এগিয়ে তিদ্দিম-তামু এলেকায় যুদ্ধরত জাপানী সৈন্যদের প্রধান সরবরাহের পথ বন্ধ ক'রে দিতে পারে, সুতরাং ১নং রেজিমেণ্টের প্রথম

কর্ত্তব্য হবে—ব্রিটিশের ঐ দু'টি ব্রিগেডের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া। এদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হবে—হাকা-ফালম এলাকার লাংলের দিকে আক্রমণ চালানো। এতে ব্রিটিশেরা ধাঁধায় প'ড়ে যাবে। প্রধান আক্রমণ যে কোন্ দিকে আস্‌বে তা' ওরা ধর্‌তে পার্‌বে না। জেনারেল মুতাগুচি বল্‌লেন—জাপানীরা প্রধান আক্রমণ স্বরু ক'রে দিলেই আমার রেজিমেণ্ট ভারতবর্ষে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে।

জেনারেল মুতাগুচির কাছ থেকে পরামর্শ নেবার পর ১২ই ফেব্রুয়ারী আমি মান্দালয়ে ফিরে আসি। দেখি ২ ও ৩নং ব্যাটেলিয়ানের সৈন্যরা সেখানে এসে গেছে। মান্দালয় থেকে দু'টি দলকে পাঠালাম পকোকৌ-তে, তারা গরুর গাড়ীতে ক'রে খাদ্য আন্‌বে। আন্‌বার পথ হবে—পক থেকে তিলিন, তিলিন থেকে গাঙ্গ, সেখান থেকে কান হ'য়ে নাউছয়াং। এই নাউছয়াংই হবে আমাদের রেজিমেণ্টের মূল ঘাঁটি।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ব্রিগেডের উর্দ্ধতন ষ্টাফ্ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে মোটর-যোগে আমি মান্দালয় থেকে মুতাইক রওয়ানা হই। ছিন পাহাড় এলেকায় যে জাপানী ডিভিশান যুদ্ধ ক'রছে তা'দের হেড্ কোয়ার্টার্স হ'চ্ছে এই মুতাইক। জাপানীদের এই ডিভিশনের নাম হচ্ছে "য়ুমি" অর্থাৎ "শ্বেত শার্দ্দূল দল"।

আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রায় তিন শ' লোকের এক একটা দল ক'রে মান্দালয় থেকে কালেওয়া যাত্রা ক'রলে।

মান্দালয় থেকে ইউ (Yeu) যাবে তারা পায়ে হেঁটে বা ট্রেণে, সেখান থেকে কালেওয়া পায়ে হেঁটে বা লরীতে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী মুতাইক পৌঁছে আমি য়ুমি ডিভিশানের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলাম। এই ডিভিশানের সঙ্গে একজোট হ'য়ে ১নং রেজিমেণ্ট (সুভাষ ব্রিগেড) ছিন পাহাড় এলাকায় লড়্‌বে। কম্যাণ্ডার ওখানকার অবস্থার যা ব্যাখ্যা দিলেন তা'তে বুঝা গেল—শত্রুপক্ষের এক ডিভিশান সৈন্য (১৭শ ভারতীয় দল) আছে তিদ্দিমে, একটি ভারতীয় ব্রিগেড আইজলে এবং একটি ভারতীয় ব্রিগেড লাংলেতে। এ ছাড়া ছিনেও গুর্খা সৈন্য নিয়ে গড়া লুশাই নামে একটি ব্রিগেড ভেঙে কতকগুলি গেরিলা দল গড়া হ'য়েছে, এরা হাকা-ফালমের জাপানী সৈন্যের উপর উপদ্রব ক'রছে। ফালমের ৩০ মাইল উত্তরে তাইবুয়ালে, হাকার ৪০ মাইল পশ্চিমে সালেনে এবং হাকার ৫০ মাইল দক্ষিণে গুরখোয়াতে শত্রুপক্ষ তা'দের প্রধান প্রধান হেড্ কোয়ার্টার্স ক'রেছে। এ ছাড়াও হাকা ও ফালমের চারিধারে তারা অনেকগুলো ছোট ছোট ঘাঁটি ক'রেছে। এই ছিনে গেরিলা দল ব্রিটিশ অফিসারদের নেতৃত্বে হাকা এবং ফালমে অবস্থিত জাপানী সৈন্যদের একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। এই অঞ্চলে ওদের মোট গেরিলা সৈন্যের সংখ্যা বিশ হাজারের কাছাকাছি।

এদিকে জাপানীদের আছে মাত্র ৬০০ সৈন্যের একটি ব্যাটেলিয়ান ফালমে এবং ২০০ সৈন্যের একটি দল

হাকাতে। জাপানীদের অন্যান্য সৈন্য রয়েছে ফোর্ট হোয়াইট ও কাঙ্গ্যি এলাকায়।

কথা হ'ল হাকা-ফালম এলাকার ভার এখন থেকে জাপানীদের বদলে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১নং গেরিলা রেজিমেণ্টকেই নিতে হবে। তারা দেখ্‌বে শত্রুদল যাতে হাকা-ফালম অধিকার ক'রে কালেওয়া থেকে ফোর্ট হোয়াইট ও তামুতে সরবরাহের রাস্তা না আটকায়।

জাপানী জেনারেলের ধারণা—ব্রিটিশেরা ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার ক'রবার জন্য আক্রমণের বিপুল আয়োজন ক'রছে। এই উদ্দেশ্যে তারা ইম্ফল ও তিদ্দিমে বহু সৈন্য সমাবেশ ও সামরিক উপকরণ সংগ্রহ ক'রেছে, তা' ছাড়া ইম্ফল থেকে তামু পর্য্যন্ত 'টোকিও-সড়ক' নামে বড় একটা রাস্তা তৈরী ক'রেছে।

তাঁর মতে ব্রিটিশদের অগ্রগতির পরিকল্পনা হবে (ক) ইম্ফল থেকে পালেল—তামু হ'য়ে কালেওয়া; (খ) তিদ্দিম থেকে ফোর্ট হোয়াইট হ'য়ে কালেওয়া; (গ) লুশাই ব্রিগেড এবং লাংলে-এলেকার অন্যান্য সৈন্যদল হাকা-কান-গাঙ্গ-তিলিন ওপক হ'য়ে ইরাবতী তীরস্থ পকোকউ। ১নং গেরিলা ব্রিগেডের প্রধান কাজ হবে—এই অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া। তিনি বল্‌লেন জাপানীদের পরিকল্পনা হচ্ছে—ব্রিটিশরা এই বড় রকমের আক্রমণ স্নুরু ক'রবার আগেই তা'দের উপর গিয়ে পড়া এবং তারপর ইম্ফল অধিকার ক'রে ওদের সব কিছু আয়োজন পণ্ড ক'রে দেওয়া।

আমাদের সঙ্গে কথা ছিল—আমরা আক্রমণকারী সেনা-বাহিনীর অগ্রগামী হ'য়ে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাব—তা' ক'রতে না দিয়ে এমন একটা বাজে এলাকার ভার আমাদের ঘাড়ে কেন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এ কথা আমি জাপানী জেনারেলকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। তিনি উত্তরে বল্‌লেন—জেনারেল হেড্ কোয়ার্টার্স তাঁকে জানিয়েছেন—আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রথমে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে,—সেইজন্যই একটা সেক্টারের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হচ্ছে তা'দের উপর। তিনি আমাকে আরও জানিয়ে রাখ্‌লেন—এ সেক্টারে টিঁকে থাকা আমাদের খুবই কঠিন হবে। আশে পাশে বেশী শত্রু সেনার মহড়া নিতে হবে এ কথা তিনি বল্‌ছেন না, তিনি বল্‌ছেন—স্থানটি এত দুর্গম যে এখানে ঠিকমত খাদ্য সরবরাহ করা অতি কষ্টকর।

আমার মনে প'ড়ে গেল—নেতাজী আমাদের আগেই ব'লেছিলেন, আমাদের এইরূপ সব পরীক্ষা দিতে হবে, সৈন্যরা তার উত্তরে জানিয়েছিল—দেশকে স্বাধীন ক'রতে তারা যে কোন দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে রাজী আছে। জাপানী জেনারেলকে দিয়ে আমি অঙ্গীকার করিয়ে নিলাম—প্রধান আক্রমণ সুরু ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সৈন্যদলকে ভারতবর্ষ অভিযানের অগ্রগামী হ'বার সুযোগ দেবেন।

নিজের হেড্ কোয়ার্টার্সে ফিরে এসে আমি ২নং ব্যাটেলিয়ানের কম্যাণ্ডার মেজর রণ সিংকে নির্দ্দেশ দিলাম—

এক দল লোক পাঠিয়ে জাপানীদের কাছ থেকে ফালম এলেকার ভার বুঝে নিতে।

আগে থেকেই স্থির হ'য়েছিল আমাদের মূল ঘাঁটি হবে নাউছয়াং-এ (মাইথাহাকা)। তদনুসারে ২৪শে ফেব্রুয়ারী আমি রেজিমেণ্টাল হেড্ কোয়ার্টার্সের ষ্টাফ্ অফিসারদের নিয়ে মাইথাহাকায় গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। গিয়ে দেখি, মেজর রণ সিংএর অধীনে ২নং ব্যাটেলিয়ানের প্রায় ৫০০ সৈন্য আগেই সেখানে এসে গেছে। ব্রিগেডের অন্যান্য সৈন্য ইউ ও কালেওয়া থেকে ছোট ছোট দলে তখনও আস্‌ছে।

জাপানীদের কাছ থেকে ফালম রক্ষার ভার বুঝে নিতে মেজর রণ সিং ২৫শে ফেব্রুয়ারী লেফ্‌ট সিকন্দার খাঁর নেতৃত্বে 'আওয়াল কোম্পানী' ব'লে একদল সৈন্য পাঠালেন; এতে আনুমানিক ১০০ জন সৈন্য ছিল।

আমি মাইথাহাকায় এসে দেখ্‌লাম ফালমে কোন প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা নেই; হাকা ও ফালমে আমাদের সৈন্যদের রসদের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের ক'রে নিতে হবে। মাইথাহাকায় একটা খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র ছিল, জাপানীরা লরীতে ক'রে খাদ্য-দ্রব্য সেখানে রেজিমেণ্টাল কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দিয়ে যেত। এখান থেকে ফালম প্রায় ৫০ মাইল, হাকা ৮৫ মাইল। এই দূরের পথে খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের ক'রতে হ'ত। রেজিমেণ্টাল হেড্ কোয়ার্টার্স থেকে হাকা-ফালম এলেকায় যাবার একটি মাত্র পাহাড়ে পথ ছিল। সে পথে খাদ্য

প্রেরণ ক'রবার জন্য কোন প্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। জাপানী সৈন্যদলে খাদ্য প্রেরণের জন্য ভারবাহী পশু ও কুলী প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আমাদের ব'লে দেওয়া হ'ল—আজাদ হিন্দ ফৌজের খাদ্য প্রেরণের জন্য কোন প্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা করা হবে না। ফলে—আমাদের সৈন্যরাই যুদ্ধরত তা'দের ভাইদের জন্য মাথায় ক'রে খাদ্য বহন ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেত।

হাকা-ফালম খুব পাহাড়ে জায়গা। ফালমের উচ্চতা ৬০০০ ফুট, হাকা ৭০০০ ফুট। আমাদের নির্ভীক সৈন্যরা যুদ্ধরত তা'দের সহকর্মিদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রত্যহ রসদের ভারী বোঝা মাথায় ক'রে এই উঁচু পাহাড়ে উঠে আস্‌ত। রসদের ব্যবস্থাও খুব খারাপ—শুধু চাল আর লবণ, তাও আবার মাঝে মাঝে মিল্‌ত না; দুধ, চিনি, চা, মাংস—এ সব ত একরকম তারা চোখেই দেখ্‌তে পায় নি।

রসদ সরবরাহের কাজ ভাল ভাবে চালাবার জন্য আমরা আট মাইল অন্তর অন্তর ছয়টা ঘাঁটি স্থাপন ক'রেছিলাম। সৈন্যরা এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে রসদ পৌঁছে দিয়ে আস্‌ত। প্রত্যেককে রোজ গড়ে প্রায় ১৬ মাইল ক'রে বোঝা মাথায় ক'রে হাঁটতে হ'ত। সৈন্যদের এই অবস্থা দেখে মনে বড়ই কষ্ট হ'ত। তা' ছাড়া এই নামমাত্র খাবার খেয়ে তারা ক'দিনই বা বাঁচ্‌বে। জাপানীরা অবশ্য ইচ্ছা ক'রলে এ সব বিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্যই ক'রতে পার্‌ত—কিন্তু কিছুই করে নি তারা।

আমার মনে হয় তারা ইচ্ছে ক'রেই করে নি। আমাদের সৈন্যদের দৃঢ় মনোভাব তারা লক্ষ্য ক'রেছে, আর এও বুঝেছে—জাপানীদের কোন অসঙ্গত ব্যবহারই তারা বরদাস্ত ক'রবে না। ফিল্ড মার্শাল তেরায়ূচি এর আগে সিঙ্গাপুরে নেতাজীকে স্পষ্ট ক'রেই ব'লেছিলেন যে তাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজের বেশী লোক যুদ্ধক্ষেত্রে আন্‌তে চান না। তাঁ'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন আজাদ হিন্দের অনেক সৈন্য সেখানে এসে গেল—তখন তাঁ'দের উদ্দেশ্য হ'ল গুরুতর বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি ক'রে ফৌজের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ নষ্ট ক'রে দেওয়া। ওঁদের অভিসন্ধি হ'চ্ছে—এমনি ক'রে আজাদী সৈন্যের মনোবল নষ্ট ক'রে দিয়ে নেতাজীকে বলা—এ দুরূহ অভিযানের কষ্ট ওরা সইতে পার্‌লে না। কিন্তু নেতাজী তা'দের আগেই এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন এবং তারাও প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিল—সকল কষ্ট তারা অকাতরে সহ্য ক'রবে। তা'দের একমাত্র আদর্শ ছিল—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। মুখ বুজে তারা নিজেদের কঠিন কর্ত্তব্য পালন ক'রে গেছে। মোট কথা, জাপানীরা আমাদের হাড়ভাঙ্গা যাচাই ক'রে নিচ্ছিল।

আওয়াল কোম্পানীর সৈন্য ফালমে আস্‌বার সময় পিঠে ক'রে আন্‌ল ভারী ভারী সব মেশিনগান, হালকা অটোমেটিকগান সঞ্চিত গোলাবারুদ (ammunition), কাপড়-চোপড়, বিছানা আর ২০ দিনের খাবার। অফিসার থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ সৈনিক পর্য্যন্ত সবার পিঠেই গড়ে এক মণেরও কিছু বেশী ক'রে বোঝা।

আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা জাপানীদের কাছ থেকে ফালম এলাকা রক্ষার ভার নিজেরা গ্রহণ ক'রল। আশে পাশে তখন ব্রিটিশ ও ছিন (Chin) মিলিয়ে প্রায় ৬০০ গেরিলা সৈন্য ছিল। ছিন গেরিলার অনেক গল্পই আমরা শুনতাম,—জঙ্গল-যুদ্ধে এদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে জাপানীদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। জাপানী সরবরাহের পথে লুকিয়ে থেকে অনেক সময় এরা জাপানী সৈন্যদের ধ'রে নিয়ে গেছে। ওদের গেরিলা বাহিনীর মেজর ম্যানিং নামে একজন অফিসারের বিশেষ নামডাক ছিল—জাপানীরা তাঁকে রীতিমত ভয় ক'রে চলত। এই অফিসারটি যুদ্ধ বাধ্‌বার কয়েক বছর আগে থেকেই ছিন পাহাড় এলাকায় ছিলেন। এখানকার লোকজন তাঁর বেশ ভাল ক'রে চেনা—এখানকার ভাষা তাঁর বেশ ভাল ক'রে জানা। শুধু তাই নয়—এখানকারই একটি ছিন (Chin) মেয়েকে তিনি বিয়ে ক'রেছিলেন। এই সব কারণে স্থানীয় লোকেরা তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য ক'রত। তা'দের কাছ থেকেই তিনি আমাদের অবস্থান ও গতিবিধির সম্বন্ধে সকল খবর সংগ্রহ ক'রতেন।

আওয়াল কোম্পানীর উপর যে কাজের ভার পড়ল সেটা বড় সহজ নয়। ফালমে আরও বেশী সৈন্য রাখতে আমার ইচ্ছা হ'য়েছিল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতায় সে আর সম্ভব হ'ল না। ১০০র বেশী সৈন্য সেখানে আমরা কখনও রাখতে পারি নি।

আর জায়গাটায় শীতের দিনে কি ভীষণ ঠাণ্ডা! অথচ

আমাদের সৈন্যদের একটা ক'রে গরম শার্ট আর একখানা পাতলা তুলোর কম্বল ছাড়া অন্য কোন শীত-বস্ত্র নেই। অসহ্য শীতে তারা ঘুমুতে পার্‌ত না, সারা রাত আগুন জ্বেলে তার চারিধারে ব'সে কাটাত। আমাদের অনেক প্রহরী উঁচু পাহাড়ের ঘাঁটি পাহারা দিতে গিয়ে নিদারুণ শীত আর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়ায় জ'মে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই মারা গেছে। এ ছাড়া এখানে ওষুধপত্র আর চিকিৎসক একরকম ছিল না বল্‌লেই হয়। গোটা আওয়াল কোম্পানীর জন্য ব্যবস্থা ছিল মাত্র একজন নাইক (Naik) ও দুইজন শুশ্রূষাকারী সেপাই—এই হচ্ছে ওর মেডিক্যাল ষ্টাফ্। এদিকে পুরানো জুতোগুলি দীর্ঘকাল পরায় তা'দের আর কিছু নেই বল্‌লেই হয়, অনেক সৈন্যের আবার জুতোই নেই। জামাগুলিরও একেবারে জীর্ণ দশা, নতুন যে আর মিল্‌বে সে আশাও নেই। তবুও এ সব কিছুতেই তা'দের মনের স্ফূর্ত্তি নষ্ট ক'রতে পারে নি, তারা বেশ মনের আনন্দেই তা'দের কর্ত্তব্য ক'রে যাচ্ছিল। শরীর অবশ্য তা'দের অনেকেরই বড় তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছিল—বিশেষ ক'রে মাইথাহাকা সমতল-ভূমি এলাকার সৈন্যদের। দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে এদের প্রায় শতকরা ষাট জন লোককে হাসপাতালে যেতে হ'য়েছিল। মাইথাহাকা হ'চ্ছে কাবা উপত্যকার ঠিক মধ্যস্থলে। কাবা উপত্যকাকে ব্রিটিশেরা নাম দিয়েছে মৃত্যু-উপত্যকা। এখানে এই ভীষণ ম্যালেরিয়ার জায়গায় আমাদের সৈন্যদের একটা মশারি পর্য্যন্ত ছিল না।

তা'তে তারা কোনদিন কোন উচ্চবাচ্য করে নি। কষ্ট বরণ ক'রে নেওয়ার ব্রত তারা গ্রহণ ক'রেছে, সে ব্রত তারা যেমন ক'রেই হ'ক উদ্‌যাপন ক'রবেই।

১১ই মার্চ্চ আমি কাইগনে ডিভিশনাল হেড্‌কোয়ার্টার্সে গিয়ে মেজর ফুজিয়ারার সঙ্গে দেখা ক'রলাম। ইনিই ফারের পার্কে আমাদের সবাইকে জেনারেল মোহন সিংএর হাতে অর্পণ করেন। এখন ইনি উত্তর ব্রহ্ম সামরিক এলাকায় গোয়েন্দা অফিসারের কাজ ক'রছিলেন। ইনি আমায় সংবাদ দিলেন—জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকটা ইউনিটের সঙ্গে একত্র হ'য়ে তিদ্দিম আক্রমণ ও অবরোধ ক'রেছে। আমি তাঁকে জানালাম—জাপানীজ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্‌ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই আক্রমণের মহড়া নিতে আমাদেরই সুযোগ দেওয়া হবে। সুতরাং আমার ব্রিগেডের কয়েক দল সৈন্য আমি এতে পাঠাতে চাই। মেজর ফুজিয়ারা রাজী হ'য়ে ৩নং ব্যাটেলিয়ানকে এখানে পাঠাতে বল্‌লেন। আমার এ ব্যাটেলিয়ানটি তখন ২০ মাইল দূরে কালেওয়াতে অবস্থান ক'রছিল। রেজিমেণ্টাল সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড কর্ণেল ঠাকুর সিংকে তখনই টেলিফোন ক'রে জানালাম—যত শীঘ্র পারেন তিনি যেন ব্যাটেলিয়ানটিকে কাইগনে নিয়ে আসেন। আমার নির্দ্দেশ পেয়ে সারা রাত্রি মার্চ্চ ক'রে তাঁরা ভোরেই সেখানে এসে হাজির হ'লেন। তাঁদের উপর আদেশ দেওয়া হ'ল, ওখান থেকে তাঁরা যেন প্রথমে ফোর্ট হোয়াইটে যান, সেখান থেকে গিয়ে তিদ্দিম আক্রমণ ক'রতে হবে,

কিন্তু তাঁরা তিদ্দিম পৌঁছবার আগেই তিদ্দিমের পতন হ'য়ে গেল।

১৭ই মার্চ্চ খবর পেলাম, ফালমের ৪০ মাইল পশ্চিমে ক্লানখুয়া অঞ্চলে শত্রুদল কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠেছে। আমি তখনই লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁকে সদলবলে ওখানে গিয়ে শত্রুদলের সম্মুখীন হ'তে আদেশ দিলাম। তাঁর প্রতি নির্দ্দেশ রইল—শত্রুদল যদি ভারতীয় হয় তবে প্রথমে তা'দের প্রতি গুলি ছোঁড়া হবে না। প্রথমে তা'দের আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রতে আহ্বান করা হবে, তা'তে সাড়া না দিয়ে যদি তারা গুলি ছুঁড়্‌তে সুরু করে, তবেই তা'দের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে। আমার নির্দ্দেশ পাবার পর ১৯।২০শে মার্চ্চ রাত্রে লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ আওয়াল কোম্পানীর প্রায় ৮০ জন সৈন্য নিয়ে ক্লানখুয়া এলাকায় যাত্রা ক'রলেন। সারা রাত ধ'রে উঁচু খাড়া পাহাড়ে পথে চ'লে ভোরে তাঁরা জুমুয়াল নামে একটি গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। চারিদিকে পাহারার ব্যবস্থা ক'রে সৈন্যদল একটা জায়গায় ব'সে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছিল, এমন সময় একটি প্রহরী খবর নিয়ে এল—একদল শত্রুসৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে এই দিকেই আস্‌ছে। লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ তখনই ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন—হয় এদের বন্দী ক'রতে হবে—না হয় সমূলে ধ্বংস। তখনই সৈন্যদের আত্ম-গোপন ক'রে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'তে আদেশ দেওয়া হ'ল। শত্রুদল এখানে তা'দের বিপক্ষ দলের উপস্থিতির কিছুমাত্র

আশঙ্কা না ক'রে সোজা আজাদী সৈন্য যেখানে লুকিয়ে আছে তার কাছাকাছি এসে গেল। লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ হঠাৎ বেরিয়ে এক লাফে পেট্রোল কম্যাণ্ডারের সাম্‌নে গিয়ে তার বুকের উপর রিভলভার ধ'রে আত্মসমর্পণ ক'রতে বল্‌লেন। পেট্রোল কম্যাণ্ডার আর 'না' বল্‌তে পার্‌লেন না, উনি সদল-বলে আত্মসমর্পণ ক'রলেন। এমনি ক'রে শত্রুপক্ষের একজন অফিসারের সঙ্গে ২৪ জন সৈন্যকে আমরা বন্দী করি, তা' ছাড়া তা'দের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা অনেক কিছু আমাদের লাভ হয়।

লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ এদের কাছে অনুসন্ধান ক'রে জান্‌লেন এরা সব লুসাই ব্রিগেডের লোক, তা' ছাড়া নামকরা গেরিলা যোদ্ধা মেজর ম্যানিং এখন এই এলাকায়ই রয়েছেন এবং লুসাই ব্রিগেড ও পাঞ্জাবী ট্রুপসের দু'টি শক্তিশালী সৈন্যদল পথের দু'ধার দিয়ে ফালমের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। লেফট্‌, সিকন্দর খাঁ ঠিক ক'রলেন মেজর ম্যানিংকে তিনি জীবিত বন্দী ক'রবেন—তা' ছাড়া শত্রুদল ফালমে আস্‌বার আগেই তা'দের শেষ ক'রতে হবে।

মেজর ম্যানিং এই সময় পাহাড়ের উৎরাই পথে নালাতে ছিলেন। লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ নিজের দলকে লুকিয়ে রেখে একজন বন্দীকে পাঠালেন ফাঁকি দিয়ে মেজর ম্যানিংকে তা'দের কাছে ডেকে আন্‌তে। শত্রুদের প্রথম গেরিলা দলকে এমন নিঃশব্দে ধরা হ'য়েছিল যে, নালার লোকে এর বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পারে নি; সুতরাং মেজর ম্যানিং কিছুমাত্র সন্দেহ না ক'রে লোকটির কথামত আমাদের দলের দিকে

এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লেন। পাহাড়ের চড়াই পথে উঠ্‌বার সময় তাঁর আরদালি তাঁর আগে আগে আস্‌তে লাগ্‌ল। আরদালিটা রাস্তার এক মোড় ঘুর্‌তে যাবে, এমন সময় তাকে ধ'রে ফেলা হ'ল; মেজর ম্যানিং কাছাকাছি এলে লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ আর থাক্‌তে না পেরে নিজেই আচম্‌কা তাঁর সাম্‌নে গিয়ে রিভলভার উঁচিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ ক'রতে বল্‌লেন। ম্যানিং-এর হাতে একটা ষ্টেভ্‌-গান ছিল, তা' থেকে তিনি গুলি ছুঁড়্‌লেন, লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ তাঁ'র রিভলভার দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রিভলভারের আওয়াজ হ'ল না। আমাদের একটা ব্রেন-গানও পাতা ছিল সেখানে, সেটাও বিকল হ'য়ে গিয়ে তা' থেকে গুলি ছোঁড়া গেল না। বিপদ্ বুঝে ম্যানিং তাঁর ষ্টেভ্‌-গান ফেলে উৎরাই পথে ছুটে পালালেন—লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁও তাঁর পিছু পিছু ছুট্‌লেন—কিন্তু তাঁকে ধর্‌তে পার্‌লেন না।

এর পর লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ শত্রু-সৈন্যদলকে আক্রমণ ক'রে তা'দের কয়েক মাইল পিছনে হটিয়ে দেন। আমাদের দলের কার্য্য-কলাপ দেখে শত্রু-সেনা এমন ভড়্‌কে গিয়েছিল যে বহুকাল তারা আর ফালমের কাছাকাছি ঘেঁসে নি। লেফ্‌ট, সিকন্দর খাঁ ২রা মার্চ্চ তারিখে বন্দীদের এবং তা'দের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র গোলাগুলি নিয়ে ফালমে ফিরে আসেন। তাঁ'দের নিজের দলের লোক একটিও নিহত বা আহত হয় নি। এর পর ফালমের আশে পাশে রীতিমত টহলের ব্যবস্থা করা হয়।

ইত্যবসরে ফালমে কিছু খাদ্য সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং হাকায় সৈন্য প্রেরণ ক'রে তার রক্ষার ভার গ্রহণ করায় এখন আর আমাদের কোন অসুবিধা রইল না।

১৯৪৪ সালের ২৮শে মার্চ্চ লেফ্‌ট, অম্রিক সিংএর অধীনস্থ ২নং ব্যাটেলিয়ানের 'পরওয়ানা' সৈন্যদল মাইথা-হাকা থেকে ফালমে এসে হাজির হয়। আসার সময় তারা ভারী ভারী মেসিনগান, সঞ্চিত গোলাবারুদ এবং এক মাসের খাবার পিঠে বহন ক'রে নিয়ে আসে। তা' ছাড়া ধানের ক্ষেত থেকে তারা কয়েকটি মোষ ধ'রে তা'দের পিঠে কিছু কিছু রসদ চাপিয়ে দিয়েছিল।

ফালম থেকে হাকা প্রায় ৩৫ মাইল পথ। শত্রুপক্ষের গেরিলা দল এই পথের উপর সর্ব্বদা সতর্ক-দৃষ্টি রাখ্‌ত। এই পথ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ছুন্‌সং নামে একটা গ্রামে তারা একটা ঘাঁটি ক'রেছিল। এখান থেকে তারা জাপানী সরবরাহকারী দলের উপর আক্রমণ চালাত। এদের উপদ্রবে জাপানীরা এক রকম অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু হাকায় তা'দের সৈন্য-সংখ্যা কম থাকায় এদের ঘাঁটি আক্রমণ ক'রতে তারা সাহস পেত না।

'পরওয়ানা' কোম্পানী ৩০শে মার্চ্চ ফালম ছেড়ে যায়। কোম্পানীতে প্রায় ১৫০ জন সৈন্য ছিল। ফালম থেকে আমিও তা'দের সঙ্গে যাই। পরদিন ৩১শে মার্চ্চ আমি খবর পেলাম—ছুন্‌সং-এ অবস্থিত শত্রুদল আমাদের আক্রমণ ক'রবার আয়োজন ক'রছে। কথাটা শুনে মাত্র আমি ঠিক ক'রলাম—

আমরাই ওদের আগে আক্রমণ ক'রব। আমার নির্দ্দেশে লেফ্‌ট, লেহনা সিং রাত্রে গ্রামটা ঘিরে ফেল্‌লেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শত্রুদল ঘাঁটি ছেড়ে পালাল—আমাদের লাভ হ'ল বেশ কিছু ভাল রসদ।

১৯৪৪ সালের ৩রা এপ্রিল জাপানীদের কাছ থেকে আমবা হাকার রক্ষার ভার গ্রহণ ক'রলাম। জাপানীরা এখান থেকে প্রথমে গেল ফালমে, তারপর সেখান থেকে তিদ্দিমে।

হাকায় এসে দেখা গেল—সেখানকার অবস্থা ফালমের চেয়ে আরও শোচনীয়। খাবার জোটানো হ'য়ে উঠ্‌ল এক মহাসমস্যার ব্যাপার। এই এলাকায় শত্রু-সৈন্যের যা সংখ্যা ও তৎপরতা তাতে হাকায় আমাদের অনেক সৈন্য মোতায়েন রাখা দরকার কিন্তু রসদ সরবরাহের অসুবিধার জন্য এখানে আমাদের সৈন্য রাখ্‌তে হ'ল যত কম পারা যায়। খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র হাকা থেকে প্রায় ৮৫ মাইল দূরে। সুতরাং আমাদের সাম্‌নে মাত্র দু'টি পন্থা খোলা রইল—হয় অনাহারে মৃত্যুর ভয় তুচ্ছ ক'রে হাকাতে অধিক-সংখ্যক সৈন্য রাখা, না হয় শত্রু কর্ত্তৃক নিশ্চিহ্ন হ'বার আশঙ্কা সত্ত্বেও অল্প-সংখ্যক সৈন্য রাখা। কি করা যায় আলোচনা ক'রবার জন্য অফিসারদের একটি বৈঠক বস্‌ল ; তাতে ঠিক হ'ল—দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন ক'রতে হবে। হাকাতে তখন ভীষণ শীত। আর তা' হবারই কথা, আমরা যেখানে আছি তার উচ্চতা প্রায় ৭০০০ ফুট, আমাদের কোন কোন প্রহরী সৈন্যকে ৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু ঘাঁটিতে থেকে পাহারা দিতে হ'ত।

১৯৪৪ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে শিবিরের প্রহরীদলকে পরিদর্শন ক'রতে গিয়ে ওদের কম্যাণ্ডারদের জিজ্ঞাসা করি—খাবার-দাবারের কোন কষ্ট হ'চ্ছে কি না? উত্তরে তাঁরা বলেন—না, কোন কষ্ট হচ্ছে না, প্রচুর উপযুক্ত রসদ পাচ্ছেন তাঁরা। খাদ্য-দ্রব্যের এত অভাবের মাঝে এঁদের মুখে এই উত্তব শুনে আমি একটু অবাক্ হ'য়ে গেলাম। শিবিরে গিয়ে বুঝ্‌লাম দু'দিন ধ'রে এরা মানুষেব উপযুক্ত খাবারই খেতে পান নি—এ দু'দিন তাঁরা লিঙ্গরা নামে এক রকম পাহাড়ে ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ ক'রেছেন। এই বকম ব্যাপার শুধু একবার নয়—শত শত বার ঘ'টেছে।

আমবা আমাদেব ঘাঁটি থেকে দেখ্‌তাম—কয়েক মাইল দূরে ব্রিটিশ সৈন্যদেব জন্য প্যারাসুট যোগে খাদ্য নামিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যায় সে কথা আমাদের সৈন্যরা বেশ ভাল ক'বেই জান্‌ত। যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে না ব'লে তারা কোনদিন অনুযোগ কবে নি—তা'দের অনুযোগ—ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে ভাল খাবার লুঠ ক'রে আন্‌বার অনুমতি কেন তা'দের দেওয়া হচ্ছে না!

হাকা অঞ্চলে ফালমের চেয়ে শত্রুদের কর্ম্মতৎপরতা ও সংখ্যা দুই-ই বেশী। এ এলাকায় শত্রুদের ঘাঁটি ছিল চারটি জায়গায়—সুরখুয়া, জোখুয়া, ক্লাং ও সোপুম। হাকার চারিধারে শত্রু গেরিলার সংখ্যা প্রায় ১২০০, অথচ আমাদের 'পরওয়ানা' কোম্পানীতে মাত্র ১৫০টি সৈন্য।

কোম্পানীর কম্যাণ্ডার লেফ্‌ট, অম্রিক সিংকে বলা হ'ল—

হাকা রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল শত্রুকে প্রথম আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে নিজেরাই অবিরত আক্রমণ ক'রে ওদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলা। তাহ'লে আক্রমণের চেষ্টার চেয়ে ওরা আত্মরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হবে।

এই রীতি অবলম্বন করায় বেশ ভাল ফল হ'ল। মেজর মহবুব আহম্মদ, মেজর রণ সিং এবং লেফ্‌ট, অম্রিক সিংএর সুনেতৃত্বে সৈন্যরা শত্রু-ঘাঁটির পিছনে পর্য্যন্ত রীতিমত টহল দিয়ে তা'দের আত্মরক্ষায় তৎপর ক'রে তুল্‌লে। কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ ছিল না: প্রথম প্রথম শত্রুপক্ষ ভীষণ-ভাবে বাধা দিয়েছে।

১৪ই এপ্রিল তারিখে শত্রুদল আমাদের ক্লাং ক্লাং ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ করে। হাকা শিবির থেকে তোপের আওয়াজ শোন্‌বার সঙ্গে সঙ্গে লেফ্‌ট, অম্রিক সিং কতক-গুলি টহলদার সৈন্য নিয়ে শত্রুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। ব্যাপার বুঝে শত্রুদল এত দ্রুত পালিয়ে যায় যে আমাদের দল তা'দের আর আক্রমণ ক'রতে সুযোগ পায় না।

১৬ই এপ্রিল শত্রুরা আরও দল ভারী ক'রে এসে আমাদের ক্লাং ক্লাং রোডের উপরকার ঘাঁটি আক্রমণ করে। ওদের দলে ছিল প্রায় এক শত সৈন্য, অথচ আমাদের ঘাঁটির সৈন্য-সংখ্যা মাত্র ২০। ওদের সঙ্গে মেশিনগান ত' ছিলই, তা' ছাড়া ছিল তিনটি মর্টার কামান। আমাদের ঘাঁটিটা ওরা সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে, তা' ছাড়া ওরা এতদূর এগিয়ে আসে যে সেখান থেকে আমাদের ঘাঁটির ঘেরাই ৫০ গজের

বেশী নয়। এই ঘাঁটির ভার ছিল লেফ্‌ট, লেহনা সিং-এর উপর। তিনি অবস্থাটা বেশ ধীর চিত্তে বিবেচনা ক'রে শত্রুদের তখনই আক্রমণ করা সাব্যস্ত ক'রলেন। দশটি লোককে ঘাঁটি রক্ষায় নিযুক্ত রেখে বাকি দশটি সৈন্য নিয়ে তিনি আমাদের পাহারা দেবার জায়গায় ওরা যেখানে মেসিনগান পেতেছিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন। তিনি তখনই সে জায়গাটা অধিকার ক'রে নিলেন, তার পর শত্রু-দলের উপর ভীষণ ভাবে গুলিবর্ষণ ক'রতে লাগ্‌লেন। শত্রু-দল বিপদ বুঝে দ্রুত পশ্চাদপসরণ ক'রল। লেফ্‌ট, লেহনা সিং তাঁর সামান্য কয়েকটি অনুচর নিয়ে শত্রুদের পিছু পিছু দশ মাইলেরও বেশী ধাওয়া ক'রে গেলেন। তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে শত্রুদলকে থেমে যুদ্ধ ক'রতে আহ্বান ক'রতে লাগ্‌লেন—কিন্তু শত্রুদের তখন অবস্থা সঙ্গিন—যুদ্ধের চেয়ে আত্মরক্ষার জন্যই তখন তারা বেশী ব্যগ্র। সুতরাং যুদ্ধ ক'রবার জন্য ফিরে না দাঁড়িয়ে তারা ছুটে পালিয়ে গেল।

তিদ্দিমের পতনের পর আমাদের সৈন্যরা সেখানে কি অবস্থায় আছে দেখ্‌বার জন্য ব্রিগেড এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট মেজর মহবুব আহম্মদ ৩০শে মার্চ্চ সেখানে যাত্রা করেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেন—জাপানীরা আমাদের সৈন্যদের রাস্তা চওড়া ক'রবার কাজে নিযুক্ত ক'রেছে। আমাদের ওখানকার সৈন্যরা যে অফিসারের অধীনে ছিল তিনি আমাদের একজন জুনিয়ার অফিসার, তাই জাপানীদের এই আপত্তিকর প্রস্তাবে তিনি সম্মত হ'য়েছিলেন। মেজর মহবুব

ওখানে গিয়েই এ সব বন্ধ ক'রে দিয়ে সৈন্যদের মূল ঘাঁটিতে ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত খবর যখন আমি পেলাম তখন আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে গেল : জাপানীরা আমাদের সাথে ঠিক অকপট ব্যবহার ক'রছে না। ঐ তারিখের রোজনাম্চা (Diary) লিখ্তে গিয়ে আমি এক জায়গায় লিখি—"বুবির (মেজর মহবুবের) কাছ থেকে যে খবর এসেছে তাতে মনটা আমার একেবারে দ'মে গেছে··· এই একতরফা যৌথ শ্রীবৃদ্ধির ফল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে —কে জানে !"

এই সময় এপ্রিলের মাঝামাঝি উভয় পক্ষেই বেশ যুদ্ধ-তৎপরতা দেখা দিলে হাকা-ফালম অধিকার ক'রবার জন্য শত্রুপক্ষ তার সৈন্যদল বাড়াতে লাগ্ল। আমরাও এদিকে কিছু সৈন্য বৃদ্ধি ক'রলাম। কোন্ পক্ষ আগে আক্রমণ সুরু ক'রবে তার জন্য যেন প্রতিযোগিতা চল্তে লাগ্ল।

২৩শে এপ্রিল আমি কতকগুলি টহলদার সৈন্য নিয়ে কোথা থেকে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করা সহজ হবে দেখ্তে বেরুলাম। অতি সাবধানে ধীরে ধীরে আমরা প্রায় শত্রু-সীমানার কাছাকাছি এসে গেলাম। হঠাৎ আমাদের প্রহরী সৈন্যরা খবর দিলে শত্রুসৈন্যের একটি সুসজ্জিত দল আমাদের দিকে এগিয়ে আস্ছে। আমি সাব্যস্ত ক'রলাম—এদের শেষ ক'রতে হবে, তদনুসারে লেফ্ট, লেহনা সিংকে সদলবলে শত্রুর প্রতীক্ষায় আত্মগোপন ক'রে থাক্তে বল্লাম। লেফ্ট, লেহনা সিং তাঁর দলের

লোকদের রাস্তার দু'ধারে যথাস্থানে সন্নিবেশ ক'রলেন। শত্রুদল কোন কিছু সন্দেহ না ক'রে এগিয়ে আস্তেই আমাদের সৈন্যরা হঠাৎ তা'দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। শত্রুসৈন্য কতকগুলি মারা গেল—বাকী হ'ল বন্দী। আমাদের টহলদারী সৈন্যের তৎপরতার ফলে শত্রুসৈন্য প্রথমে তা'দের ঘাঁটিতে ফিরে গেল, তারপর তারা দলবেঁধে এই এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ ক'র্‌ল।

এর আগে নেতাজীর কাছে ইম্ফল আক্রমণ করার অনুমতি চেয়ে আমি এক পত্র লিখেছিলাম, ২৮শে এপ্রিল তার উত্তর এল। তিনি জানিয়েছেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের ১নং ডিভিশানের আজাদ ও গান্ধী ব্রিগেড ইম্ফল আক্রমণ ক'র্‌ছে, সুভাষ ব্রিগ্রেডও যেন প্রস্তুত হ'য়ে থাকে: তা'দের এগিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হ'য়ে যেতে হবে। এই চিঠিতে তিনি ব'লেছেন—ইম্ফল অধিকাব করা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আমাদের সৈন্যরা অধীব চিত্তে প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে কোহিমা থেকে যাত্রা ক'রে ব্রহ্মপুত্র পার হ'য়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রবার হুকুম তাবা কখন পাবে।

১৯৪৪ সালের ১০ই মে আমি আমার অধীনস্থ বিভিন্ন কম্যাণ্ডারকে নির্দ্দেশ দিলাম—ক্লাং ক্লাংএর ব্রিটিশ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রতে। এই ঘাঁটিটি হাকা থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি খুবই দুর্গম, এখানে যাবার পথ একে অতি সঙ্কীর্ণ, তার উপর আবার উপরিস্থ শত্রু-ঘাঁটির সম্পূর্ণ আয়ত্তে। এখানে যাবার আর যে সব পথ আছে তা' আরও

দুর্গম—একেবারে খাড়া পাহাড়। এই দুর্ভেদ্য স্থানে প্রধান ঘাঁটি ক'রে ব্রিটিশেরা তা'দের গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা ক'রছিল। ওখানে খাবার জিনিষপত্র ওরা প্রচুর মজুত ক'রেছে—এ খবর আমরা পেয়েছিলাম। এর আগে জাপানীরা যখন হাকায় ছিল তখন তারা এ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রতে সাহস করে নি। হাকায় আমাদের ঘাঁটিতে অবস্থিত কয়েকজন জাপানী লিয়াজং অফিসার আমায় অনুরোধ ক'রলেন—আমি যেন ক্লাং ক্লাংএর ঘাঁটি আক্রমণ করার চেষ্টা না করি, কারণ এ আক্রমণ চালাতে হ'লে যে সব আগ্নেয়াস্ত্র এবং এরোপ্লেনের প্রয়োজন তা' আমাদের নেই।

যে সব কম্যাণ্ডারদের ক্লাং ক্লাং ঘাঁটি আক্রমণ ক'রতে হুকুম দিয়েছিলাম তাঁ'দের নিয়ে ১২ই মে তারিখে আমি ঐ অঞ্চলটা একটু ভাল ক'রে দেখ্‌তে বেরুলাম। সারাদিনে আমরা ২৮ মাইল ঘুরে সন্ধ্যাকালে হাকায় ফিরে এলাম। সেই সন্ধ্যায়ই আমাকে জানানো হয়—আমাকে অবিলম্বে ইন্দাইনগাইতে জাপানীজ ডিভিশনাল হেড্‌ কোয়ার্টার্সে গিয়ে আমাদের রেজিমেণ্টকে নতুন কি কাজের ভার দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ নিতে হবে। হাকা থেকে আমি ৯০ মাইল দূরে নাউছয়াং-এ আমাদের তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানকে টেলিফোন যোগে জানাই—তারা অবিলম্বে যেন উখরুলে যাত্রা করে।

মেজর রাম স্বরূপ এবং ব্রিগেড হেড্‌ কোয়ার্টার্সের আরও কয়েকজনকে নিয়ে ১৪ই মে তারিখে আমি হাকা

কর্নেল মহবুব আহমেদ তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে "ব্র্যাং ব্যা" ঘাঁটি আক্রমণের আদেশ দিতেছেন।

আজাদ হিন্দ সৈন্যদলের যুদ্ধ-যাত্রা

আজাদ হিন্দ সৈন্যদল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।

থেকে নাওছয়াঙে যাত্রা করি। গন্তব্য স্থান হাকা থেকে ৮৫ মাইল। এই ৮৫ মাইল পথ আমরা পায়ে হেঁটে দুই দিনে অতিক্রম করি।

ইত্যবসরে আমি নির্দ্দেশ দেই—ক্লাং ক্লাং ঘাঁটি আক্রমণ পরিচালনা ক'রবেন মেজর মহবুব আহম্মদ। আক্রমণকারী সৈন্যের প্রধান দল ১৪ই মে তারিখেই হাকা থেকে রওয়ানা হয়। সন্ধ্যার কাছাকাছি তারা ক্লাং ঘাঁটি যাবার পথে অবস্থিত ব্রিটিশদের আর একটা ঘাঁটি আক্রমণ করে। এ ঘাঁটিটা পূর্ব্বোক্ত ঘাঁটির রক্ষা কাজেই এখানে স্থাপিত। এ ঘাঁটিটা অধিকার ক'রতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। এর পর সারারাত্রি ধরে আমাদের সৈন্যদল ক্লাং ক্লাং ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চল্‌ল। ১৫ই মে ভোর ৪টার কাছাকাছি তারা ব্রিটিশের প্রধান ঘাঁটির কাছাকাছি এসে গেল। মেজর মহবুব আহম্মদ ঘাঁটিটা ঘিরে ফেলতে চেষ্টা ক'রলেন কিন্তু পেরে উঠলেন না: চারিদিকেই খাড়া পাহাড়। ঘাঁটিতে উঠবার যে পথ দেখা যাচ্ছে তার দিকে মুখ ক'রে উপরে শত্রুদের কামান সাজানো। ব্যাপার বড় সুবিধার মনে হ'ল না। সব দেখে শুনে মেজর মহবুব ঠিক ক'রলেন—তিনি সামনাসামনি আক্রমণ ক'রবেন। তদনুসারে তিনি ক্যাপ্টেন অম্রিক সিং, শহীদ-ই-ভারত এবং আট দশ জন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের খাড়া পথে অতি ধীরে ধীরে শম্বুক গতিতে গুড়ি মেরে উঠতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে তখন আকাশে চাঁদ উঠেছিল;

সুতরাং রাত্রির প্রথম দিকের চেয়ে তারা তখন অনেক ভাল দেখতে পাচ্ছিলেন। বড়ই দুঃসাহসের কাজে হাত দিয়েছিলেন—তাঁরা : পা যদি কোন রকমে একটু পিছ্‌লে যায় তা'হলে তখনই শত শত হাত নিম্নে নালায় গড়িয়ে পড়ে অবধারিত মৃত্যু।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা শত্রুদের চোখে পড়েন নি। শত্রুরা ভাবতেই পারে নি এদিককার এই দুর্গম পথে কেউ কোনদিন ঘাঁটি আক্রমণ ক'রবার সাহস ক'রতে পারে। অনেক কষ্টে অবশেষে তাঁরা শত্রু পরিখার কাছে এসে গেলেন। চড়াই-এর কষ্ট শেষ হ'ল বটে, কিন্তু এইখানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদল তাঁদের দেখে ফেল্‌লে,—অমনি তাঁদের উপর ভীষণ গুলি বর্ষণ সুরু হ'ল। আমাদের দল নিজেদের আড়াল ক'রে শত্রুদের গুলিবর্ষণের প্রত্যুত্তর দিতে লাগ্‌ল। আমাদের মেশিনগানগুলির দ্রুত গুলিবর্ষণে ওদের আগ্নেয়াস্ত্র শীঘ্রই নীরব হ'ল। এর পর ক্যাপ্টেন অম্রিক সিং-এর দল আর একটু এগিয়ে গেল। কিন্তু এ অবস্থায় শত্রুপক্ষের চুপ ক'রে থাকবার কথা নয়। একটু পরেই অন্যান্য পরিখা থেকে শত্রুদল রাইফেল ও মেশিনগান চালাতে লাগল। ক্যাপ্টেন অম্রিক সিং তখন নিজের দলের লোককে জড় ক'রে দুই হাতে হাত বোমা নিয়ে অতি উচ্চ জয় হিন্দ রবে শত্রুর হৃদয় প্রকম্পিত ক'রে তা'দের উপর চড়াও হ'লেন। তার পর সেখানে দুই হাতের হাত বোমা নিক্ষেপ ক'রে চিরকালের জন্য তা'দের নীরব ক'রে দিলেন। এমনি ক'রে ঘাঁটির পরিধি ভেদ

করা হ'ল, এর পর যুদ্ধ চল্‌ল শিবিরের ভিতরে। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণপণে লড়বার পর অবশেষে শত্রুদল ঘাঁটি ছেড়ে নীচে পালাতে সুরু ক'রলে : আমাদের সৈন্যরা তখনও তা'দের উপর অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়্‌ছে।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক কুয়াশায় একেবারে ছেয়ে গেল। রাত্রে যে পাহাড়ের চূড়ায় এমন রক্তারক্তি ব্যাপার চলেছে তার চতুর্দ্দিকে ঘন কুয়াশার আস্তরণ। ক্রমে বেলা বাড়তে কুয়াশা গেল কেটে—হাকার লোক সব তাকিয়ে দেখ্‌লে, যে ঘাঁটি আগের রাত্রেও ব্রিটিশ পক্ষের দখলে ছিল সেখানে মহা গৌরবে উড়ছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত আজাদ হিন্দের জাতীয় পতাকা।

মেজর মহবুব সাঙ্কেতিক সংবাদে হাকায় জানালেন—“প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও আমরা শত্রুঘাঁটি দখল ক'রেছি। শত্রুদলের অনেকে হতাহত হওয়ার পর তারা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছে—যাবার সময় তারা অনেক টিনে রক্ষিত সুস্বাদু ফল, মাখন, জ্যাম, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি ফেলে গেছে, সেগুলি এখন আমাদের”। এই খবর আবার তখনই সঙ্কেতে ফালমের ‘রেজিমেণ্টাল’ ঘাঁটিতে পাঠানো হ'ল। সেখানে থেকে মেজর মহবুবের কাছে নির্দ্দেশ এল শত্রুশিবির বিনষ্ট করে হাকায় ফিরে যেতে। এরূপ নির্দ্দেশের এই কারণ যে ব্রিগেডের কর্ম্মসূচীর পরিবর্ত্তন করা হ'য়েছে।

ব্রিগেডের প্রতি নব-নির্দ্দেশ এইরূপ :—

“ব্রিগেডের প্রধান অংশ প্রথমে কোহিমায় যাবে, তারপর

ইম্ফলের পতন হ'লে, এই দল দ্রুত ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম ক'রে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রবে"।

হাকা-ফালম অঞ্চল রক্ষা করা এবং কোহিমা ও ইম্ফলে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সরবরাহের পথ যাতে ব্রিটিশ গেরিলা-বাহিনী ছিন্ন না করে তা' দেখার ভার ১নং রেজিমেণ্টের (সুভাষ ব্রিগেডের) উপরই রইল। এইসব কর্ত্তব্য পালনের জন্য আমি হাকাতে ১৫০ এবং ফালমে ৩০০ সৈন্য রেখে দিলাম। আমি এই সময়ে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম—কাজ আরম্ভ ক'রতে আমাদের খুব দেরী হয়ে গেছে। বর্ষাকাল এর মধ্যেই প্রায় সুরু হয়ে গেছে। ইম্ফলে জাপানীরা ব্রিটিশ সৈন্যদলকে অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে বটে কিন্তু এরোপ্লেনের সাহায্যে নতুন ভারতীয় সৈন্যদল আমদানী ক'রে ব্রিটিশ সৈন্যদল নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি ক'রেছে। জাপানী বিমান বাহিনী এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে পাঠান হয়েছে। তা' ছাড়া একটি শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনী দিমাপুর ও কোহিমার ওদিক থেকে পাল্টা আক্রমণ চালাতে সুরু ক'রেছে। ওখানকার জাপানী সৈন্যদল বিশেষ বিপন্ন অবস্থায় কাল কাটাচ্ছে। এদের সাহায্যের জন্যই ১নং রেজিমেণ্টকে কোহিমার দিকে অগ্রসর হ'তে বলা হয়েছে। আমাদের সৈন্যেরা এই নতুন ব্যবস্থার কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল : বহুদিন ধরে এরূপ একটা শুভদিনের প্রতীক্ষাই তারা ক'রছিল।

এই সময় কালেমিও অঞ্চলে যত সৈন্য ছিল তা'দের সবাই

প্রায় দারুণ ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল এবং তা'দের শতকরা প্রায় ৭০ জন ছিল হাসপাতালে, কিন্তু কোহিমা যাত্রার উদ্যোগ-কালে দেখা গেল—দলে দলে সব ম্যালেরিয়ার রোগী হাসপাতালের শয্যা থেকে উঠে এসে লরী অধিকার ক'রে বসেছে। মোট কথা—তারা এখানে কিছুতেই পড়ে থাকতে চায় না, যুদ্ধে তারা যাবেই। মাইথা-হাকা থেকে তামু পর্য্যন্ত অধিকাংশ পথ আমাদের সৈন্যেরা জাপানী লরীতে করে গিয়েছিল।

তামু থেকে হুমাইন, উখরুল এবং সেখান থেকে খারাসম ও কোহিমা তারা পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। কোহিমায় গিয়ে সেখানকার পাহাড়ে তারা ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ালে। এদিকে ব্রিটিশদের শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি হওয়ায় তারা দিনের পর দিন জোর পাল্টা আক্রমণ স্থরু ক'রলে। আমাদের সৈন্যেরাও বীর বিক্রমে তা'দের সেই প্রবল আক্রমণ পরপর প্রতিহত ক'রতে লাগল।

এরপর ভীষণ বর্ষা স্থরু হয়ে গেল। একটা কাঁচা পাহাড়ে পথে আমাদের রসদ আমদানী করা হ'ত, প্রবল বারি-পাতে সে পথ একবারে ধ্বসে গেল,—ফলে সর্ব্ব-প্রকারের সরবরাহ বন্ধ হল। ক্রমে আমাদের রসদও ফুরিয়ে গেল। সৈন্যরা নাগা পল্লী থেকে অনেক কষ্টে দুটি দুটি চাল সংগ্রহ ক'রে আনত,—জঙ্গলী-ঘাসের সঙ্গে তাই সিদ্ধ ক'রে খেয়ে কোন রকমে তারা প্রাণধারণ ক'রত। এর সঙ্গে খেতে একটু মুন পর্য্যন্ত তা'দের জোটে নি। হপ্তার পর হপ্তা এই রকম

খাবার খেয়ে খেয়ে ক্রমে তারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল,—কিন্তু তবুও ব্রিটিশদের সামনে থেকে পশ্চাদপসরণের কথা তা'দের একবারও মনে হয় নি।

ওষুধ-পত্রও সব শেষ হয়ে গেল। ডাক্তারেরা যা দিয়ে রোগীর চিকিৎসা ক'রবেন—এমন কিছুই নেই। তার উপর আবার সেই জঙ্গলে অসংখ্য বড় বড় মাছি,—মানুষ বা জন্তুর দেহে কোথাও একটু ক্ষত স্থান পেলে অমনি তারা সেখানে গিয়ে বসবে এবং আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে সেই ঘায়ে হবে রাশি রাশি পোকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহ্য যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সৈন্যরা নিজের হাতে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করেছে।

আমাদের সৈন্যেরা যখন এই অবস্থায় কাল কাটাচ্ছিল তখন ৪ঠা জুন তারিখে ঐ এলাকার জাপানী সৈন্যদলের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে শুনলাম যে তাঁর ডিভিশানের কর্ম্মসূচী পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। ঐ ডিভিশান এখন আবার উখরুলে ফিরে যাচ্ছে। আমার ব্রিগেড তাঁর ঐ ডিভিশানেরই অন্তর্গত—সুতরাং আমাদের তিনি ওখানেই ফিরে যেতে বল্‌লেন। শুনে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম—এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ভারতভূমিতে যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা একবার আমরা উত্তোলিত করেছি—সে পতাকা আমরা অপসারিত করি কি করে?—যে ব্রিটিশদের আমরা প্রতি যুদ্ধে পরাস্ত করেছি তা'দের সামনে থেকে পশ্চা-

দপসরণই বা করি কি করে? বস্তুতঃ আমাদের সৈন্যরা এখান থেকে এক পা সরতে রাজী নয়। ব্যাপার বুঝে জাপানী কম্যাণ্ডার আমাদের সরাতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন।

তিনি আমায় বল্‌লেন—ইম্ফলের চতুর্দ্দিকের আজাদ হিন্দ ও জাপানী সৈন্যরা ইম্ফল অধিকার ক'রতে পারে নি, তাঁর উপর আদেশ হয়েছে—তিনি ১নং রেজিমেণ্টের সহযোগিতায় ইম্ফল আক্রমণ ক'রে অধিকার ক'রবেন। তিনি, আমরা এই আক্রমণে কোন্ কাজের ভার নেব তা' নির্দ্ধারণ ক'রতে অনুরোধ ক'রলেন। এই সময়কার কথা আমার রোজনামচায় (Diary) লিখ্‌তে গিয়ে লিখেছি—"আমি ইম্ফল আক্রমণই সাব্যস্ত ক'রলাম। আমাকে আশ্বাস দেওয়া হ'য়েছিল—ইম্ফল অধিকারের পর আবার আমরা এগিয়ে আসতে পাব। এই আশ্বাসের উপর নির্ভব করেই আমার সৈন্যদের বলে কয়ে উখরুলে ফিরে যেতে রাজী করাই। সেখান থেকে উখরুল-ইম্ফল সড়ক বেয়ে গিয়ে ইম্ফল আক্রমণ ক'রতে হবে আমাদের। যথা সময়ে উখরুলে এসে আমি নানা দিকে সন্ধানী দল পাঠালাম—ইম্ফলে যাবার পথের খোঁজে। দু'দিন পরে জাপানী জেনাবেল এলে আমি ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্সে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রলাম। তিনি আমাকে জানালেন—ওখানকার অবস্থার বিশেষ অবনতি হয়েছে: প্রবল বৃষ্টির জন্য সরবরাহ বিভাগ ও অঞ্চলের সৈন্যদের রসদ যোগাতে পারছেন না। তিনি সেইজন্য তামু-সিত্তায়ঙ (Tamu and Sittaung) অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছেন,—

সেখানে গেলে শুধু ছিন্দুইন (Chindwin) নদী পথে নৌকা যোগে রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা হতে পারে। এ ছাড়া জাপানীদের রসদ পাবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। আমি তাঁকে তখনই শুনিয়ে দিলাম, তিনি তাহ'লে মিথ্যা আদেশ দিয়ে আমাকে প্রতারণা করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ১নং ডিভিশান আগের এপ্রিল মাস থেকে তখন পর্য্যন্ত প্যালেল অঞ্চলে যুদ্ধ ক'রছিল—আমি তাঁকে অনুরোধ ক'রলাম—আমার ব্রিগ্রেড যাতে অবিলম্বে ঐ দলে গিয়ে মিশতে পারে তার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—এ ব্যবস্থা তিনি ক'রবেন"।

২২শে জুন তিনি আমায় আদেশ দিলেন—তামুতে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১নং ডিভিশানের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হ'তে—তদনুসারে আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন সুরু হ'ল। এই সময়ে কোহিমা থেকে প্রত্যাবর্ত্তন যে কি কঠিন কাজ তা' বলে বোঝানো যায় না,—কোন দেশের কোন সৈন্যদলেরই বুঝি এমন কঠিন পশ্চাদপসরণ কোনদিন ক'রতে হয় নি। প্রবল বারিপাতে রাস্তাঘাট সব ধুয়ে মুছে গেছে। যে সব নতুন রাস্তা তৈরী করা হলো তাতে প্রায় এক হাঁটু কাদা, দলের অনেক লোক পথ চলতে ঐ কাদায় আটকে পড়ে মারা গেল। এই সময় যানবাহনের কোন রকম ব্যবস্থা আমাদের ছিল না,—তা' ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই আমাশয় আর ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। কারো শরীরেই এমন সামর্থ্য ছিল না যে অপরকে সাহায্য করে। যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত

—কিন্তু ব্যস্ত হয়েই বা কি ক'রবে—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। এই সময় সৈন্যদের—চার দিন আগে মরেছে এমন ঘোড়ার মাংস খেতে দেখেছি আমি। রাস্তার দু'ধারে শত শত জাপানী আর ভারতীয় সৈন্যের মৃত-দেহ পড়ে রয়েছে। এদের কেউ বা মরেছে ক্লান্তিতে, কেউ অনাহারে, কেউ বা রোগে, আবার কেউ বা এত যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করেছে। তা' ছাড়া ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যাই অনেকে শ্রেয়ঃ মনে ক'রেছে।

নিদারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মনের বল নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে ব্রিটিশরা এই সময় তা'দের প্রলুব্ধ ক'রে দলে টানতে চেষ্টা ক'রত। ব্রিটিশ কম্যাণ্ডারের নাম সই করা রাশি রাশি ছাপা কাগজ তারা এরোপ্লেন থেকে এদের মাঝে ছড়াত। তাতে যা লেখা থাকত তার মর্ম্মার্থ এইরূপ— "আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ তোমাদের গুলিবারুদ নেই, ওষুধপত্র নেই, খাবার নেই,—জঙ্গলের ঘাস খেয়ে বন্য জন্তুর জীবন তোমরা যাপন ক'রছ। আমাদের দলে এস, ভাল খেতে পাবে, পরতে পাবে, ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা পাবে, তা'ছাড়া ভাল বেতন পাবে, সবার শেষে পাবে—পুরস্কার। তোমরা এত পাষাণ হয়েছ কেন? তোমাদের ছেলেমেয়ে তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। আমাদের কাছে এস, আমরা তোমাদের তিন মাসের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠাব। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—সত্যি

তোমরা এ সব পাবে। ভয় পেওনা, এস আমরা তোমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা ক'রে গ্রহণ করব"। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরা তখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হ'য়েছিল— সুতরাং এ প্রলোভন জয় করা তা'দের পক্ষে কতই না কঠিন। তবু এক বাক্যে তারা সবাই এর উত্তরে বলেছিল—"আমরা বরং পশুর মত বনের ঘাস খেয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করব, তবুও সুখাদ্য খাবার বা নিজেদের সন্তান-সন্ততির কাছে যাবার লোভে ব্রিটিশের ক্রীতদাস হ'য়ে মান খোয়াব না"। সত্যি তারা মান খোয়ানোর চেয়ে মৃত্যুকে অধিকতর কাম্য বলে মনে করেছিল।

এমনি ক'রে হাঁটু সমান কাদা-পাঁকের পথে গুলি-গোলা খেয়ে মেশিনগানের অগ্নিবর্ষণের ভিতর দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈন্যদলকে পায়ে হেঁটে পশ্চাদপসরণ ক'রতে হয়েছিল। আফিসারেরা নিজেরা কষ্ট বরণ ক'রে সৈন্যদেরও ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রতে উৎসাহ দিতেন, এর বেশী কিছু ক'রবার সাধ্য তাঁ'দের ছিল না। সুভাষ ব্রিগেডের সৈন্যদল কোহিমা থেকে কয়েক শ' মাইল এমনি ক'রে এসে অবশেষে তামুতে পৌঁছল। তা'দের অনেকে অবশ্য পথেই মারা যায়, যারা বেঁচে রইল তা'দের একমাত্র আশা প্যালেল (Palel) রণাঙ্গনে গিয়ে তারা গান্ধী ও আজাদ ব্রিগেডের সৈন্যদের সাহায্য ক'রবে। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, এ আশাও তা'দের পূর্ণ হ'ল না। তামুতে গিয়ে তারা শুনলে ১নং ডিভিশানের সঙ্গে তা'দের যুক্ত করা হবে না, তা'দের রাখা হবে সাধারণ

রিজার্ভ বাহিনী হিসাবে জাপানী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের অধীনে। এইবার আমাদের চোখ খুলল, আমরা বুঝলাম জাপানীরা আমাদের আর একবার প্রতারণা ক'রল।

কয়েক দিন পরে খবর পেলাম সমগ্র জাপানী সৈন্য-বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে চিন্দুইন নদীর পূর্ব্ব তীরে ফিরে যেতে হবে। এই কথা শুনে আজাদ হিন্দ সৈন্যদের মন একেবারে দমে গেল,— কারণ তারা বুঝলে যে আমাদের যুদ্ধ অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

সৈন্যদলের পক্ষ থেকে কয়েকজন অফিসার ও সৈনিক আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বল্‌লেন,—যাদের এখনও দু'চার মাইল হাঁটবার মত ক্ষমতা আছে তারা যদি শত্রুদের আক্রমণ ক'রে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে প্রাণ দিতে পারে তা' হ'লেই তা'দের মুখ রক্ষা হয়। অসুস্থ সৈন্যরা যখন এমনিও মারা যাবে, তখন যুদ্ধ ক'রে মরাই তা'দের ভাল। আমি তাঁ'দের এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম,—কিন্তু জাপানী লিয়াজঁ অফিসার আমাদের এই অভিপ্রায় জানতে পেরে নেতাজীর কাছে বিশেষ জরুরী খবর পাঠালেন। নেতাজী এই খবর পেয়ে আমাকে পশ্চাদপসরণের জন্য কড়া হুকুম দিলেন। সৈনিক হিসাবে তাঁর এই আদেশ মেনে কালেওয়াতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল না। এই উপলক্ষে নেতাজী সৈন্যবাহিনীর প্রতি তাঁর যে বিশেষ বাণী ঘোষণা করেন তাহা এইরূপ :—

"আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গীগণ,

এই বৎসর মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আজাদ হিন্দ ফৌজের

অগ্রগামী সৈন্যদল তা'দের মিত্র পক্ষীয় রাজকীয় নিপ্পন বাহিনীর সঙ্গে একযোগে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত পার হয়ে ভারতভূমিকেই রণাঙ্গন ক'রে ভারতের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শতাধিক বর্ষ ধরে ভারতকে নির্ম্মমভাবে শোষণ ক'রে ও বিদেশ থেকে সৈন্য আমদানী ক'রে প্রভূত শক্তিশালী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমাদের সৈন্যদল ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত পার হয়ে মহান উদ্দেশ্যের প্রেরণায় তা'দের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুসজ্জিত অথচ বিভিন্ন জাতীয় সৈন্যে গঠিত বাহিণীর সঙ্গে লড়ে প্রতি যুদ্ধে তা'দের পরাজিত করেছে। আমাদের সৈন্যদলের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল ছিল, তা' ছাড়া তারা নিয়ম শৃঙ্খলা বিশেষ মেনে চলত। স্বদেশের মুক্তির জন্য তারা দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিল—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। এই সব নানা কারণে শত্রুদল তা'দের সঙ্গে এটে উঠতে পারত না,—যুদ্ধের পর যুদ্ধে হেরে গিয়ে তা'দের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নানা বিপদ-সঙ্কুল ও কষ্টকর অবস্থার মাঝে যুদ্ধ ক'রে আমাদের অফিসার ও সৈন্যগণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা লাভ করেছেন। হৃদয়ের শোণিত দিয়ে ও নানা কষ্ট বরণ ক'রে এই বীরপুরুষেরা যে আত্মত্যাগের আদর্শ দেখিয়েছেন পরবর্ত্তী যুগের স্বাধীন ভারতের সৈনিকদের বিশেষ ভাবে সেই উচ্চ আদর্শ রক্ষা ক'রতে হবে। আমাদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'বার পর আমরা ইম্ফল আক্রমণ ক'রতে

যাব, এমন সময় ভীষণ বর্ষা সুরু হয়ে গেল, ফলে ইম্ফল আক্রমণ ক'রে দখল করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল। সমগ্র বর্ষাকালটা আক্রমণ বন্ধ রাখতে হবে,—পরে আরও দেখা গেল—আমাদের সৈন্যদল যেখানে অবস্থান ক'রছিল সেখানে তা'দের রাখারও অসুবিধা, সুতরাং আমাদের সৈন্যদলকে ওখান থেকে সরিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে থেকে আত্মরক্ষা করা হবে সহজ। এখানে থেকে এই যুদ্ধ-বিরতির সময়টায় আমাদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রতে হবে, যাতে বর্ষাকাল শেষ হলেই আমরা আবার অক্রমণ সুরু ক'রতে পারি। রণাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে শত্রুকে পরাজিত ক'রে ভবিষ্যৎ বিজয় এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য বাহিণীকে ধ্বংস করা সম্বন্ধে আমাদের আত্মপ্রত্যয় দশ গুণ বেড়ে গেছে। আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই আমরা আবার প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুদলকে আক্রমণ ক'রব। আমাদের অফিসার ও সৈন্যদের অপূর্ব্ব রণকৌশল, অদম্য সাহস এবং অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বলে বিজয় লাভ আমরা ক'রবই।

আমাদের যে সব বীরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন তাঁ'দের আত্মা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের অধিকতর সাহস ও বীরত্বের কাজে অনুপ্রাণিত করুক—এই প্রার্থনা করি। জয় হিন্দ"।

তামু থেকে কালেওয়ায় সৈন্যদল সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাপানী হেড্ কোয়ার্টার্স থেকে আমার উপর এইরূপ

আদেশ দেওয়া হয় :—"১ নং রেজিমেণ্টকে এখান থেকে ১৫০ মাইল দূরে কালেওয়ায় স্থানান্তরিত ক'রতে হবে।

তামু থেকে আহ্‌লো (Ahlow) ২৫ মাইল। রেজিমেণ্ট প্রথমে এইখানে যাবে। অসুস্থ রোগীদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা রেজিমেণ্টকেই ক'রতে হবে।"

আহ্‌লো থেকে তেরায়ুন (Teraun) যাবার সময় জাপানীরা আমাদের ৪০০ জন অসুস্থ সৈন্যের জন্য নৌকা প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে দেবে—অবশিষ্ট সৈন্যদের পদব্রজে যেতে হবে। তেরায়ুনে উপস্থিত হবার পর জাপানীরা আমাদের সমগ্র বাহিনীর জন্যই কালেওয়া পর্য্যন্ত নৌকাদির ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

এই সময়ে গান্ধী ও আজাদ ব্রিগেডের সৈন্যদলকেও কালেওয়ার দিয়ে আসতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তা'দের আসতে হবে তামু-ইয়েজেগিও (Yezagyo)-কালেওয়া সড়ক দিয়ে।

তামু থেকে কতকগুলি গরুর গাড়ী যোগাড় ক'রে তারই উপর আমাদের অসুস্থ সৈন্যদের চড়িয়ে য়ু (Yu) নদীর তীরে আহ্‌লোতে নিয়ে আসি।

এখানে এসে দেখি বর্ষার জলে নদী কানায়কানায় ভরা, অথচ পার হবার জন্য একখানা নৌকার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নেই। পুরো সাতটা দিন নদীর এপারে আমদের ঠায় বসে থাকতে হয়। পরে ব্রহ্মদেশীয় কয়েকখানা নৌকার সাহায্যে আমাদের সৈন্যেরা নদী পার হয়। এই সময় আমাদের রসদ একেবারে

শেষ হয়ে গিয়েছিল,—নতুন রসদ পাবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। আশে পাশের গ্রামে সামান্য যা কিছু পাওয়া যেত জাপানীরা এর আগেই তা' জোর করে নিয়ে গেছে,—আজাদ হিন্দ ফৌজের রসদের ব্যবস্থা নিজেদের যেমন ক'রে হয় করে নিতে হবে। এই অবস্থায় থাকবার সময় ৭ই জুলাই-এর রোজনামচায় আমি লিখি—"আমাদের সৈন্যেরা রসদ পাচ্ছে না…৪জন গাড়োয়ালীর অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। রসদের কোন একটা ব্যবস্থা ক'রতে আমরা জাপানীদের অনুরোধ করেছিলাম, তারা আমাদের কথায় একেবারে কান দিলে না। ইচ্ছে ক'রে আমাদের সৈন্যদের না খাইয়ে মারায় ওদের কি স্বার্থ থাকতে পারে বুঝছি না"।

এইরূপ অনাহারে ভীষণ বর্ষার মধ্যে হাটু সমান কাদা ভেঙ্গে মারাত্মক ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশা ও বিষধর জোঁকে ভরা নিবিড় অরণ্য পথে আমাদের সৈন্যদের পাশ্চাদপসরণ ক'রতে হয়।

এই সময় আমাদের অন্যান্য সকল প্রকার বিধিব্যবস্থাও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারদের ওষুধ ছিল না যে চিকিৎসা ক'রবেন, তা' ছাড়া তাঁরা নিজেরাও ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ে ভুগছিলেন। আশেপাশের জঙ্গলে বড় বড় সব মাছি মানুষের মৃতদেহের উপর বসে দিবারাত্র ভন ভন ক'রত। এ ছাড়া আরও কত রকম বীভৎস দৃশ্য যে দেখা যেত তা' বর্ণনা করা যায় না। যে একবার এ সব দৃশ্য দেখেছে জীবনে সে তা' কখনও ভুলতে পারবে না।

পশ্চাদপসরণের পথে একবার আমি দেখি একধারে এক যুদ্ধে-আহত সৈনিক পড়ে রয়েছে। কয়েক মাইল হেঁটে যাবার পর সে আর চলতে পারছে না। পথের ধারে পড়ে থেকে মৃত্যু এসে কখন তার সকল জ্বালার অবসান ক'রে দেয় তারই অপেক্ষা সে ক'রছে। ক্ষত স্থানে তার পোকা কিলবিল ক'রছে,— মৃত্যুর আর বড় বেশী দেরী নেই। আমি তার কাছে গেলে সে চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে, তার পর সে একবার উঠতে চেষ্টা ক'রল। কিন্তু ওঠবার তার শক্তি ছিল না; সুতরাং সে আমাকে তার পাশে বসতে ইঙ্গিত ক'রলে। এমনি ক'রে আমায় কাছে বসিয়ে সে বল্‌লে, সে আমার কাছে কয়েকটি কথা বলতে চায় যা তার হয়ে আমাকে নেতাজীর কাছে বলতে হবে। কথাগুলি বল্‌বার সময় তার দুই চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগ্‌ল। সে বল্‌লে—"সাহেব, আপনি ত ফিরে যাচ্ছেন—নেতাজীর সঙ্গে আপনার দেখা হবে, কিন্তু আমার আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁকে আমার 'জয় হিন্দ' জানিয়ে বল্‌বেন— তাঁর কাছে আমি যে অঙ্গীকার ক'রেছিলাম সে অঙ্গীকার আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছি। কি ক'রে আমার মৃত্যু হ'ল সে কথা আপনি তাঁকে খুলে বল্‌বেন: আমার জীবন্ত অবস্থাতেই আমার দেহ পোকায় কেমন কুরে কুরে খেয়েছে সে কথা বল্‌বেন। আর এ কথাও তাঁকে বল্‌বেন—এই নিদারুণ যন্ত্রণার মাঝেও এক দিব্য আনন্দ ও অপূর্ব্ব শান্তি পাচ্ছি আমি মনে: কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার মনে হচ্ছে—আমি

আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিচ্ছি।” এই শুধু একটি নয়—প্রতিদিন এইরূপ শত শত ঘটনা ঘট্‌ত। সৈন্যেরা এতখানি মনের বল যে কি ক'রে পেল ভাব্‌লে আশ্চর্য্য বোধ হয়—মুমূর্ষু সৈন্যেরা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নেতাজী এবং তাঁর কাছে তারা যে অঙ্গীকার ক'রেছে তার কথা ভুল্‌তে পারে নি।

আমি বহুবার দেখেছি—আমাশয় আর বেরিবেরিতে ভুগে সৈন্যদের মুখ ও পা ভীষণভাবে ফুলে গিয়েছে—এত দুর্ব্বল যে এক পা আর তা'দের চল্‌বার শক্তি নেই। এই অবস্থায় তা'দের অফিসার এসে বল্‌লেন—“নেতাজীর কাছে কি অঙ্গীকার করেছ তা' কি তোমরা এর মধ্যেই ভুলে গেলে? বীরের মত তোমরা সকল দুঃখকষ্ট অকাতরে সহ্য কর্‌বে—এই তোমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল না? এখান থেকে ৫০ মাইল দূরে কালেওয়াতে আমাদের নেতাজী আমাদের পথ চেয়ে ব'সে আছেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না তোমাদের?” এই সব ব'লে অফিসার যেই তা'দের উঠে চল্‌তে হুকুম দিতেন—অমনি যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের শক্তিতে তা'দের নির্জ্জীব দেহে কত বল ফিরে আস্‌ত। আমি এমনও দেখেছি অনেক রুগ্ন সৈনিক নেতাজীকে একবার দেখ্‌বার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে এই ৫০ মাইল পথ অতিক্রম কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। অনেকে এমনি ক'রে এই ৫০ মাইল পথ গেছে এবং গিয়ে নেতাজীকে দেখ্‌বামাত্র তা'দের অনেকে হাসিমুখে মারা গেছে:

তা'দের মনে এই শান্তি যে তা'দের পরম প্রিয় নেতাজীর দেখা তারা পেয়েছে।

আহ্‌লোতে জাপানীরা আমাদের কাছে এসে বল্‌লে—ওখান থেকে রেজিমেণ্টকে মার্চ্চ করিয়ে তেরায়ুনে নিয়ে যেতে হবে, সেখানে গেলে সকলেরই নদীপথে যাওয়ার ব্যবস্থা তারা ক'রে দেবে। আহ্‌লো থেকে তেরায়ুন ২৫ মাইল পথ—এই পথ আমরা আমাদের প্রায় ৬০০ রুগ্ন সৈন্যকে নিয়ে মার্চ্চ ক'রে গেলাম। পথের ক্লান্তি ও অনাহারে অনেকে মারা গেল। অবশেষে আর সবাই তেরায়ুনে গিয়ে হাজির হ'ল। এইখানে গিয়ে আমাদের নদীপথে যাবার জন্য নৌকা প্রভৃতি পাবার কথা ছিল কিন্তু তেরায়ুনে গিয়ে দেখা গেল য়ু-নদী পার হবার জন্য একখানা নৌকার ব্যবস্থাও আমাদের জন্য করা হয় নি।

তেরায়ুনে য়ু-নদীর তীরে ছোট্ট একটা সেনানিবাস ছিল। ছিন্দুইন নদীতীরে অবস্থিত তামু-য়ুয়া (Tamu-Yuwa) থেকে যে পাহাড়ে রাস্তাটা এখান দিয়ে গিয়েছে তারই ধারে এই সেনানিবাস। জাপানীদের এখানে একটা সরবরাহ কেন্দ্রও ছিল। জাপানী টইলদার ও ব্যূহভেদকারী সৈন্যদল এই পথেই আগে যাতায়াত ক'রেছে।

প্রবল বর্ষায় য়ু-নদীতে বন্যা এসেছে। নদীর তলদেশ পাথরে ভরা—পাড় খাড়া, স্থানে স্থানে স্রোতের ভীষণ বেগ, সুতরাং সুদক্ষ সাহসী মাঝি ছাড়া অপর কেউ এখানে নৌকা চালাতে পারে না। তা' ছাড়া সব নৌকাও এখানে চলে না।

বিশেষ ধরণের নৌকা—ছিন্দুইন নদীর জল যখন য়ু-নদীর জল তলের উপরে উঠে য়ুতে এসে পড়ে—তখনই এখানে চালানো যায়।

এখানে এসে নদী পার হ'তে না পেরে আমরা আটক প'ড়ে গেলাম। আমরা চারিদিকে যেন আঁধার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। রসদের বরাদ্দ ভীষণ কম: প্রত্যেক সৈন্যের প্রতিদিনের রসদের জন্য পেতে লাগ্‌লাম আমরা—একটুখানি লবণ আর তিন ছটাক ক'রে চাল; এর পর আবার শোনা গেল জাপানীদের সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার যে কোন দিন শূন্য হ'তে পারে—তা' ছাড়া নতুন রসদ আস্‌বারও কোন সম্ভাবনা নেই।

নৌকার খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠানো হ'তে লাগ্‌ল—আহ্‌লো থেকে কয়েকখানা নৌকা এসে গেল, তাতে ক'রে সমর্থ লোকদের প্রথমে পার ক'রে দেওয়া হ'ল। তারা মার্চ্চ ক'রে প্রথমে যাবে য়ুয়া (Yuwa), তারপর সেখান থেকে কালেওয়া। কালেওয়া থেকে মোটর-যানে শেষে তারা মান্দালয় প্রভৃতি স্থানে যাবে।

সব চেয়ে মুস্কিল হ'ল আমাদের ৪০০ রুগ্ন সৈন্য নিয়ে: এদের কারোই এক মাইল চল্‌বার ক্ষমতা ছিল না। বাধ্য হ'য়ে আমি এদের এখানে রেখেই য়ুয়া যাওয়া সাব্যস্ত কর্‌লাম: সেখানে গিয়ে নৌকার ব্যবস্থা ক'রে এদের এখান থেকে নিয়ে যা'ব। কাজটা অবশ্য তেমন সহজে সম্পন্ন হ'ল না—প্রায় এক মাস ধ'রে চেষ্টা ক'রে আমাদের রুগ্ন সৈনিকদের আমি সেখান থেকে আন্‌তে সক্ষম হই। পুরো

৪০০কে ফিরে পাওয়াও গেল না, তা'দের প্রায় আধাআধি শত্রুর বোমা, রোগ ও অনাহারে মারা গিয়েছিল।

য়ুয়ায় পৌছানর পর কাজটা অনেক সহজ হ'য়ে গেল: সেখানে ঐ দেশীয় কতকগুলি নৌকা পাওয়া গেল—সেই নৌকায় ক'রে আমাদের রুগ্ন লোকদের আমরা কালেওয়ায় নিয়ে গেলাম। ওখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবির স্থাপন করা হ'য়েছিল—তা' ছাড়া ওষুধপত্র, মোটরযানের ব্যবস্থাও ছিল।

কালেওয়াতে উপস্থিত হবার পর ১নং ডিভিশনকে ব্রহ্মদেশে এইরূপভাবে বিন্যস্ত করা হ'য়েছিল—

ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্স—মান্দালয়ে

১। সুভাষ ব্রিগেড—বুদালিনে (Budalin)

২। গান্ধী ব্রিগেড—মান্দালয়ে

৩। আজাদ ব্রিগেড—ছাউঙ্গুতে (Choungoo)

অধিকাংশ অফিসার এবং সৈনিক উঠ্লেন গিয়ে সোজা মনিওয়া (Monywa) ও মেমিয়োর (Maymyo) হাসপাতালে।

১৯৪৪ সালের মে মাসের পরবর্ত্তীকালে হাকা-ফালম-রক্ষীবাহিনী

১৯৪৪ সালের মে-মাসের মাঝামাঝি মেজর মহবুব আহম্মদ ক্লাং ক্লাং ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে তা' অধিকার করেন। এর পর ব্রিগেডের প্রধান সৈন্যদলকে আদেশ দেওয়া হয়

মণিপুরের যুদ্ধ।
এপ্রিল সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সালে
বিভিন্ন শক্তির সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি
কোহিমা
উখরুল
ফুমিন
হোমালিন
তোংহাউ
তামু
আ-লো
টি-ডিম
সঙ্কেত
আই.এন.এ.......
বৃটিশ.........
জাপান.........
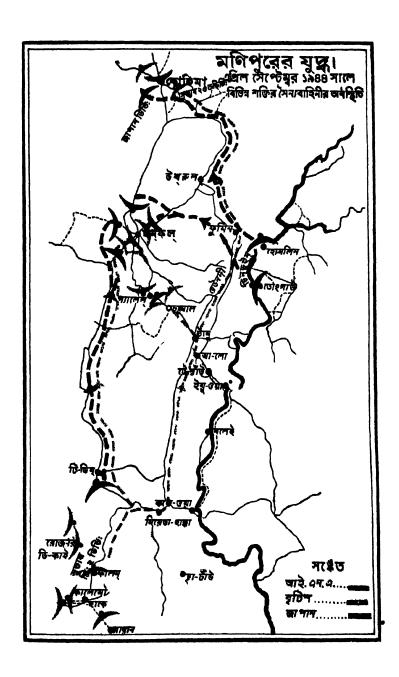
কোহিমায় যেতে, কিন্তু হাকা-ফালম রণাঙ্গন রক্ষার ভার ১নং রেজিমেন্টের (সুভাষ ব্রিগেডের) উপরই থাকে। তদনুসারে লেফ্‌ট, রণযোধ্‌ সিং-এর নেতৃত্বাধীনে ১০০ সক্ষম এবং ১৫০ রুগ্ন সৈন্যের একটি ছোট দল হাকায় রাখা হয় এবং অনুরূপ একটি দল রাখা হয় ফালমে।

মেজর ঠাকুর সিং-এর কর্ত্তৃত্বাধীনে কিছু রসদবাহী, কিছু মেডিক্যাল ও কন্‌ট্রোল ষ্টাফ্‌ নাউছ্যাঙের (Nauchang) 'রেজিমেণ্টাল বেস'-এ থাকে।

রেজিমেণ্টের প্রধান দল হাকা-ফালম এলাকা ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদল সেখানে বিশেষ কর্ম্মতৎপর হ'য়ে ওঠে। এই সময় আমাদের ঘাঁটিগুলি ওরা প্রায় রোজই আক্রমণ ক'রত।

ক্লাং ক্লাং-এর আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘাঁটিতে কয়েক বার ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিছুদিন যাবৎ শত্রুপক্ষের সাহস বেশ একটু বেড়ে উঠেছিল, ওরা আমাদের ঐ ঘাঁটি এবং হাকা-যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (Haka Base) অধিকার কর্‌বার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছিল। কিন্তু আমাদের সাহসী সৈন্যেরা অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সঙ্গে ওদের প্রতিবারের আক্রমণই প্রতিহত কর্‌ছিল। শুধু তাই নয়, তারা শত্রুর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণও চালিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৪৪ সালের আগষ্টের প্রথম দিকে আমাদের ইম্ফল আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর যখন আমরা পশ্চাদপসরণ করি— তারপরই ব্রিটিশ সৈন্যদল আমাদের ক্লাং ক্লাং ঘাঁটি ও হাকা

ঘাঁটি দখল কর্‌বার জন্য ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। প্রায় ৬০০ শত্রুসৈন্য বিভিন্ন দিক থেকে হাকার উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ওদের একটি শক্তিশালী সেনাদল ক্লাং ক্লাং-এর চারিপাশ ঘিরে ফেলে হাকা ও ক্লাং ক্লাং ঘাঁটির মধ্যবর্ত্তী লম্বা পাহাড়টাও অধিকার ক'রে নেয়: উদ্দেশ্য ও পথ দিয়ে আমরা আর যাতে নতুন সৈন্য আমদানী কর্‌তে না পারি।

নীচে কামান—উপরে বিমান—এই দু'য়ের সাহায্য নিয়ে শত্রুদল আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে লাগ্‌ল—কিন্তু আমাদের দল তবুও দমে নি। হাকায় আমাদের সৈন্যদের অবস্থা সঙ্কটময় বুঝে লেফ্‌ট, রণযোধ্‌ সিং পূর্ব্ব দিক থেকে শত্রু রুখ্‌বার জন্য অল্প কিছু সৈন্য ওখানে রেখে অবশিষ্ট প্রায় ৬০ জন সুদক্ষ সৈন্য নিয়ে ক্লাং ক্লাং ঘাঁটি অবরোধকারী শত্রুদলের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানো সাব্যস্ত কর্‌লেন। তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন—সময়ের সমস্যাই এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা। অতি শীঘ্র যদি ক্লাং ক্লাং ঘাঁটিতে কোন সাহায্য গিয়ে না পৌঁছয় তবে শত্রুদের হাত থেকে এটা রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং লেফ্‌ট, রণযোধ্‌ সিং তা'র সৈন্যদের ডেকে ক্লাং ক্লাং ঘাঁটির সঙ্কটের অবস্থাটা তা'দের বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বল্‌লেন—"ঐ ঘাঁটির সৈন্যদের শত্রুরা একেবারে ঘেরাও ক'রেছে এবং আমাদের সৈন্যদের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেলে তা'দের ধ্বংস অনিবার্য্য; সুতরাং আমাদের সৈন্যদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে অবিলম্বে সেখানে

গিয়ে তা'দের সাহায্য ক'রে রক্ষা করা অথবা তা'দের সাথে একসঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া।" এই কথাই যথেষ্ট। আমাদের সৈন্যেরা তখনই তা'দের বন্ধুকে সঙ্গিন চড়িয়ে বীর কম্যাণ্ডারের নেতৃত্বে হাকা ও অবরুদ্ধ ঘাঁটির মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের উপরে অবস্থিত শত্রুদলকে আক্রমণ করলে। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা ছিল সেখানে প্রায় ৩০০, আমাদের সৈন্য-সংখ্যা মাত্র ৬০—তা' ছাড়া ওদের অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সজ্জা সবই অনেক উন্নত ধরণের—আমাদের সৈন্যদের সম্বল কেবল মনের বল ও উদ্যম। 'নেতাজী-কি জয়'—'জয় হিন্দ'—ব'লে তারা শত্রু-অধিকৃত পাহাড়ের উপর বীর বিক্রমে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। শত্রুদলের সঙ্গে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ হ'ল, যুদ্ধে বেশ কিছু ক্ষতিও আমাদের হ'ল—কিন্তু শত্রুকে শেষ পর্য্যন্ত হট্‌তে হ'ল ; ও পাহাড় থেকে পালিয়ে তারা আর এক পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কয়েকজন সঙ্গীকে শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হ'তে দেখে লেফ্‌ট, রণযোধ্‌ সিং-এর মাথা গরম হ'য়ে গিয়েছিল, সুতরাং শত্রুদের এইখানেই ছাড়্‌লেন না তিনি। তাঁর যে সামান্য সৈন্য ছিল তা'দেরই একত্র ক'রে শত্রুদের আবার আক্রমণ ক'রলেন তিনি। ফলে শত্রুরা সে পাহাড় ছেড়েও পালিয়ে গেল। অবরুদ্ধ ঘাঁটির সঙ্গে আবার আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। এর পর লেফ্‌ট, রণযোধ্‌ সিং চল্‌লেন ঘাঁটি অবরোধকারী শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ কর্‌তে এবং ভীষণ যুদ্ধের পর তারাও শেষে সেখান থেকে বিতাড়িত হ'ল। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ ২২ জন নিহত সৈন্য

ফেলে পালায়। শত্রুদের কাছ থেকে আমাদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি লাভ হ'ল।

আগষ্টের মাঝামাঝি লেফ্‌ট, রণযোধ্‌ সিং-এর উপর আদেশ হ'ল—হাকা-ফালম অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে নাউছ্যাং-এর রেজিমেণ্টাল হেড্‌ কোয়ার্টার্সে গিয়ে পুনরায় যোগদান কর্‌তে। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে তাঁর সৈন্যেরা অসুস্থ রুগ্ন সঙ্গীদের কাঁধে নিয়ে প্রথমে ফালমে ফিরে এল। সেখানে এসে তারা দেখ্‌লে মণিপুর নদীর উপরকার ঝোলান পুল শত্রুপক্ষের গেরিলা সৈন্যেরা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, প্রবল বন্যায় মণিপুর নদী পার হওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং হাকায় ফিরে এসে কানের (Kan) পথে নাউছ্যাঙে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। কিন্তু এ পথে যেতেও শত্রুর বাধা, শত্রুদল এখন প্রায় তা'দের চারি পাশ ঘিরে ফেলেছে—সুতরাং তাদের আবার ফালমেই ফিরে আস্‌তে হ'ল। ভাগ্যক্রমে এবার মণিপুর নদীতে বন্যার বেগ তেমন প্রবল ছিল না—একটা অস্থায়ী সেতু নির্ম্মাণ ক'রে কোন রকমে নদী পার হ'য়ে তারা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে নাউছ্যাঙ্‌-এ গিয়ে পৌঁছল। সেখান থেকে তারা কালেওয়ায় গিয়ে কোহিমার ফেরত ব্রিগেডের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে মিলিত হ'ল।

জাপানীদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা সত্যিকার মিত্রের মত কোনদিনই ছিল না, এবার তা' একেবারে তিক্ততায় পরিণত হ'ল। আমাদের সকলেরই ধারণা—জাপানীরা

আমাদের সঙ্গে যথাযথ সহযোগিতা না ক'রে—আমাদের যুদ্ধ কর্‌তে বাধা দিয়ে মিথ্যাচরণ করেছে—আমাদের ইম্ফল অভিযান যে ব্যর্থ হ'য়েছে এবং তাতে আমাদের যে বহুসংখ্যক লোক মারা গেছে—এর জন্য প্রধানতঃ তারাই দায়ী। এই সময় জাপানীদের প্রতি আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা যে কিরূপ মনোভাব পোষণ কর্‌ত—তা' তা'দের একজন মুমূর্ষু অফিসারের মুখের কথাতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাবে। এই অফিসারটি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌বার আগে আমায় ব'লে যান—"সাহেব, দেখ্‌বেন আমার কবরটা যেন কোন জাপানীর কবরের পাশে না হয়।"

পশ্চাদপসরণের সময় কয়েকবার জাপানী ও আমাদের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হ'য়ে গেছে—কিন্দাৎ (Kindat) ও য়ুয়া (Yuwa)-তে ত দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি মেসিনগান চালিয়েছে।

হাকা রক্ষী-বাহিনী কালেওয়াতে ফিরে আস্‌বার পথে জাপানীরা খুব ভোরে তা'দের জনদশেকের একটি ছোট দলকে ধ'রে গাছের সঙ্গে বেঁধে সঙ্গিনের খোঁচা মার্‌তে থাকে। তারা বলে—এরা (আমাদের দলের লোক কয়টি) না কি শত্রুদের গুপ্তচর। এরূপ ক'রে মারার ফলে আমাদের ঐ দলের অধিকাংশ লোক মারা যায়—যে দু'একজন বাঁচে তা'দের দেহের দশ জায়গায় সঙ্গিনের খোঁচার ক্ষত থেকে এই নৃশংসতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যাপারটা যখন নেতাজীর কানে গেল তখন তিনি ভীষণ রেগে যান,—তারপর

টোকিও হেড্ কোয়ার্টার্সের সঙ্গে সরাসরি কি সব কথাবার্ত্তা হবার পর গোলযোগ মিটে যায়।

জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার যে কেন করত—বলা শক্ত। তবে আমাদের মনে হয়—যুদ্ধের প্রথম দিকে তা'দের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে বড় বেশী উচ্চ ধারণা ছিল এবং আশা ছিল ইম্ফল তারাই অধিকার করবে। ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করবার ইচ্ছা তা'দের হয়ত খুবই ছিল এবং সেইজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজ খুব শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে—এ তারা চাইত না। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তারা এ'কথাও বুঝতে পেরেছিল যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ওরা (আজাদ হিন্দ ফৌজ) জাপানীদের সঙ্গে লড়তেও কসুর করবে না।

আমি এ কথা বেশ জোর ক'রে বলতে পারি যে, নেতাজী নিজেও জাপানীদের বিশ্বাস করতেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজকে খুব শক্তিশালী ক'রে গ'ড়ে তুলতেই তিনি চাইতেন, কারণ তাঁর ধারণা—জাপানীদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হ'লে আমাদের নিজেদের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আমরা যত এগিয়ে যেতে পারব, আমাদের শক্তি তত বৃদ্ধি পাবে—এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি বলতেন—আমাদের বিরুদ্ধে যে শক্তি দাঁড়াবে তার সঙ্গেই আমরা লড়ব—সে ব্রিটিশই হ'ক—বা জাপানীই হ'ক। তাঁর ধারণা ছিল—জাপানীরা

নিজের স্বার্থেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বিরোধিতা কর্‌তে পারে না—কারণ তারা জানে—ওরূপ কর্‌লে ওখানেও চীনের মত দশা হবে : চীনে তাদের অনেক সৈন্য রেখে দিতে হ'য়েছে।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে আমি কিনদাত (Kindat) থেকে কালেওয়ায় আসি—সেখান থেকে ইউ (Yeu) ও বুদালিনে (Budalin) যাই, রেজিমেণ্ট কি অবস্থায় আছে—দেখ্‌তে। ২৩শে সেপ্টেম্বর—বা তার কাছাকাছি কোন তারিখে আমি মান্দালয়ে নেতাজীর কাছে গিয়ে হাজির হই। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুন থেকে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বার পর নেতাজীর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

ইম্ফল যুদ্ধে ১নং ডিভিশানের কার্য্যকলাপ

আরাকান ও ছিন পাহাড়ের যুদ্ধে শহীদ মেজর এল্‌, এস্‌, মিশ্র, সর্দ্দার-ই-জং এবং মেজর পি, এস্‌, রাতুরি, সর্দ্দার-ই-জংএর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য ক'রে—জাপানীদের আজাদ হিন্দ ফৌজের রণনৈপুণ্য সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না। নেতাজীর জোরও এতে অনেকটা বেড়ে গেল। তিনি যুদ্ধে আরও অধিক-সংখ্যক আজাদ হিন্দ সৈন্য পাঠাবার জন্য জাপানীদের পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌লেন। অবিলম্বে ১নং ডিভিশানের অন্যান্য ইউনিটগুলিও একত্র ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানোর আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌ল।

পরে ২নং গেরিলা রেজিমেণ্ট (গান্ধী ব্রিগেড) ও ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্সকেও মার্চ্চের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশে পাঠানো হ'ল। রেঙ্গুণে তারা কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে এপ্রিলের প্রথম দিকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হ'ল। সুভাষ ব্রিগেড যে রাস্তা ধ'রে যায় এদেরও সেই রাস্তায় যেতে হয় এবং তাদেরই মত নানা দুঃখকষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

এই ডিভিশানের নেতৃত্বের ভার ছিল মেজর জেনারেল (তখন কর্ণেল) এম্, জেড্, কিয়ানির উপর। আজাদ হিন্দ ফৌজে কম্যাণ্ডার হিসাবে যাঁরা বিশেষ যোগ্যতা দেখিয়েছেন ইনি তাঁদেরই একজন। গান্ধী ব্রিগেড পরিচালনার ভার পড়েছিল কর্ণেল আই, জে, কিয়ানির উপর—ইনি জেনারেল এম্, জেড্, কিয়ানির খুড়্তুতো ভাই। এই মণিকাঞ্চন সংযোগ থেকে অনেক বড় কিছুই আশা করা গিয়েছিল। কর্ণেল আই, জে, কিয়ানি কোন কাজ ধর্লে অল্পে ছাড়্বার পাত্র ছিলেন না।

যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হবার সময় জাপানীরা তাঁদেব বলে যে তাঁদের বড় দেরী হ'য়ে গেছে এবং তাঁরা ইম্ফলে পৌঁছবার আগেই হয়ত তার পতন হ'য়ে যাবে। এই কথা শুনে তাঁরা অনেক কষ্টে দ্রুত মার্চ্চ ক'রে ১৯৪৪ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে কালেওয়া গিয়ে হাজির হ'ন। এখানে গিয়েও কর্ণেল কিয়ানি জাপানীদের কাছে শোনেন—তাদের আস্তে বড় দেরী হ'য়ে গেছে: ইম্ফলের পতন হয়ত হ'য়েই গেছে—না হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হবে। জাপানীরা তাঁদের মেশিনগান,

হাত বোমা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ওখানে রেখে অবিলম্বে ইম্ফলে যেতে পরামর্শ দেয়। জাপানী লিয়েজং অফিসারেরা তাঁদের আরও পরামর্শ দেয়—মাত্র এক একটা ক'রে কম্বল—রাইফেল ও পঞ্চাশবার ছুঁড়্‌বার মত টোটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারেন, এর বেশী কিছু দরকার হবে না। আর যা যা দরকার হয় প্রচুর পরিমাণে সে সব ঐ খানেই পাওয়া যাবে।

এই অবস্থায় গান্ধী ব্রিগেড ইম্ফলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়: ইম্ফলের উপর চরম আক্রমণের সময় তারা কিছুতেই পিছনে প'ড়ে থাক্‌তে চায় না। প্রত্যেক অফিসারের ইচ্ছা, এই আক্রমণে তিনি সবার আগে গিয়ে দাঁড়াবেন—প্রত্যেক সৈনিকের ইচ্ছাও তাই।

তামুতে উপস্থিত হবার পর ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার বুঝ্‌তে পার্‌লেন—ইম্ফলের পতন তখনও হয় নাই এবং পালেল অঞ্চলে ভীষণ যুদ্ধ চ'লেছে। পালেল রণাঙ্গনে এসে তিনি জাপানী কম্যাণ্ডারের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। মেজর ফুজিয়ারা (সিঙ্গাপুরে যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন) তখন জাপানীজ হেড্‌ কোয়ার্টার্সের ষ্টাফ্‌ অফিসাররূপে ঐখানেই অবস্থান কর্‌ছিলেন। জাপানী কম্যাণ্ডার এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা হ'ল—তামু-পালেল প্রধান সড়কের দক্ষিণে ১নং ডিভিশানের একটি স্বকীয় যুদ্ধস্থান (Sector) থাক্‌বে—এখান থেকে এই ডিভিশানের সৈন্যগণ তামুতে অবস্থিত শত্রুদলের সঙ্গে এবং পালেলে শত্রুপক্ষীয় বিমান-ঘাঁটির উপর গেরিলা যুদ্ধ চালাবে।

ছামলে (Chamol) আমাদের ডিভিশনাল হেড্-কোয়ার্টার্স করা হ'ল এবং মিথুন খুনাউতে (Mithun Khunau) করা হ'ল রেজিমেণ্টাল হেড্ কোয়ার্টার্স।

আক্রমণ করার দিক দিয়ে তামু-পালেল সড়কের গুরুত্ব অনেক বেশী। ব্রিটিশেরা তাই এখানে একটি বড় সৈন্য-বাহিনী সমাবেশ ক'রেছিল। সড়কের উত্তর দিকে একটি বিগ্রেড রেখেছিল—লাইমাতোল (Laimatol) পাহাড়ের কাছে তার একটা প্রবল ঘাঁটি; একটি ব্রিগেড রাস্তার দক্ষিণে—তার য়াপু পাহাড়ে কয়েকটি প্রবল ঘাঁটি—এ ছাড়া এই সকল সেনাদলকে আবশ্যক হ'লে সাহায্য ক'র্‌বার জন্য পালেল বিমান-ঘাঁটিব নিকট একটা ব্রিগেড রেখে দিয়ে-ছিল। এই সকল ইউনিটগুলির সাহায্যের জন্য প্রচুর কামান ও বিমানের আয়োজনও তারা ক'বেছিল। সুতরাং এখানে গান্ধী ব্রিগেডকে বিশেষ শক্তিশালী ব্রিটিশ সৈন্যদলের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল—এখানকার যুদ্ধও হ'য়েছিল প্রচণ্ড—অথচ কামান বা বিমানের ব্যবস্থা তাদের কিছু ছিল না—তা' ছাড়া মেশিনগান, হাত বোমা, পরিখা খুঁড়্‌বার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যা কিছু সম্বল তাদের ছিল তা-ও তারা কালেওয়াতে রেখে এসেছিল।

এই যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে জাপানী ব্রিগেডও একটি ছিল। তাদের সঙ্গে কামান ছিল। প্রধান সড়ক এবং তার পূর্ব্বদিকে তারা আক্রমণ চালাচ্ছিল।

পালেল বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ

১৯৪৪ সালের মে-মাসের প্রথম দিকে মেজর ফুজিয়ারা জেনারেল কিয়ানির কাছে এসে ব'ল্লেন—জাপানীরা পালেল বিমান-ঘাঁটি আক্রমণের উদ্যোগ কর্ছে, তিনি জান্তে চাইলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ এই আক্রমণে যোগদান কর্বে কি না। মেজর ফুজিয়ারা জেনারেল কিয়ানিকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, জাপানীরা যে ঐ বিমান-ঘাঁটি জয় ক'রে নিতে পার্বে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজের এ আক্রমণে যোগ দেওয়াই উচিত। এই কথা মত জেনারেল কিয়ানি জাপানী সৈন্যদের সহযোগিতায় পালেল বিমান-ঘাঁটি আক্রমণের একটি পরিকল্পনা খাড়া কর্লেন—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কর্বার ভার পড়্ল কর্ণেল আই, জে, কিয়ানির উপর।

মেজর প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বে ৩০০ সুদক্ষ সৈন্যের একটি দল আক্রমণ-কার্য্যে পাঠানো সাব্যস্ত হ'ল। সৈন্যদল হাল্কা অটোমেটিক বন্দুক, রাইফেল ও মাত্র একদিনের রসদ সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা কর্লে। খাড়া পাহাড়ে পথে প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে—শত্রুদলের বহির্ব্ব্যূহ ভেদ ক'রে তারা পালেল বিমান-ঘাঁটির প্রান্তদেশে গিয়ে হাজির হ'ল। বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ কর্বার কথা দুপুর রাত্রে, সুতরাং দিনের বেলা আমাদের সৈন্যেরা পাহাড়ের গায়ের গভীর খাদের ঝোপ-জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে রইল। রাত্রির

আঁধার ঘনিয়ে আস্‌বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দল ধীরে ধীরে বিমান-ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চল্‌ল। কাছাকাছি গিয়ে মেজর প্রীতম সিং দেখ্‌লেন বিমান-ঘাঁটির চারিদিকের পাহাড়ে দস্তুর মত প্রহরী সৈন্য মোতায়েন করা হ'য়েছে—এদের আক্রমণ ক'রে পরাস্ত কর্‌তে না পার্‌লে—বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি ব্যবস্থা কর্‌লেন ক্যাপ্টেন সাধু সিং-এর নেতৃত্বে একটি দল ওদের বিভিন্ন প্রহরীদলের একটিকে ঘেরাও ক'রে বন্দী ক'রবে—সেই ফাঁক দিয়ে আর একদল তখন এগিয়ে গিয়ে বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ ক'রবে।

ব্রিটিশেরা তাদের প্রহরী-সেনা রেখেছিল দস্তুরমত আট ঘাট বেঁধে—এদের কাছে মেশিনগান পর্য্যন্ত পাতা ছিল। আমাদের সৈন্যেরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সঙ্গিন উঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল, তারপর ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি গিয়ে আচমকা একেবারে শত্রুদলের উপর লাফিয়ে পড়্‌ল। শত্রুদল অতর্কিতে এরূপ আক্রান্ত হ'য়ে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়্‌ল। তারা তখন হাত তুলে আমাদের সৈন্যদের হিন্দুস্থানী ভাষায় ব'ল্‌লে, "সাথী, হামকো মাৎ মারো।" আজাদ হিন্দ সৈন্যদের উপর হুকুম ছিল—ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত না হ'লে কখনও তারা তাদের গুলি কর্‌বে না। সুতরাং আমাদের অফিসার সৈন্যদের থামতে ব'লে লেফ্‌ট, লাল সিং ও লেফ্‌ট, মোহন সিংকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুঘাঁটিতে প্রবেশ ক'রে তাদের আত্ম-সমর্পণের সুযোগ দিলেন। ইত্যবসরে ঐ ঘাঁটির কম্যাণ্ডার

আমাদের অফিসারকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"আপনি কি চান বলুন ত ?" লেফ্‌ট, লাল সিং ছিলেন সামনে—হাতে তাঁর মাত্র একটা 'নাগা' বর্শা। কম্যাণ্ডারের কথার উত্তরে তিনি বল্‌লেন,—"আমি চাই ঐ দুই ইংরেজ অফিসারের রক্ত—ঐ যে কোণে যারা লুকিয়ে আছে,"—এই ব'লে তিনি বর্শা হাতে ঐ দু'জন ইংরেজকে আক্রমণ কর্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে প্রহরী সৈন্যেরা আমাদের সৈন্যদের উপর গুলি ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। লেফ্‌ট, লাল সিং মারাত্মক জখম হ'লেন, কিন্তু মর্‌বার আগে তাঁর সেই বর্শা দিয়ে সেই দু'জন ইংরেজ অফিসারকে তিনি শেষ ক'রে গেলেন। আমাদের সৈন্যেরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ল যে, তারা প্রতারিত হ'য়েছে—তখন মেজর প্রীতম সিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ঘাঁটির উপর তারা বারবার আক্রমণ চালাতে লাগ্‌ল—কিন্তু ঘাঁটির চারিধার কাঁটা তারে এমনি ক'রে ঘেরা যে হাজার চেষ্টা ক'রেও তারা সেটা অধিকার করতে পার্‌লে না। এমনি ক'রে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে প্রভাত হ'য়ে গেল—তখন মেজর প্রীতম সিং আক্রমণ বন্ধ ক'রে তাঁর সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করিয়ে নিজের রেজিমেণ্ট্যাল হেড্‌কোয়ার্টার্সে ফিরে গেলেন।

এরা যতক্ষণ এই প্রহরী দলকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখেছিল সেই অবসরে আমাদের অন্য দল ফাঁক পেয়ে গিয়ে বিমান-ঘাঁটি অধিকার করে কিন্তু সেখানে তা'রা সহায়কারী জাপানী সৈন্যদলের কোনও সন্ধান পেল না। বিমান-ঘাঁটি অধিকার ক'রেও বিনা সাহায্যে উহা রক্ষা করা সম্ভবপর

ছিল না তা'দের—সুতরাং ওখানকার বিমানগুলি ধ্বংস ক'রে তারা সেখান থেকে পশ্চাদপসরণ করলে।

এই সব ব্যাপার যখন চল্‌ছিল—কর্ণেল আই, জে, কিয়ানি ততক্ষণে তাঁর ব্রিগেডের অবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে মেজর প্রীতম সিং-এর সৈন্যদলকে সাহায্য কর্‌বার উদ্দেশ্যে য়াপু (Yapu) পাহাড়ের শত্রু-ঘাঁটি অধিকার কর্‌লেন। রাত্রি প্রভাত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদল কামান ও বিমান দিয়ে প্রবল আক্রমণ সুরু কর্‌ল। সারা দিন তারা আমাদের সৈন্যদের ওপর বিমান থেকে বোমা এবং নীচু থেকে কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। মেজর প্রীতম সিং-এর অধীনস্থ সৈন্যেরা তখন তিন দিন ধ'রে কিছু খেতে পায় নি—ঐ দিন আমাদের গান্ধী ব্রিগেডের গুরুতর লোকহানি হয়, প্রায় ২৫০ জন সৈন্য মারা পড়ে।

এই যুদ্ধের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে এই ব্রিগেডের মেডিক্যাল অফিসার মেজর আলি আকবর খাঁ অসংখ্য বোমা ও কামানের গোলা বর্ষণের ভিতরে যুদ্ধের মহড়ায় গিয়ে আহতদের প্রত্যেকের ক্ষতস্থান বন্ধন ও ছোট-খাট অস্ত্রোপচার পর্য্যন্ত ক'রেছিলেন। অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তাঁর একরকম কিছুই ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল—একটা সাধারণ কাঁচি ও একখানা ক্ষুর; তাই নিয়ে নিজের জীবনের ভয় তুচ্ছ ক'রে সেই যমপুরীতে তিনি তাঁর নিজের কর্ত্তব্য পালন ক'রেছেন। বিপদের মধ্যে তিনি যে ভাবে এইসব কাজ ক'রেছেন, তাতে যে কোন দেশ নিজেকে

গৌরবান্বিত মনে করতে পারে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মণিওয়া (Monywa) হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে শুধু একজন শ্রেষ্ঠ অফিসার হারাল তা' নয়—একজন অতি প্রিয় সুহৃদ্ও তারা হারাল। ব্রিটিশদের বিমান-ঘাঁটি এমনি ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তারা একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে—এরপর তারা সাব্যস্ত করে—পাল্টা আক্রমণ ক'রে গান্ধী ব্রিগেডকে মিথান খুনাউ (Mithan Khunou) থেকে তাড়িয়ে দেবে।

'সি-ফোর্থ হাইল্যাণ্ডার'দের মিথান খুনাউ আক্রমণ

প্যালেল বিমান-ঘাঁটি আক্রমণের পর টহলদারী শত্রু-সৈন্যের আক্রমণের বেগ অতিরিক্ত বেড়ে যায়। একজন ব্রিটিশ অফিসার কয়েকবার আমাদের প্রহরী সৈন্যদের ঘাঁটিতে গুঁড়ি মেরে এসে তা'দের গুলি ক'রে মেরে গেছে। কর্ণেল কিয়ানি শেষে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে তাকে শেষ করেন।

কয়েকদিন পর ব্রিটিশ সৈন্যদল বহু বড় বড় কামানের সাহায্য নিয়ে আমাদের মিথান খুনাউ অঞ্চলের অগ্রগামী দলকে আক্রমণ করে। এই দলের সামনের প্লেটুনের নেতৃত্ব-ভার ছিল একজন তরুণ সহকারী লেফ্টেন্যাণ্টের উপর, নাম তাঁর আজইব সিং। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল হ'য়েছিল,—আজইব সিং তাতেই শিক্ষালাভ করেন।

'সি-ফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স'-এর স্কচ্ সৈন্যেরা যাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজ—এ কথা জেনে

আক্রমণটা তারা খুব ভীষণ ভাবেই করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যেরাও এরূপ একটা দিনেরই প্রতীক্ষা কর্‌ছিল। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদলের সঙ্গে গান্ধী ব্রিগেডের এই প্রথম যুদ্ধ, সুতরাং শত্রুদের দেখ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তারা একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। দুই দলই পরস্পরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান ক'রে আস্ফালন কর্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের সৈন্যেরা যে পরিখা অধিকার ক'রে অবস্থান কর্‌ছিল—ব্রিটিশ সৈন্যেরা বারবার তার কাছাকাছি এসে বিতাড়িত হ'তে লাগ্‌ল। অনেক লোকজনও তা'দের মারা গেল।

প্রথমবার বাধা পেয়ে তারা পালিয়ে গেল, কিন্তু সৈন্যদলকে বেশ ক'রে গুছিয়ে কামান ও বিমানের সাহায্য নিয়ে তারা পুনরাক্রমণ কর্‌লে, কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী সৈন্যদল তা'দের বীর কম্যাণ্ডারের নেতৃত্বে বারবার তা'দের আক্রমণ প্রতিহত কর্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজকে কোন রকমে হটাতে না পেরে শত্রুপক্ষ তা'দের সৈন্যদলকে যুদ্ধে বিরত ক'রে আত্মরক্ষা-ব্যূহে ফিরিয়ে নিয়ে গেল; কিন্তু আজইব সিং তা'দের অত সহজে ছাড়্‌বার পাত্র ন'ন। সৈন্যদের একত্র সমাবেশ ক'রে, মৃত ও আহত আক্রমণকারীদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি সংগ্রহ ক'রে লেফ্‌ট, আজইব সিং শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষা-কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেলেন—তারপর উচ্চৈঃস্বরে তা'দের যুদ্ধার্থে আহ্বান ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—তারা বেরিয়ে আসুক—কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে আত্মরক্ষা-ঘাঁটিতে লুকিয়ে না থেকে তারা বেরিয়ে

এসে যুদ্ধ করুক। ব্রিটিশেরা তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিল। এরপর আর একটা বেশ বড় রকমের যুদ্ধ হ'ল—এবার অবশ্য ব্রিটিশদের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক। এর আগের বার লেফ্‌ট, আজইব সিং ব্রিটিশদের অনেকগুলি রাইফেল ও ছোট বোমা অধিকার ক'রেছিলেন, এবার সেগুলি তা'দের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা সাব্যস্ত কর্‌লেন, কিন্তু হ'লে হবে কি—এই বিশেষ ধরণের বোমা ছুঁড়্‌বার মত বারুদ-ভরা টোটা তাঁর ছিল না, সুতরাং সামরিক শিক্ষার সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি অমান্য ক'রে তিনি ৩০৩নং গুলি ভরা টোটার সাহায্যেই রাইফেল থেকে ছোট বোমা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌লেন। এতে বেশ ভাল ফলই পাওয়া গেল; এই যুদ্ধে তিনি প্রায় ৫০টি বোমা ছুঁড়েছিলেন। শত্রুদলের আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়ে লেফ্‌ট, আজইব সিং সন্ধ্যাকালে নিজেদের লাইনে ফিরে এলেন। তাঁর ছোট্ট দলটির অনেক লোক মারা গিয়েছিল বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষের ক্ষতি ক'রেছিলেন তিনি আরও অনেক বেশী। তিনি তা'দের এমন শিক্ষা দিয়ে এসেছিলেন যে, ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ কর্‌তে এলে তারা আরও সাবধান হ'য়ে আস্‌বে—তা' ছাড়া একটু সম্মান ক'রেও চল্‌বে। এই দিনের যুদ্ধে শত্রুদলের হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫০, আর আমাদের লোক মারা গিয়েছিল মাত্র ১০টি—তা' ছাড়া আর কয়েকজন সামান্য আহত হ'য়েছিল। আমাদের দলের অধিকাংশ সৈন্যই ছিল তামিল—মালয় থেকে এনে সবে তা'দের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হ'য়েছে। জীবনে তা'দের এই

প্রথম যুদ্ধ—তবুও তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে এমন সুন্দর ল'ড়েছে যে এর পরে আর ব্রিটিশেরা সামরিক আর অসামরিক জাতির তারতম্যের কথা মুখে আন্‌বে না। বস্তুতঃ তারা এই যুদ্ধে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে ভারতবর্ষের যে কোনও জাতি, ইংরাজের হিসাবে সামরিক অথবা অসামরিক যে কোনও পর্য্যায়ভুক্ত হ'ক না কেন, যদি একবার জাগে তা'হলে শ্রেষ্ঠ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে পারে ও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চরম আত্মত্যাগেও পশ্চাৎপদ হয় না।

এই সময় ভীষণ বর্ষা সুরু হওয়ায় রসদ ও গোলাবারুদ পাওয়া কঠিন হ'য়ে ওঠে। উপযুক্ত খাদ্য ও ওষুধের অভাবে সৈন্যদের স্বাস্থ্য অতি দ্রুত ভেঙ্গে যেতে থাকে, অবশেষে ১৯৪৪ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি তারা এত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে যে, একসঙ্গে কয়েক মাইল হাঁটবার তা'দের শক্তি রইল না। তা' সত্ত্বেও তারা নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে এক পা না ন'ড়ে ব্রিটিশ আক্রমণ বারবার প্রতিহত কর্‌তে থাকে। এই সময়ের কাছাকাছি যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। ব্রিটিশেরা এতদিনে বিমান যোগে ইম্ফলে অনেক নূতন সৈন্য আমদানী ক'রে ঐখানে অবরুদ্ধ সৈন্যদলের শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি ক'রে বড় রকমের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'ল।

মিথান খুনাউয়ের চারিদিকের উঁচু পাহাড়ে জায়গাটা এতদিন গান্ধী ব্রিগেডের অধিকারে ছিল—ব্রিটিশদের প্রথম আক্রমণ হ'ল এর উপর। এই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল প্রায় ৩০০০ সুদক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য—সঙ্গে তা'দের বড় বড়

কামান—উপরে সহায়কারী বিমান। আক্রমণকারী দলের অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে এল আমাদের সেই পূর্ব্বের প্রতিদ্বন্দী 'সি-ফোর্থ হাইল্যাণ্ডার'-দল।

খুব দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য চালনা ক'রে ওরা ক্যাপ্টেন রাওএর অধীন আমাদের একটি সৈন্যদলকে ঘেরাও ক'রে ফেলে এবং দেখে মনে হ'ল ওরা আমাদের ঐ দলটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেল্‌বে। অবস্থা বড়ই সঙ্কটময়! সবচেয়ে উঁচু আর অনুকূল স্থানগুলি সবই শত্রুদের অধিকারে। তা' ছাড়া অসুখবিসুখ ও যুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে লোকক্ষয় হওয়ায় গান্ধী ব্রিগেডের শক্তিও অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ৬০০ সৈন্যকে প্রায় ৩০০০ সুপুষ্ট ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়্‌তে হ'য়েছিল, তা' ছাড়া ওদের অস্ত্রশস্ত্র, রণসজ্জা সবকিছুই আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের ছিল। এই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যরা বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। কর্ণেল আই, জে, কিয়ানি সদলবলে ব্রিটিশ দল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন—কোনরূপ কৌশলে তিনি যদি উচ্চস্থানগুলি পুনরধিকার কর্‌তে না পারেন, তবে তাঁর সৈন্যদলের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং তিনি তাঁর অফিসারদের হুকুম দিলেন,—যেমন ক'রে হ'ক্ ঐ উঁচু জায়গাগুলি তা'দেব অধিকার কর্‌তেই হবে। একটা টিলা অধিকার কর্‌বার ভার পড়্‌ল লেফ্‌ট, মনসুখলালের উপর। মনসুখলাল মাত্র ত্রিশটি সৈন্যের একটি প্লেটুনের নেতা।

এই সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে কামানের আক্রমণের সাহায্য না পেয়েও তিনি টিলার উপরকার শত্রুদের একটি মজবুৎ ঘাঁটি অধিকার কর্‌লেন। অনাহারক্লিষ্ট ছোট্ট দলটিকে খাড়া পাহাড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবার সময় তিনি ১৩ বার আহত হ'ন—শেষে তিনি আর দাঁড়াতে না পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়েন। সাহসী নেতার এই অবস্থা দেখে তাঁর দলের সৈন্যেরা একটু ভ'ড়্‌কে গিয়ে তা'দের গতিবেগ মন্থর করে। বাঘ গুরুতররূপে আহত হ'বার পরেও যেমন ভীম বিক্রমে তার শিকারের উপর লাফিয়ে পড়্‌তে চায়—ঠিক তেমনি-ভাবে তিনি হুঙ্কার ক'রে তাঁর সৈন্যগণকে তাঁর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে এগিয়ে যেতে বল্‌লেন। লেফ্‌ট, মনসুখলাল তাঁর দলবল নিয়ে পাহাড়ের প্রায় শীর্ষদেশের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন, শরীরে ১৩টি গুলির আঘাত খেয়েও তিনি উঠে সৈন্যদের নিয়ে উপরে শত্রু-ঘাঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন। এই ঘাঁটি নেওয়া না নেওয়ার উপরই সেদিন গান্ধী ব্রিগেডের ভাগ্য নির্ভর কর্‌ছিল।

শত্রুদের হাতাহাতি যুদ্ধ কর্‌বার সাহস ছিল না, তাই তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গিনের সম্মুখীন না হ'য়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা কর্‌লে। পাহাড়ের শীর্ষদেশ আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকারে এল। এমনি ক'রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অধিকার করায় ইউনিটটি রক্ষা পেল।

ক্যাপ্টেন রাওয়ের দল যখন প্রাণপণে শত্রুর বেষ্টন ভেদ ক'রবার জন্য যুদ্ধ কর্‌ছিল, আমাদের ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার

তখন লেফ্‌ট, আজইব সিং-এর নেতৃত্বে আর একদল সৈন্য পাঠালেন ওদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ক্যাপ্টেন রাওয়ের দলকে মুক্ত করতে। এই দল এগিয়ে গিয়ে কৌশলে ব্রিগেড হেড্‌কোয়ার্টার্স ও ক্যাপ্টেন রাও-এর দলকে অবরোধকারী শত্রুদল ঘিরে ফেল্‌লে। শত্রুরা নিজেদের অবস্থা দেখে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেল—এর পর তা'দের পশ্চাদপসরণের পথও রুদ্ধ হ'য়ে গেছে দেখে ক্যাপ্টেন রাওয়ের দলের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়ে লেফ্‌ট, আজইব সিং-এর সৈন্যদের ভিতর দিয়ে পালাতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল —কিন্তু পালাবার পথ কই? দুই দিক থেকে অগ্নিবেষ্টনীর মধ্যে আট্‌কে পড়েছে—সুতরাং বহু শত্রুসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাল। সে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড—অসংখ্য নিহত ও আহত 'টমী'র মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র ভ'রে উঠ্‌ল। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহত ও আহত সৈন্যের সংখ্যা ২৫০ এর কম নয়। এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সারা দিন ধ'রে চল্‌তে থাকে, সন্ধ্যা হ'বার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদলের পরাক্রম দেখে ব্রিটিশ সৈন্যেরা এতটা দ'মে গিয়েছিল যে, এর পর বহুদিন যাবৎ তারা আর আমাদের কোন ঘাঁটি আক্রমণ কর্‌তে সাহস পায় নি।

১৯৪৪ সালের জুন মাস প্রায় শেষ হ'তে চল্‌ল। ভীষণ বর্ষা সুরু হ'য়ে গেল—সরবরাহের একমাত্র পথ তামু-পালেল সড়কের উপর দিয়ে প্রবল বন্যার স্রোত বইছে। আমাদের সৈন্যদের বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা

ছিল না, তা' ছাড়া সরবরাহের রাস্তা নষ্ট হওয়ায় রসদ ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম পাওয়াও বন্ধ। বড়ই ভাবনার কথা হ'য়ে উঠ্‌ল—নতুন সরবরাহ না পেয়ে আমাদের সৈন্যদের হয়ত এখান থেকে পশ্চাদপসরণ কর্‌তে হবে। কর্ণেল ইনায়ৎ কিয়ানির কিন্তু এ যুদ্ধ একেবারে পছন্দ হ'ল না—তিনি বল্‌লেন, "তামু থেকে যদি রসদ না আসে, তবে আমাদের নিজেদের এলাকা থেকেই আমরা রসদ সংগ্রহ ক'রে নেব।" যে সময়ের কথা বল্‌ছি—তখন ২০০ বর্গমাইল বিস্তৃত ভারতভূমি তাঁর (কর্ণেল কিয়ানির) অধিকারে ছিল। নেতাজী প্রেরিত 'আজাদ হিন্দ দল' ইউনিটের সাহায্যে তিনি এই অঞ্চল শাসন কর্‌ছিলেন। এই ইউনিটকে স্বাধীনীকৃত অঞ্চল কি ক'রে শাসন কর্‌তে হয় তা' বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছিল।

কর্ণেল কিয়ানি ওখানকার নামকরা নাগা সর্দ্দারদের ডেকে এক সভা ক'রে রসদের অভাবে সৈন্যদের কি দশা হ'য়েছে ভাল ক'রে বুঝিয়ে তা'দের বল্‌লেন—ওখান থেকে যদি রসদের ব্যবস্থা না হয়, তা' হ'লে তাঁর সৈন্যদলকে তামুতে ফিরে যেতে হবে। নাগা সর্দ্দারেরা কর্ণেল কিয়ানিকে পশ্চাদপসরণ কর্‌তে নিষেধ ক'রে বল্‌লে,—"আপনাদের ফৌজ ভারতের মুক্তিফৌজ—আমাদের মিনতি—আপনারা ফিরে যাবেন না। খাদ্যদ্রব্যের আমাদেরও গুরুতর অভাব, তবুও যতটা পারি আমরা আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ ক'রে দেব। যদি না খেয়ে মর্‌তে হয় ত এক সঙ্গেই মর্‌ব, বাঁচি ত এক সঙ্গেই বাঁচ্‌ব।

তারপর তারা নিজের নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধ্যমত আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য রসদ সংগ্রহ ক'রে আন্‌ল। কিন্তু সে আর কতটুকু? অনুর্ব্বর পাহাড়ে জায়গা থেকে ২০০০ সৈন্যের দীর্ঘকালের রসদ সংগ্রহ করা বড় সহজ কথা নয়। তা'দের আনা রসদ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হ'য়ে গেল—আবার সুরু হ'ল সেই রসদের জন্য দুর্ভাবনা।

নাগাদের একটুখানি পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। এরা পার্ব্বত্য জাতি—ইম্ফলের চারিধারের পাহাড়ে এদের বাস। সব চেয়ে বড় কথা—এরা সাহসী ও দেশভক্ত। আমাদের সৈন্যদের এরা নানা ভাবে সাহায্য ক'রেছে। আমাদের টহলদার সৈন্যদের এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় খবর এনে দিয়েছে, সবার ওপর এরা রসদ দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এদের কেউ কেউ ব্রিটিশদের একেবারে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। তারা বলে—তা'দের রাণীকে নাকি ব্রিটিশেরা বন্দী ক'রে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়েছে। নাগাদের একটি বিশেষত্ব হ'চ্ছে—তারা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা কর্‌তে একেবারেই রাজী নয়—এই জন্য জাপানী-অধিকৃত অঞ্চলে তা'দের কাউকে কাউকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। তারা বলত,—"আমাদের এ অঞ্চলে আমরা ব্রিটিশদের ত চাই-ই না,—জাপানীদেরও চাই না। এখানে আমরা আমাদের নিজেদের রাজারূপে চাই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে।"

যে সময়ের কথা বলছি—তখন একটি বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে : গান্ধী ব্রিগেডের সহকারী কম্যাণ্ড্যাণ্ট মেজর বি, জে, এস্ গারেওয়াল (Garewal) দুঃখ কষ্ট আর সহ্য ক'রতে না পেরে আজাদ হিন্দ দল ত্যাগ ক'রে ব্রিটিশ পক্ষে যোগ দেন। আমাদের সৈন্যদের মনোবল এতে অনেকখানি নষ্ট হ'য়ে যায়। মালয়ে গান্ধী ব্রিগেডের শিক্ষাদান কালে এবং ইম্ফল অভিযানের প্রথম দিকের যুদ্ধগুলিতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে শত্রুপক্ষ তা'দের সৈন্যদলকে বেশ ভাল ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে নেয়—তা' ছাড়া আমাদের সৈন্যদল কি অবস্থায় যুদ্ধ ক'রছে সে সংবাদও তারা সংগ্রহ করে, এর পর তারা আমাদের দলকে পুন-রাক্রমণ করে। স্থানীয় কয়েকজন গুপ্তচরের সাহায্যে কোন ফাঁকে আমাদের ক্লান্ত সৈন্যশ্রেণীর ভিতরে প্রবেশ ক'রে গান্ধী ব্রিগেডটিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে ফেলে। এই সময় যুদ্ধে লোকক্ষয়, রোগ ও অনাহারে মৃত্যু প্রভৃতি কারণে আমাদের সম্মুখ-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ২০০০ থেকে প্রায় ১০০০-এ গিয়ে দাঁড়ায়—এদেরও স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না। তা' ছাড়া শত্রুপক্ষ ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টার্সকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। এই সব নানা কারণে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটময় হ'য়ে ওঠে—তা' সত্ত্বেও ব্রিগেডের সহ-কারী কম্যাণ্ড্যাণ্ট মেজর আবিদ হোসেন (মেজর গারেও-য়ালের পরে ইনি এই পদে অভিষিক্ত হ'ন) মাত্র একটি

কোম্পানীর সাহায্যে শত্রুর বেষ্টন ভেদ ক'রে বেরিয়ে যান। তারপর ঐ ছোট দলটিকেই পুনরায় ভাল ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে শত্রুপক্ষের উপর পাল্টা আক্রমণ সুরু করেন। অতঃপর ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত গান্ধী ব্রিগেডকে অতি বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন।

শত্রুদের যে দল মাইথুনের উচ্চ পাহাড়ে এলাকা অধিকার ক'রেছিল—গান্ধী ব্রিগেড সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তা'দের উপর পাল্টা আক্রমণ সুরু করে। এই যুদ্ধে মেজর হাসান, লেফ্‌ট, রাম রাও এবং ক্যাপ্টেন তাজ মোহাম্মদ যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে 'সর্দ্দার-ই-জং' নামক বিখ্যাত পদক পুরস্কার পান।

জুলাইয়ের প্রথম দিকে যুদ্ধের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। যে জাপ-বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ এতদিন কোহিমা অঞ্চল দখল ক'রে ছিল—তারা সব তামুতে ফিরে এল। ইম্ফলের পশ্চিমে—বিষাণপুরের দিক থেকে যে সব জাপানী ও আজাদ হিন্দ সৈন্য ইম্ফলের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল তা'দের সব তিদ্দিমে ফিরে যেতে হ'ল। ফলে গান্ধী ব্রিগেডের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবার আশঙ্কাও রইল। এর উপর কোহিমা থেকে আমাদের পশ্চাদপসরণের পর ব্রিটিশেরা বিরাট সৈন্যদল ও রণ-সজ্জা নিয়ে ইম্ফলে এসে হাজির হ'ল—উদ্দেশ্য, ওখান থেকে তারা ব্রহ্মদেশে জাপানী সৈন্যদলের উপর তীব্র আক্রমণ সুরু ক'রবে। এই আক্রমণের পুরো চাপ পড়ল গিয়ে গান্ধী ব্রিগেডের উপর—

তাই বাধ্য হ'য়ে তা'দের কালেওয়া-তামু সড়ক ধরে কালে-ওয়াতে ফিরে আসতে হ'ল। পশ্চাদপসরণের পথে সুভাষ ব্রিগেডের মত এদেরও যথেষ্ট দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রতে হ'য়েছিল।

আজাদ ব্রিগেডের কার্য্যকলাপ

গান্ধী ব্রিগেড মালয় ছেড়ে যাবার পরই আজাদ ব্রিগেডও রওয়ানা হয়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি এরা রেঙ্গুনে এসে হাজির হয়। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম ক'রে এরা কালেওয়ার পথে তামুর দিকে যাত্রা করে। মে মাসের মাঝামাঝি এরা তামুতে এসে হাজির হবার পর এদের কম্যাণ্ডার কর্ণেল গুলজারা সিং ছামলে (Chamol) এদের ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার, জেনারেল এম্, জেড্, কিয়ানির সঙ্গে দেখা ক'রে এদের যথাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ নেন। আজাদ ব্রিগেডকে কাজ দেওয়া হ'ল—তারা পালেলের চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্রিটিশ সৈন্য দলের উপর গেরিলা আক্রমণ চালাবে। এদের যুদ্ধক্ষেত্র হবে তামু-পালেল সড়কের উত্তর দিকে, ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টার্স হবে মিন্থা (Mintha) অঞ্চলে।

ব্রিগেড বেশ তোড়জোড় ক'রে তা'দের কাজ সুরু ক'রে দিলে ও যে সব ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালাবে সেই সব ঘাঁটি প্রস্তুত ক'রলে কিন্তু বড় রকমের একটা আক্রমণ ক'রবার আগেই বর্ষা সুরু হ'য়ে গেল ও ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের নির্দ্দেশে কর্ণেল গুলজারা সিং তাঁর ইউনিটকে পশ্চাদপসরণ

ক'রতে আদেশ দিলেন। আজাদ ব্রিগেড প্রধান কালেওয়া-তামু সড়ক ধরে কালেওয়াতে ফিরে এল। গান্ধী ব্রিগেডও ঠিক ঐ সময় ওখানে ফিরে আসে।

ইম্ফল অভিযান কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের ইউনিটগুলির কার্য্যকলাপ

১নং—ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী।

এই দল ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশে এসে পৌঁছে; সেখান থেকে তা'দের হোমালিন-থয়াঙদাৎ (Homalin-Thaungdut) অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই দলের নেতৃত্ব-ভার প্রথমে ছিল লেফ্‌ট, সিন্ধের (Shcinde) উপর; পরে ঐ ভার গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন প্রীতম্ সিং। যুদ্ধ চল্‌বার সময় এই দলের উপর সেতু নির্ম্মাণ ও তামু-হুমাইন-উখরুল সড়কের সংস্কার কার্য্যের ভার পড়ে। এদের উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য এরা যথাযথ পালন ক'রে বর্ষাকালেও সড়ক-টাকে চলাচলের উপযোগী ক'রে রেখেছিল। পরে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য দলের সঙ্গে কালেওয়ায় ফিরে যায়।

২নং—মোটর ট্রানস্পোর্ট কোম্পানী।

১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজীর আগমনের কয়েক দিন পরেই সিঙ্গাপুরে এই দল গঠন করা হয়। নেতাজীর আহ্বানে যে সব অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক দেশের কাজে যোগ দিয়েছিল, প্রধানতঃ তা'দের নিয়েই এ দল গঠিত। যে সব

লোকের নিজেদের মোটর গাড়ী বা লরী ছিল তা'দের অনেকে নিজেদের গাড়ী ও লরী আজাদ হিন্দ ফৌজকে দিয়ে নিজেরাই তার ড্রাইভারের কাজ ক'রছিল। এ দলের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল অক্লান্তকর্ম্মী ক্যাপ্টেন হরনাম সিং-এর উপর। এই অফিসারটি তাঁর কার্য্য-দক্ষতার গুণে দলটির মধ্যে বিশেষ দৃঢ়মনোভাবের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৪৩এর সেপ্টেম্বর মাসে দলটিকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাওয়া হয়।

যুদ্ধের সময় এই দল মান্দালয় থেকে কালেওয়ার মধ্যে কাজ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে লোকজন ও মালপত্র বহন ক'রে এরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে যথেষ্ট সাহায্য করে। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ১নং ডিভিশানকে যখন কালেওয়ায় ফিরে আসতে হয় তখন ১নং এম্, টি, কোম্পানী কালেওয়া থেকে ইউ-এর মধ্যে সব কিছু বহন করেছিল। এই সময়ই (১৯৪৪ সালের জুলাই-অক্টোবর) এরা সব চেয়ে ভাল কাজ করে। প্রবল বর্ষার মধ্যে এরা ১নং ডিভিশানকে ইউ-তে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈন্যদের শারীরিক অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, ফির্বার সময় এই দলের সাহায্য না পেলে তা'দের অনেকে পথের মধ্যেই মারা প'ড়ত। এই দলের মাত্র ২০ খানা পুরাণো লরী ছিল—তারই সাহায্যে এরা প্রায় ৭০০০ লোককে হাঁটুসমান কাদায় ভরা ১০০ মাইল দুর্গম পথ বহন ক'রে এনেছে,—পথের মাঝে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট নদী ছিল—তার অধিকাংশ বন্যার জলে প্লাবিত হ'য়ে গিয়েছিল। এই লরীগুলির অধিকাংশ আবার

অনেক সময়ই কারখানায় মেরামত হ'তে গিয়ে প'ড়ে থাক্‌ত—তা' ছাড়া এদের রাস্তায় চালু রাখাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এর পর আবার পেট্রোল ও তেলের সমস্যা—এ দু'টি জিনিসই মেলা ভার। মিঃ জোরা সিং নামে রেঙ্গুনের এক অসামরিক ভদ্রলোক ও কর্ণেল আর্, এম্, আর্শাদ—এই দুইজন চোরা-বাজার থেকে এই দু'টি দ্রব্য অতি কষ্টে সংগ্রহ ক'রে দিতেন। আমাদের মিত্রপক্ষ এঞ্জিনের তেল বা মেরামতের জন্য গাড়ীর কোন অতিরিক্ত অংশ আমাদেব কোন দিন সরবরাহ করে নি। পরে ১নং ডিভিশানকে যখন মান্দালয় থেকে পাইনমানায় (Pyinmana) স্থানান্তরিত করা হয় তখন এই মোটর ট্রানস্পোর্ট কোম্পানীই দু'টি বড় বড় হাসপাতাল, সাপ্লাই ও অর্ডিন্যান্স ডিপোর সব কিছু এবং আনুমানিক ২০০০ রোগীকে স্থানান্তরিত করে।

এই কোম্পানী ও তার কম্যাণ্ডার আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য দীর্ঘকাল ধ'রে যা ক'রেছেন তা' সত্যিই প্রশংসনীয়।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি ১নং ডিভিশানের বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে নিম্নলিখিত বিশ্রাম-কেন্দ্রে রাখা হ'ল :—

ডিভিশনাল হেড্‌ কোয়ার্টার্স ··· মান্দালয়

১নং (সুভাষ ব্রিগেড) ··· বুদালিন

২নং (গান্ধী ব্রিগেড) ··· মান্দালয়

৩নং (আজাদ ব্রিগেড) ··· ছাউনগাউ (Choungou)

আজাদ হিন্দ ফৌজের 'বেস্‌ হস্পিট্যাল'গুলি রইল মেমায়ো (Maymayo) ও মানিওয়াতে (Manywa)।

এমনি ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী আক্রমণের অবসান হ'ল,—এই আক্রমণ সুরু হ'য়েছিল ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে। এই সময়ের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ অতি নিম্নস্তরের রণসজ্জা নিয়ে, রসদ সরবরাহের অভাবে মাঝে মাঝে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থেকে ভারতবর্ষের ভিতরে ১৫০ মাইল স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে এসেছিল। এদের আক্রমণকালে একবারও এরা যুদ্ধে পরাস্ত হয় নি এবং ব্রিটিশদের অনেক বেশী জন-বল ও উচ্চস্তরের সমরোপকরণ থাকা সত্ত্বেও তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন ঘাঁটি অধিকার ক'রতে পারে নি; অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশদের ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে অধিকার ক'রতে পারে নি—এ রকম খুব কমই ঘটেছে।

এই সব যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রায় ৪০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে।

এ কথা সকলেই জানেন যে, নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানীরা ইম্ফল অধিকার ক'রতে পারে নি। এক সময় এমন অবস্থা হ'য়েছিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে তারা ইম্ফল অধিকার ক'রে বসতে পারে—ইম্ফল থেকে দুই মাইল দূরে পর্য্যন্ত তারা এগিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশেরা কয়েকবার তা'দের সৈন্যদের ইম্ফল থেকে অপসারিত ক'রে দিমাপুরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রেছিল কিন্তু কোহিমায় অবস্থিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যদলের জন্য রাস্তা বন্ধ থাকায় ওদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। এই সড়ক খোলা পেলে ওরা নিশ্চয়ই ইম্ফল থেকে পশ্চাদপসরণ

ক'রত ; কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—ইম্ফলে ওদের যত সৈন্য আছে সব বন্দী করা, আর সমরোপকরণগুলি সব হস্তগত করা।

ইম্ফল স্থানটি সমতল হ'লেও চারিদিকে তার উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। এই সব পাহাড়ের মাঝে মাঝে র'য়েছে সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য-পথ—এই পথেই ব্রিটিশ সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করা সম্ভব ছিল। সুতরাং এগুলি বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় তা'দের আর ইম্ফল থেকে পশ্চাদপসরণের পথ ছিল না।

নেতাজীর নিজের ধারণা ছিল—আজাদ হিন্দ ফৌজের তখন যে শক্তি তা'তে তা'দের দ্বারা ভারতবর্ষ পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করা চলে না,—তা' ছাড়া জাপানীরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তা'দেরও বাধা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নেতাজীর মত ছিল—ব্রিটিশদের পাঁচটা ডিভিশানে যে দেড়লক্ষ ভারতীয় সৈন্য আছে তা'দের বন্দী ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজভুক্ত ক'রে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রবার কাজে লাগানো, আর শত্রু-পক্ষের সমরোপকরণ হস্তগত ক'রে নিজেদের খাঁকৃতি পূরণ করা।

পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ হওয়ায় ব্রিটিশদের সেখানে থেকেই মরিয়া হ'য়ে যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল। তা' ছাড়া উপায় ছিল না। দুইটি পথ কেবল তা'দের খোলা ছিল :—হয় বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করা, না হয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। শেষেরটাই তারা বেছে নিলে—যদিও অবস্থা তা'দের তখন বিশেষ বিপজ্জনক। আত্মরক্ষা ক'রবার জন্য তারা

বাক্স-ব্যূহ (Box-defence) রচনা ক'রলে। এই ব্যূহ-রচনায় সাজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্কগুলিকে শিবিরের চারিদিকে সাজিয়ে রাখ্‌তে হয়—এরা সব শিবিরের ইস্পাতের বেড়ার কাজ করে—পদাতিক সৈন্যরা এই ঘেরার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপানী বিমান-বাহিনী ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল ; আমাদের ভাগ্যদোষে সেই বিমান-বাহিনীকে জাপানীদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে নিয়ে যেতে হ'ল। সেখানে আমেরিকানদের সঙ্গে জাপানীদের জলে ও আকাশে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। ওরা এখানে থাকলে উপর থেকে অনায়াসে শত্রুপক্ষের বাক্স-ব্যূহকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিতে পারত। তা' ছাড়া জাপানী বিমান-বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশেরা আরাকান থেকে পুরো এক ডিভিশান সৈন্য বিমান-যোগে এখানে এনে ফেল্‌লে। জাপানী বিমান-বাহিনী এখানে থাক্‌লে এটা করা তা'দের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। প্রায় তিন মাস কাল ব্রিটিশ সৈন্যের সব কিছু সরবরাহ হ'য়েছে বিমানযোগে। জাপানীদের অধিকতর শক্তিশালী বিমান-বাহিনী এখানে উপস্থিত থাক্‌লে এটা করাও ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হ'ত না—সুতরাং তারা বাধ্য হ'য়ে আত্মসমর্পণ ক'রত। আমাদের ইম্ফল অভিযান ব্যর্থ হওয়ার আর একটি কারণ—আক্রমণ সুরু ক'রতে আমাদের একটু দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। জাপানীজ জেনারেল স্টাফের মনে ধারণা ছিল—খুব দেরী হ'লেও মে মাসের

মাঝামাঝি ইম্ফল দখল ক'রে ফেল্‌তে পার্‌বে ; এর পর বর্ষা সুরু হ'য়ে যাবে। ইত্যবসরে আমরা এদিকে সব কিছু গুছিয়ে নিতে পার্‌ব, ফলে ব্রিটিশেরা আর পাল্টা আক্রমণের সুযোগ পাবে না। তা' ছাড়া অবস্থা অনুকূল হ'লে কোহিমার আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যদল এগিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হ'য়ে বঙ্গদেশ ও বিহারে প্রবেশ ক'রতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই হিসাব মত কাজ হ'ল না। বর্ষা যখন সুরু হ'য়ে গেছে তখনও আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যদল ইম্ফল অধিকার ক'রবার চেষ্টায় ব্যস্ত। পরে ১৯৪৪ সালের জুনের শেষাশেষি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদলকে রসদ ও গোলাগুলি সরবরাহ করাই অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। ফলতঃ বৃষ্টি ও কাদা এই দুই শত্রুর জন্যেই আমাদের ইম্ফল অবরোধ ব্যর্থ হয়।

সত্য কথা ব'লতে গেলে ব'লতে হয়—আজাদ হিন্দ ফৌজের ইম্ফল আক্রমণকালে জাপানীদের যেরূপ সাহায্য ক'রবার কথা ছিল তা' তারা মোটেই করেনি। আমি এ কথা নিঃসঙ্কোচে ব'লতে পারি—তারাই আমাদের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ, তারা যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না ক'রত, তা'হলে ইম্ফল অভিযানের ইতিহাস আজ অন্য রকম হ'ত। আমার নিজের ধারণা—জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে বিশ্বাস ক'রতে পার্‌ত না। তারা তা'দের লিয়েজং অফিসারদের কাছ থেকে জান্‌তে পেরেছিল—আজাদ হিন্দ ফৌজ তা'দের কোনরকম প্রভুত্ব বরদাস্ত ক'রবে না, তা' ছাড়া

জাপানীরা ব্রিটিশদের স্থলাভিষিক্ত হ'তে গেলে আজাদ হিন্দ ফৌজ তা'দের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে। এইজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজকে বেশী শক্তিশালী ক'রে তোলায় তা'দের ভয় ছিল; তা' ছাড়া তা'দের আত্মপ্রত্যয় বড় বেশী ছিল। তারা মনে ক'রত—অপরের কোন সাহায্য না নিয়ে তারা নিজেরাই অনায়াসে ইম্ফল অধিকার ক'রতে পারবে। মেমিও-তে (Maymyo) জাপানীজ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হয় তা'তে ওদের সম্বন্ধে এই ধারণাটা আমার আরও বদ্ধমূল হয়। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়—ইম্ফলের ব্রিটিশ সৈন্যদের সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা, তিনি তার উত্তরে বলেন—"ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না।" অবশ্য তাঁর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এ কথা ব'লেছিলেন। যে সব জাপানী চীফ্ কম্যাণ্ডার ব্রিটিশদের সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য করেন—তিনি ছিলেন তার মধ্যে একজন।

আমাদের প্রথম আক্রমণ এমনি ক'রে বিফল হ'য়ে গেল।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নেতাজী ইউ-এ ছিলেন। যুদ্ধ-প্রত্যাগত আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে এইখানেই তাঁর দেখা হয়। কয়েকদিন পরে মান্দালয়ে গিয়ে নেতাজী ১নং ডিভিশানের ডিভিশনাল ও ব্রিগেড কম্যাণ্ডারদের নিয়ে একটা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে আলোচনার ফলে বুঝা যায়—সকল কম্যাণ্ডারেরই ধারণা,

জাপানীরাই বিশেষ ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংশ্লিষ্ট জাপানী লিয়েজং ডিপার্টমেন্ট—'ইয়াকুরো কিকন' আমাদের সকল কিছু পণ্ড ক'রেছে। সুতরাং সাব্যস্ত হয়—এই ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন ক'রে টৌকিওর খোদ জাপানী সরকার এবং ব্রহ্মদেশে ওদের জেনারেল হেড্ কোয়ার্টার্সের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন ক'রব।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে নেতাজী মেমিও যান। সেখানে আমরা একসঙ্গে সৈন্যদের হাসপাতাল দেখ্‌তে যাই। সেখানে তখন প্রায় ২০০০ রোগী ছিল। তা'দের অধিকাংশের অবস্থাই শোচনীয়, কেউ বা ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে, কেউ বা আমাশয়ে, কেউ বা গুলির আঘাতজনিত দুষ্ট ক্ষতে। ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্টের একটি দল এই হাসপাতালে নার্সের কাজ ক'রছিল। কর্ম্মের অনুপাতে তা'দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। বেলা দত্ত নামে ষোল বছরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে একা ৮৫ জন আমাশয়ে আক্রান্ত রোগীর সেবাশুশ্রূষার ভার নিয়েছিল। এই ৮৫ জনের জামাকাপড় ধোয়া, গা 'স্পঞ্জ' করা, জামাকাপড় পরানো—সব কাজ সে একা ক'রত। নেতাজী প্রত্যেকটি রোগীকে যখন দেখে বেড়াচ্ছিলেন তখন তা'দের প্রত্যেকে এই নার্সদের সম্বন্ধে যা ব'লেছিল সে কথা আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। তারা নেতাজীকে বলে—"বাড়ীতে আমাদের মা বোনেরাও এর চেয়ে ভাল শুশ্রূষা আমাদের কর্‌তে পার্‌ত না"। শুনে নেতাজীর চোখে জল এসে গেল।

নেতাজী বেলা দত্তের কাজের জন্য তাকে অভিনন্দিত ক'রে সেখান থেকে অন্যত্র গেলেন।

বেলা দত্ত শুধু ৮৫ জন রোগীকে দেখাশুনাই ক'রত না, তা'দের প্রত্যেকের রোগের ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ ছিল। সেই দিনই তার এই কৃতিত্বের জন্য তাকে নায়কের পদ থেকে হাবিলদারের পদে উন্নীত করা হয়।

ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্টের মেয়েদের সাহস, দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাব জন্য তা'দের প্রতি আমি পরম শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি। তা'দের হাসপাতালের উপর শত্রু-বিমান প্রায় প্রত্যহ বোমা ফেলেছে, মেশিনগান চালিয়েছে, অন্ততঃ তু'বার তা'দের কতকগুলি যে বাড়ীতে ছিল শত্রুর বোমার আঘাতে সেই বাড়ী চূর্ণ হ'য়ে সেই ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে; কিন্তু ভারতমাতার এই সাহসিনী মেয়েরা কিছুতেই তা'দের মনোবল হারায় নি।

এই দিনের আর একটা ঘটনার কথা আমার বেশ মনে পড়ে। হাসপাতালে একটি রোগী ভীষণ বেরিবেরিতে ভুগছিল, মুখটা তার ফুলে উঠেছিল। নেতাজী তার কাছে গিয়ে একটু রহস্য ক'রেই বল্‌লেন—"তুমি সেরে উঠ্‌ছ কবে—বলো?" রোগী তখনই উত্তর ক'রলো,—"নেতাজী, আপনি যেদিন আমাদের যুদ্ধে এগিয়ে যাবার আদেশ দেবেন সেইদিনই আমি ঠিক সেরে উঠ্‌ব"।

হাসপাতাল পরিদর্শন কালে নেতাজী বুঝলেন—ঔষধপত্রের সেখানে নিতান্ত অভাব,—বিশেষ করে আমাশয়ের। এই সব

রোগীদের কষ্ট দেখে নেতাজীর দুঃখ হ'ল—তিনি ঠিক ক'রলেন, এদের কিছু মুখরোচক জিনিস খাওয়াবেন। নিজের বাড়ীতে কিছু জিলিপি তৈরী করিয়ে তিনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে তিনি একটি আমাশয়ের রোগীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তার ভাগের জিলিপি সে পেয়েছে কি না—আর কেমন লাগল জিলিপি। রুগ্ন সৈনিক উত্তর দিলে,—"নেতাজী, জিলিপি আমার খুব ভাল লেগেছে, তা' ছাড়া ডাক্তারের ওষুধের চেয়েও এতে উপকার ক'রেছে বেশী। অনুগ্রহ ক'রে আর কিছু জিলিপির ব্যবস্থা ক'রবেন"। এর পর অনেকে রহস্য ক'রে নেতাজীকে বলত—'জিলিপি-ডাক্তার'।

নেতাজীর রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন

যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যদল পরিদর্শন শেষ করে ১৯৪৪ সালের ১১ই অক্টোবর নেতাজী মান্দালয় থেকে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহচর কর্ম্মীবৃন্দ (Personal staff) এবং ১নং ডিভিশানের ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার ও ব্রিগেড কম্যাণ্ডারেরা। মান্দালয় থাকবার সময়েই ৯ই অক্টোবর তারিখে নেতাজী জাপ-গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে টোকিও যাবার সরকারী আমন্ত্রণ পান—উদ্দেশ্য, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর কয়েকটি জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। জাপ-সরকারের কাছ থেকে এরূপ আমন্ত্রণ নেতাজীর প্রায়ই আসত। রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে নেতাজীকে জাপানীরা বিশেষ সম্ভ্রমের

চোখেই দেখ্‌ত—তাই জাপ-সরকার নেতাজীকে শুধু ভারতবর্ষের সম্বন্ধেই আলোচনা ক'রতে ডাক্‌তেন তা' নয়—জাপানের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ ক'রতেন। এবারকার এ আমন্ত্রণে আমরা খুশিই হ'য়েছিলাম— কারণ, ইম্ফল অভিযানে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিলাম তারই উপর নির্ভর ক'রে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতি নিরূপণ ক'রতে সুযোগ পাব।

রেঙ্গুনে উপস্থিত হবার পর আমাদের একটি মন্ত্রণা-সভা বসল। নেতাজী মন্ত্রণা-সভার অসামরিক সভ্যদের কাছে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা ক'রে বল্‌লেন—

"আক্রমণ আরম্ভ ক'রতে আমাদের দেরী হ'য়ে গিয়েছিল—বর্ষায় আমাদের বড় ক্ষতি ক'রেছে। রাস্তাগুলি সব জলে ডুবে গিয়েছিল। নদীপথে যাবার সময় প্রবল স্রোত ঠেলে আমাদের উজানে যেতে হ'ত। ওদিকে শত্রুপক্ষের রাস্তাঘাট ছিল অতি উন্নত ধরণের। আমাদের একমাত্র আশা ছিল বর্ষার আগে যদি আমরা ইম্ফল অধিকার ক'রে নিতে পারি—আর তা' আমরা পারতামও যদি আমরা যথেষ্ট বিমানের সাহায্য পেতাম; আর ঐখানে শত্রুদল শেষ সৈনিকটির প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে লড়্‌বার হুকুম যদি না পেত। জানুয়ারীতে যদি আমরা আক্রমণ সুরু ক'রতে পার্‌তাম তা' হ'লে আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হ'ত। বর্ষা সুরু হওয়ার আগে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা হয় এগিয়ে গিয়েছিলাম—না হয় শত্রুদলকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম।

আরাকান অঞ্চলে আমরা শত্রুদলকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, কালাদন অঞ্চলে আমরা শত্রুকে ছত্রভঙ্গ ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা তিদ্দিম, পালেল, কোহিমাতেও এগিয়ে গিয়েছিলাম। হাকা অঞ্চলে আমরা শত্রুদলকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী ছিল, তা' ছাড়া তা'দের সমরোপকরণ ও রসদের ব্যবস্থাও আমাদের চেয়ে অনেক ভাল; এ সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যদল যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা' খুবই গৌরবের বিষয়।

বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইম্ফলের সাধারণ আক্রমণ বন্ধ রাখি। ইত্যবসরে শত্রুপক্ষ সাজোয়া বাহিনী পাঠিয়ে কোহিমা-ইম্ফল সড়ক পুনরধিকার ক'রে নেয়। এই সময় প্রশ্ন ওঠে—যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যরা এখন কোথায় অবস্থান ক'রবে। দু'টি মাত্র উপায় আমাদের হাতে ছিল: হয় বিষাণপুর-পালেল ক্ষেত্র দখল ক'রে ব'সে থেকে শত্রুর অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া—না হয় পিছিয়ে এসে অপেক্ষাকৃত অনুকূল স্থানে অবস্থান করা।

এখন জিজ্ঞাস্য—এই অভিযান থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? তার উত্তর হচ্ছে—এই অভিযানে আমরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছি। গোলাগুলি ফুরিয়ে গেলে এক দল প্রাক্তন অসামরিক-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রতে বলা হয়, তারা এতে রাজী না হ'য়ে সঙ্গিন উঁচিয়ে শত্রুদলের উপর লাফিয়ে পড়ে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হ'য়ে ফিরে আসে।

আমাদের সৈন্যদলের আত্মপ্রত্যয়ও অনেক বেড়ে গেছে। আমরা এ কথাও জান্‌তে পেরেছি যে শত্রুপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদল আমাদের ফৌজে যোগদান ক'রতে চায়। তা'দের স্বদলভুক্ত করার আয়োজনও আমাদের এখন করা দরকার। শত্রুপক্ষের সকল কৌশল এখন আমাদের জানা। ওদের অনেক দলিলপত্রও এখন আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। গত যুদ্ধে আমাদের কম্যাণ্ডারেরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন তার মূল্যও অনেক। অভিযান সুরু হবার আগে জাপানীদের আমাদের সৈন্যদের উপরে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না— আমাদেব বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভেঙ্গে তারা নিজেদের সৈন্যদলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিতে চেয়েছিল। একটি রণাঙ্গন আমি আমাদের ফৌজের হাতে ছেড়ে দিতে বলেছিলাম— ওরা অবশেষে তা' দিয়েও ছিল। এই যুদ্ধ থেকে আমাদের ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার ও অন্যান্য অফিসারেরা প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন।

আমাদের ত্রুটিগুলিও এবার ধরা প'ড়ে গেছে। দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে আমরা যানবাহন ও রসদের ভাল ব্যবস্থা ক'রতে পারি নি। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচারের ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। এ উদ্দেশ্যে আমরা লোক তৈরী ক'রেছিলাম বটে কিন্তু যানবাহনের অভাবে প্রচারকার্য্য তারা কিছুই ক'রতে পারে নি। এখন থেকে আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক ইউনিটের সঙ্গে একটি ক'রে প্রচারক ইউনিট রাখ্‌তে হবে। জাপানীদের কাছে আমরা 'লাউড

স্বীকার' চেয়েছিলাম—ওরা তা' আমাদের দেয় নি। এখন ও যন্ত্র আমরা নিজেরাই তৈরী কর্‌ছি”।

এরপর আমাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়—আমাদের দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আরও স্থির হয়, ব্রিটিশদের আমরা যেখানে পাব সেইখানেই তা'দেব সঙ্গে ল'ড়ব—এই উদ্দেশ্যে এবং শত্রুর বল নিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনে সাব্যস্ত করা হয়, আমাদেব চেষ্টা আরও বাড়াতে হবে আর পূর্ব্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের সব কিছু এই যুদ্ধের কাজে একত্র সমাবেশ ক'রবার চেষ্টা ক'রতে হবে।

ইম্ফলেব চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ ক'রবাব সময় আমাদের আর একটা ত্রুটি ধরা পড়ে—সেটি হচ্ছে ঔষধপত্র, রসদ ইত্যাদির জন্য সর্ব্বদা জাপানীদের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এরূপ কোন ত্রুটি না ঘটে সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হ'তে হবে। এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের একটি সরবরাহ-বিভাগ খোলা হয়—এর সচিব হ'লেন শ্রীপরমানন্দ। আর একটি সিদ্ধান্ত হ'ল—জাপানী লিয়েজং ডিপার্টমেণ্টের (ইয়াকুরো কিকন) সঙ্গে আমরা সকল সম্বন্ধ ঘুঁচিয়ে দেব। এর আগে এই ডিপার্টমেণ্টের মারফতে আমাদের জাপানী সরকারের সঙ্গে কাজ কারবার হ'ত—এখন সাব্যস্ত হ'ল, সরাসরি টোকিও গবর্ণমেণ্টের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ স্থাপন ক'রতে হবে। এই সভায় আরও সাব্যস্ত হয়, সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের একটি পররাষ্ট্র বিভাগ খোলা হবে

এবং পররাষ্ট্র-সচিব হবেন জেনারেল চ্যাটার্জ্জি। জাপানের সঙ্গে রাজদূত বিনিময় ক'রবার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়।

অবশেষে—ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নির্দ্দেশ দেবার জন্য একটি সমর-পরিষদ্‌ও গঠিত হয়। আলোচনায় স্থির হয়—আজাদ হিন্দের এই কাজের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী নিষ্প্রয়োজন বৃহদায়তন হ'য়ে পড়ে, তার চেয়ে ছোট অথচ কর্ম্মদক্ষ একটি পরিষদ্ হ'লেই এর কাজ ভাল চল্‌বে। সমর-পরিষদের সভ্যদের নাম নিম্নে বিবৃত হ'ল :—

১। নেতাজী
২। জেনারেল ভোঁসলা
৩। জেনারেল চ্যাটার্জ্জি
৪। জেনারেল এম্, জেড, কিয়ানি
৫। কর্ণেল আজিজ আহম্মদ
৬। কর্ণেল ইশান কাদির
৭। কর্ণেল হবিবুর রহমান
৮। কর্ণেল গুলজারা সিং
৯। শ্রীপরমানন্দ
১০। শ্রীরাঘবন্
১১। কর্ণেল আই, জে, কিয়ানি
১২। কর্ণেল শাহনওয়াজ খান্

সমর-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ক'রতে হবে ব'লে যে সিদ্ধান্ত করা হ'য়েছিল তদনুসারে আজাদ হিন্দ ফৌজে নতুন নতুন সৈন্য ভর্ত্তি করা হ'তে লাগ্‌ল। আইপো (Ipoh), কুয়েলা লামপুর,

পেনাঙ, সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুনে অসামরিক ব্যক্তিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে আরও বিস্তৃত করা হ'ল। এর ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হ'ল—এমন কি, শেষের দিকে ঐ সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। এই সময় ফৌজের ২নং ডিভিশানকে ব্রহ্মদেশে পাঠানো হয়—তা' ছাড়া কর্ণেল জি, আর্, নাগরের নেতৃত্বে ফৌজের তৃতীয় ডিভিশান গ'ড়ে তোলা হয়। ২নং ডিভিশানের অগ্রগামী দল ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে রেঙ্গুনে পৌঁছয়।

নভেম্বরের প্রথম দিকে নেতাজী, জেনারেল চ্যাটার্জ্জি, জেনারেল কিয়ানি এবং হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুন থেকে টোকিও যাত্রা করেন। তাঁর যাত্রার পূর্ব্বেই তাঁর অনুপস্থিতিকালে কর্ণেল আজিজ আহম্মদ সর্ব্বাধিনায়কত্ব ক'রবেন ঠিক করা হয়। জেনারেল কিয়ানিকে সমর-পরিষদের-জেনারেল সেক্রেটারী করা হয়, সুতরাং তাঁর পরিবর্ত্তে আমাকে করা হয় ১নং ডিভিশানের কম্যাণ্ডার। নেতাজী আদেশ দেন—মান্দালয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ আজাদ হিন্দ ফৌজকে ওখান থেকে ২০০ মাইল দূরে পাইনমানায় (Pyinmana) নিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি মান্দালয়ে ফিরে এসে ১নং ডিভিশানকে ওখান থেকে সরাতে সুরু করি। কাজটা মোটেই সহজ হ'ল না—পদে পদে বাধা-বিপত্তি। পর্য্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না—প্রবল বোমারু-বিমান-আক্রমণের ফলে রেলওয়ে লাইনগুলি

অকেজো হ'য়ে গিয়েছে। যাই হ'ক ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীর শেষাশেষি ১নং ডিভিশান এবং মেমিয়ো ও মনিওয়ার হাসপাতাল সরানোর কাজ আমার শেষ হ'য়ে যায়, তা' ছাড়া পাইনমানাতে একটা নতুন ডিভিশনাল ক্যাম্পও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইত্যবসরে নেতাজী তাঁর দলবল নিয়ে টোকিও থেকে ফিরে আসেন। সেখানে জাপ-সরকার নেতাজীর সকল প্রস্তাবই মেনে নেন। অতঃপর ২নং ডিভিশানকে পোপা পাহাড় (Popa hill) অঞ্চলে যুদ্ধ ক'রতে পাঠানো সাব্যস্ত হয়।

পোপার যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত [illegible]র সাইগলের অধীনস্থ বোমাবর্ষী কামান-বাহিনী।

প্যালেল যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ ফৌজ মেশিনগানবাহী দল।

"তাহারা তীর ধনুক থেকে মেশিনগান পর্য্যন্ত যখন যে অস্ত্র পেয়েছে তাই নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।" কোহিমায় যুদ্ধরত সুভাষ-বাহিনীর এক দল

নেতাজী সপ্তাহ

[এক বিদ্রোহিণী কন্যার রোজনামচা থেকে উদ্ধৃত]

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪

২রা জুলাই রণাঙ্গন পরিদর্শন ক'রে সুভাষবাবু রেঙ্গুনে ফিরে আসেন। তিনি গত দুই মাস সমগ্র রণাঙ্গনে পর্য্যটন ক'রে ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন।

আজ ৪ঠা জুলাই 'নেতাজী সপ্তাহ' আরম্ভ। গত বৎসর এই দিনে সুভাষচন্দ্র সিওনন (Syonan) বৈঠকে পূর্ব্ব-এশিয়ার আন্দোলনের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। ৪ঠা জুলাই!—গত বৎসব এই দিনে ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল,—'স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু'—এই হবে তা'দের জীবনের বীজমন্ত্র।

আজ আবার সেই 'জুবিলি হলে' তিলধারণের স্থান নেই। বাইরে রাস্তার ধারে 'লাউড স্পীকার' বসানো হ'য়েছে। সমস্ত জায়গাটা যেন পাথরের নুড়ির পরিবর্ত্তে মানুষের মাথা দিয়ে বান্ধান হ'য়েছে। বাইরের রাস্তা, সিঁড়ি, হল ঘর, তার সামনের বারান্দা, সব জায়গায় লোক গিস্ গিস্ ক'রছে। নেতাজী গত বৎসরের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা ক'রে ব'লতে লাগলেন—

"গত বারো মাসে আমরা যা ক'রেছি—তা' সংক্ষেপে ব'লতে গেলে এই দাঁড়ায় :—

১। যুদ্ধকার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ (Total Mobilisation) নীতির অনুসরণ ক'রে আমরা ধন, জন ও বস্তু সংগ্রহ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছি।

২। আমরা আমাদের সৈন্যদলকে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ক'রেছি এবং তা'দের সংখ্যাও বাড়িয়েছি।

৩। আমরা আমাদের সৈন্যদলে ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্ট নামে একটি নারী-বিভাগ গঠন ক'রেছি।

৪। আর্জি হকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ (Arzi Hukumat -e-Azad Hind) নামে আমরা আমাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, নয়টি মিত্র শক্তি আমাদের এ গবর্ণমেণ্টকে মেনে নিয়েছে।

৫। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এবং নিকোবার দ্বীপ আমরা আমাদের স্বাধীন রাজ্য হিসাবে এর মধ্যেই লাভ ক'রেছি।

৬। আমরা আমাদের হেড্ কোয়ার্টার্স ব্রহ্মদেশে এগিয়ে নিয়ে যাই, সেখান থেকে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু করি। ২১শে মার্চ্চ তারিখে জগদ্বাসীর কাছে আমাদের ঘোষণা করা সম্ভব হয় যে আমাদের সৈন্যদল ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রেছে।

৭। আমরা আমাদের প্রেস-প্রচার বিভাগ (Press-Propaganda-Publicity Department) এর কাজ যথেষ্ট বাড়িয়েছি।

৮। আজাদ হিন্দ দল নামে আমরা এক নতুন প্রতিষ্ঠান

গড়েছি, এ বিভাগ স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসন ও পুনর্গঠন কার্য্যের ভার গ্রহণ ক'রেছে।

৯। ব্রহ্মদেশে আমরা নিজেদের একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, এর নাম দেওয়া হ'য়েছে 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব আজাদ হিন্দ লিমিটেড্'। স্বাধীন ভারতবর্ষে চালাবার জন্য আমাদের নিজেদের 'কারেন্সি নোট' ও মুদ্রা প্রস্তুত ক'রবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

১০। রণাঙ্গনের প্রত্যেক স্থানে (Sector) আমরা কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছি এবং আমাদের সৈন্যরা অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ভারতবর্ষের ভিতর এগিয়ে যাচ্ছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ আদৌ যুদ্ধে নামবে কি না এ বিষয়ে লোকের মনে প্রথমে বিশেষ সন্দেহ ছিল,—নামলেও হয়ত তারা শত্রুদলকে পরাস্ত ক'রতে পারবে না। সে পরীক্ষায় আমরা এখন উত্তীর্ণ হ'য়েছি,—যুদ্ধে বিজয় লাভ ক'রে আমাদের আত্মপ্রত্যয় অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে.

ভারত-ভূমিতে যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হ'চ্ছে এটা আমাদের যুদ্ধ, আর আমাদের যুদ্ধ মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, রণাঙ্গনে শুধু যারা আছে তা'দের মধ্যেই নয়, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রয়েছে তা'দের মধ্যেও এ সাড়া প'ড়ে গেছে।

আমাদের সৈন্যদের অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রতে হচ্ছে এ কথা ঠিক, কিন্তু এর জন্য তারা কোন ক্ষোভ প্রকাশ

করেছে এমন কথা আমার কানে আসে নি। আমাদের সৈন্যদলের কাছ থেকে একমাত্র অভিযোগ সময়ে সময়ে এসেছে যখন তা'দের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে দেরী হ'য়েছে। সম্প্রতি আমি আমাদের হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে যে সব রোগী র'য়েছে তাদের কেউ বা যুদ্ধে আহত, কেউ বা ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন অসুখে ভুগ্‌ছে। এদের সবারই ইচ্ছা সুস্থ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। এদের সবারই যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আছে, সেখানকার দুঃখ-কষ্ট তা'দের জানা, তবু তারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পার্‌লেই খুশি হয়। তা'দের ধারণা—জয়লাভ তারা ক'রবেই। পূর্ব্ব-এশিয়ার সকল ভারতীয়েরই মনোভাব এই—একথা বল্‌লে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না।

তা' ছাড়া ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন যা তা'তেও আমাদের কিছু আশা ক'রবার আছে। আপনারা সকলেই জানেন—আমাদের কংগ্রেস পার্টি আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সেখানে কোন আপোষ হয় নি। কিছুদিন আগে মহাত্মা গান্ধীকে কারাবাস থেকে মুক্তি দেওয়া হ'য়েছে। এটা কি তাঁ'র অসুস্থতার দরুণ, না—এর মূলে কোন আপোষের ইচ্ছা কাজ করছে—লোকে প্রথমে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। এখন বেশ পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে—মহাত্মাজীকে তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে, কোন রাজনৈতিক কারণে নয়। মহাত্মা গান্ধী ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আপোষ না হ'লে আমাদের উদ্বেগের কোন

কারণ নাই। ভারতের অভ্যন্তরে এই আপোষ না হ'লেই আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হবে। যাই হ'ক এ পর্য্যন্ত আপোষের কোন সম্ভাবনা সেখানে দেখা যায় নি—আর সবচেয়ে আশার কথা এই যে, মহাত্মাজীর মতের একটুও নড়চড় হয় নি: দু' বৎসর আগে তিনি যে মনোভাব নিয়ে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব ঘোষণা ক'রেছিলেন—এখনও তাঁর সে মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি।

এ দ্বারা আমি এই বুঝি যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের পক্ষে খুবই অনুকূল। এ কথা সকলেই বোঝেন যে, যতদিন ব্রিটিশ সরকার আর কংগ্রেসের ভিতরে কোন মিটমাট না হয় ততদিন দেশবাসীর মন ব্রিটিশদের প্রতি বিরূপ থাক্‌বেই। যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে যত আমরা ভারতবর্ষের ভিতরে এগিয়ে যাব, দেশবাসী তত বুঝবে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া স্বাধীনতা লাভের আর অন্য উপায় নেই; সুতরাং তারা নিজেরাও যুদ্ধে যোগদান ক'রতে অগ্রসর হবে ও আমাদের যুদ্ধ-পরিচালনায় সব রকম সাহায্য ক'রবে।"

শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত নেতাজীর বক্তৃতা শুন্‌লেন। সভাভঙ্গের পর ভিড় ভাঙ্গ্‌তে লেগে গেল প্রায় দেড় ঘণ্টা। কি বিপুল উৎসাহ সবার!

৫ই জুলাই, ১৯৪৪,

আজ নেতাজী-সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। এই দিন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা রেঙ্গুনে প্যারেড ক'রল—নেতাজী তাদের অভিবাদন গ্রহণ ক'রলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

ফৌজের অঙ্গন-প্রবেশ ও ত্যাগের ভঙ্গীটিও হ'য়েছিল অতি চমৎকার। নেতাজী আমাদের ভূয়সী প্রশংসা ক'রলেন, তিনি বল্‌লেন—

"আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন শত্রুপক্ষের অত্যন্ত উদ্বেগ ও ভয়ের কারণ হ'য়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম তারা এর অস্তিত্ব স্বীকার ক'রতেই চায় নি, কিন্তু খবরটা যখন আর কিছুতেই চেপে রাখা গেল না, তখন তারা নিজেদের আয়ত্তাধীন দিল্লীর ভারত-বিরোধী বেতার-যন্ত্রের সাহায্যে প্রচার ক'রতে লাগ্‌ল যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীরা জাপানীদের হাতে প'ড়ে বাধ্য হ'য়ে সৈন্যদলে যোগ দিচ্ছে। এই মিথ্যা প্রচারে অবশ্য বেশী দিন ফল হয় নি—কারণ, ভারতবর্ষে সংবাদ আস্‌তে লাগ্‌ল—পূর্ব্ব-এশিয়ার অসামরিক ভারতীয়েরা দলে দলে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ক'রছে। এই সংবাদ আস্‌বার পর ভারত-বিরোধী বেতার-যন্ত্রের সুদক্ষ কর্ম্মিগণ আবার নতুন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে। তারা প্রচার ক'রতে লাগল—যুদ্ধবন্দীরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ক'রতে অস্বীকার করায় অসামরিক ভারতীয়দের তাতে যোগ দিতে বাধ্য করা হ'চ্ছে। দিল্লীর এই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাথায় ঢোকে নি যে, যদি যুদ্ধবন্দীদের জোর ক'রে ফৌজে যোগদান করানো অসম্ভব হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে অসামরিক ব্যক্তিদের বলপূর্ব্বক ফৌজে ঢোকানো আরও অসম্ভব।

একটু বুদ্ধি থাক্‌লেই বুঝা যায় যে, জোর ক'রে অর্থলোভী সৈন্যদল গঠন করা তবুও সম্ভব কিন্তু জোর ক'রে স্বেচ্ছাসেবক-

বাহিনী গ'ড়ে তোলা কখনও সম্ভব নয়। আপনারা হয়ত কোনও লোককে বাধ্য ক'রে বন্দুক কাঁধে নেওয়াতে পারেন কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দেবে—এ আপনারা তাকে দিয়ে কিছুতেই করাতে পারেন না।

প্রথম প্রথম আমাদের শত্রুরা বলত—আজাদ হিন্দ ফৌজ আদৌ কোন সৈন্যদল নয় প্রচারের সুবিধার জন্য ওদের শুধু খাড়া করা হ'য়েছে—যুদ্ধ ওরা কোন দিন ক'রবে না। পরে দিল্লীর ভারত-বিরোধী রেডিও জোর গলায় ঘোষণা ক'রতে সুরু করে—আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত সীমান্ত অতিক্রম ক'রতে পারে নি। এখন যখন আমাদের ফৌজ সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভারতের মাটিতেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রছে, শত্রু-প্রচারকেরা এখন অন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। তারা এখন প্রচার ক'রছে যে আমরা দিল্লী প্রবেশের একটা দিন ঠিক ক'রেছিলাম—যে তারিখে আমাদের ওখানে পৌঁছবার কথা ছিল, সে তারিখ পেরিয়ে গেছে, অথচ আমরা ওখানে পৌঁছতে পারি নি ব'লে তারা এখন আমাদের বিদ্রূপ ক'রছে।

আমি এর আগেই ব'লেছি—আমাদের ফৌজ প্রাক্তন সামরিক ও অসামরিক লোক নিয়ে গঠিত, আমি আরও জানাচ্ছি যে আমাদের ফৌজে শুধু পুরুষ নয়, মেয়েরাও আছেন।

বন্ধুগণ, আমাদের ফৌজ শুধু যে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত তাই নয়—এর শিক্ষাদানও ক'রেছেন ভারতীয়েরা।

আর তা'রা ভারতীয় অফিসারের নেতৃত্বেই আজ যুদ্ধ ক'রছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারেরই সামরিক অঙ্গ। এই সাময়িক সরকার এবং তার ফৌজ ভারতীয় জাতিরই সেবক। এদের কাজ হ'চ্ছে—যুদ্ধ ক'রে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। ভারত স্বাধীন হ'বার পর এর অধিবাসীরাই ঠিক ক'রবে—কেমন শাসন-ব্যবস্থা তার হবে। সাময়িক গবর্ণমেণ্টকে তখন ভারতের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারে সংস্কৃত ক'রে স্থায়ী গবর্ণমেণ্টে পরিণত ক'রতে হ'বে। সেই গৌরবময় দিনের আশায় আমরা এখন প্রাণ-পণে যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছি।"

বহু সহস্র কণ্ঠের জয়হিন্দ ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সৈন্যরা তা'দের রাইফেল কাঁধের উপর তুলে ধ'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—চলো দিল্লী—জয় হিন্দ।

এরপর নেতাজী আরাকান যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা ক'রে ঐ রণাঙ্গনে সুনেতৃত্ব ক'রবার পুরস্কার-স্বরূপ মেজর এল্, এস্, মিশ্রকে 'সর্দ্দার-ই-জং' পদকে ভূষিত ক'রলেন। ঐ তারিখেই তিনি লেফ্‌ট, প্রীতম সিং-কে তাঁর স্বদেশভক্তি, সাহস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার জন্য 'বীর-ই-হিন্দ' পদকে ভূষিত করেন।

৬ই জুলাই, ১৯৪৪,

আজ নেতাজী মহাত্মাজীকে সম্বোধন ক'রেবেতার বক্তৃতা করেন।

ছেলে তার বাপের কাছে যেমন ক'রে প্রাণ খুলে কথা বলে—ঠিক তেমনি ক'রে মনের সুখদুঃখের একটি কথা একটু ভাব গোপন না ক'রে তিনি বেতারে ব'লতে লাগ্‌লেন—

"মহাত্মাজী,

ব্রিটিশ কারাগারে শ্রীযুক্তা কস্তুরবার মৃত্যুর পর দেশবাসীরা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন, এটা স্বাভাবিক।...ভারতবর্ষের বাইরে যে সব ভারতীয় আছেন তাঁদের কাছে পদ্ধতির অনৈক্য পারিবারিক অনৈক্যেরই সমান। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোরের কংগ্রেসে আপনি যখন স্বাধীনতার প্রস্তাব ঘোষণা করেন, তখন থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সকল সভ্যের ঐ একই লক্ষ্য। ভারতের বাহিরের ভারতীয়েরা জানে—ভারতবর্ষে আজ যে জাগরণের সাড়া প'ড়েছে এর মূলে র'য়েছেন আপনি।...ভারতের বাহিরের ভারতীয়েরা এবং ভারত-স্বাধীনতার পক্ষপাতী বিদেশী বন্ধুরা আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ ক'রতেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে আপনার 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ঘোষণার পর তা' তাঁ'দের শতগুণ বেড়ে গেছে।...

ব্রিটিশ জনগণকে যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট থেকে আমরা পৃথক্ ক'রে দেখি তা' হলে আমরা মস্তবড় ভুল ক'রব। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্রিটেনেও এমন একদল আদর্শবাদী লোক আছেন যাঁরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রবার পক্ষ-পাতী। এই আদর্শবাদী লোকগুলিকে ওদের দেশের

লোকেরা বলে পাগল—তা' ছাড়া এরূপ লোকের সংখ্যাও নগণ্য। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একমত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি শুধু এই কথা ব'লতে চাই যে, ওয়াশিংটনের শাসন-পরিচালক কূটনীতিজ্ঞেরা এখন জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখ্ছেন। এই সব কূটনীতিজ্ঞ এবং তাঁদেব বিজ্ঞ প্রতিনিধিদল প্রকাশ্যভাবেই 'মার্কিণ শতাব্দী'র (American Century) কথা ব'ল্তে সুরু ক'রে দিয়েছেন। এদের মধ্যে এমন উগ্রপন্থী দলও আছেন যাঁরা বলেন, 'ব্রিটেন ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই উনপঞ্চাশত্তম রাষ্ট্র'।...

মহাত্মাজী,—আপনি বিশ্বাস করুন—এই কঠিন বিপৎসঙ্কুল পথে যাত্রা ক'রবার আগে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমি এর ফলাফল নিবিষ্ট মনে চিন্তা ক'রেছি। জীবনের এতদিন ধ'রে প্রাণপণে দেশবাসীর সেবা ক'রে এসে শেষে তা'দের কাছে বিশ্বাসঘাতক হবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না—শুধু তাই নয়, আমি চেয়েছিলাম—আমাকে বিশ্বাসঘাতক ব'লবার সুযোগও কেউ না পান।...দেশবাসীর দয়া ও স্নেহ-গুণে আমার কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভারতের দেশকর্ম্মীর শ্রেষ্ঠ সম্মান আমি পেয়েছি। এ ছাড়া আমার অতি অনুগত এবং আমার প্রতি সমধিক আস্থাবান্ সহযোগিদের নিয়ে আমি একটি দলও গঠন ক'রেছিলাম। সুতরাং বিপৎসঙ্কুল পথে যাত্রা ক'রে আমি আমার নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎই বিপদের মুখে

তুলে ধ'রেছি। শুধু তাই নয়—আমার দলের ভবিষ্যৎও বিপন্ন ক'রেছি। বাইরে না এলেও ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব হবে—এরূপ আশা যদি আমার বিন্দুমাত্র থাকৃত, তা' হ'লে এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমি কখনও ভারতভূমি ত্যাগ ক'রতাম না। যদি আমার মনে একটুও আশা থাকৃত যে, আমাদের জীবদ্দশায় ভারতের স্বাধীনতালাভের এমনি আর একটা সুবর্ণ-সুযোগ আমরা পাব তা' হ'লেও বোধ হয় আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে প'ড়তাম না।

আর একটি মাত্র প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে চাই—এ প্রশ্নটা হ'চ্ছে অক্ষশক্তি সম্বন্ধে। ওরা আমায় প্রতারণা ক'রেছে—এও কি সম্ভব? এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার ক'রবেন যে ব্রিটিশদের মত কূট-রাজনৈতিক আর জগতে নেই। সারা জীবন ধ'রে এদের সঙ্গে রাজনৈতিক চাল দিতে হ'য়েছে—লড়্‌তে হ'য়েছে যার—সে জগতের অন্য কোন রাজনৈতিকের দ্বারা প্রতারিত হবে এ কখনও সম্ভব নয়। ব্রিটিশ রাজনৈতিকেরা যখন আমায় মিষ্টি কথায় বা জোর ক'রে ভজাতে পারে নি, তখন জগতের অন্য কোন দেশের রাজনৈতিকেরও সে সাধ্য নেই। যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আমাকে কত কারাদণ্ড, নির্য্যাতন ও প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ ক'রতে হ'য়েছে—তারা যখন আমায় দমাতে পারে নি, তখন আশা করি—জগতের কোন শক্তিই তা' পার্‌বে না—যাতে দেশের সম্মান, আত্মমর্য্যাদা বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোন কাজ আমি কোন দিনই করি নি।

এমন দিন ছিল যখন জাপান আমাদের শত্রুদের মিত্র-পক্ষ ছিল। এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী থাক্‌বার সময় আমি জাপানে আসি নি। যখন এদের মধ্যে সাধারণ রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বজায় ছিল তখনও আমি আসি নি। আমি এসেছি তখন—যখন জাপান তার জাতীয় জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নেমেছে, অর্থাৎ সে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে; এই সময় আমি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়েই জাপানে এসেছি।...১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে আমার অন্যান্য দেশবাসীর মত আমারও পূর্ণ সহানুভূতি ছিল চুংকিং-এর উপর। আপনার হয়ত মনে থাকৃতে পারে—আমি কংগ্রেসের সভাপতি থাক্‌বার সময় ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার চেষ্টাতেই চুংকিং-এ 'মেডিক্যাল মিশন' পাঠানো হয়।

মহাত্মাজী,—ভারতীয়েরা শুধু মুখের কথায় যে বিশ্বাস করে না, একথা আপনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন, সুতরাং এ-ও আপনি জান্‌বেন—শুধু জাপানীদের মুখের কথায় আমি ভুল্‌ব না।

মহাত্মাজী,—এইবার আমি আমাদের সাময়িক গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ব'লতে চাই। আমরা এখানে যে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল অস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ-অধীনতা-পাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা। ভারতবর্ষ থেকে শত্রু বিতাড়িত হবার পর সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ'লেই এই

সাময়িক গবর্ণমেণ্টের কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।...আমাদের এই উত্তম, দুঃখকষ্ট ও আত্মত্যাগের একমাত্র পুরস্কার চাই আমরা শুধু জন্মভূমির স্বাধীনতা। আমাদের ভিতরে এমন অনেকে আছেন—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর যাঁরা রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রতে চান।......

যে সব ভারতীয়েরা ভারতের অভ্যন্তরে বাস ক'রছেন তাঁরা যদি কোন রকমে নিজেদের চেষ্টায় দেশ স্বাধীন ক'রতে পারেন, অথবা ব্রিটিশেরা যদি আপনার 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবানুযায়ী ভারত ছেড়ে চ'লে যায়, তা' হ'লে আমাদের চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। আমরা কিন্তু ধ'রে নিয়েছি, কার্য্যতঃ ঐ দুইটার কোনটাই সম্ভব হবে না, তাই সশস্ত্র সংগ্রাম অনিবার্য্য।...ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম সুরু হ'য়ে গেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল ভারত-ভূমিতেই এখন যুদ্ধ ক'রছে এবং একটু ধীরে হ'লেও দৃঢ়-পদক্ষেপে তা'রা ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হ'চ্ছে। ভারতবর্ষে একটি ইংরেজ থাকা পর্য্যন্ত এবং নয়াদিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা না উড়া পর্য্যন্ত আমাদের এ যুদ্ধ থামবে না।

আপনি আমাদের জাতির পিতা—তাই ভারতের এই পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"

৯ই জুলাই, ১৯৪৪

আজ সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে নেতাজী মুসলিম

কোটিপতি শ্রীহাবিবের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের মহিমা ঘোষণা করেন। শ্রীহাবিব প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন, বিষয়-সম্পত্তি দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের হাতে অর্পণ ক'রেছেন। নেতাজী তাঁকে 'সেবক-ই-হিন্দ' নামক গৌরবজনক পদকে ভূষিত করেন—এই সম্মান তিনিই প্রথম লাভ ক'রলেন।

ভারতবর্ষ থেকে যে খবর আস্‌ল—তা' খুবই আশাপ্রদ। কিন্তু আমাদের ষ্টাফ্ অফিসারদের ধারণা—ব্রিটিশেরা ভারত ত্যাগ ক'রবার আগে দীর্ঘকালব্যাপী একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। তাঁরা মনে করেন, সাম্রাজ্যরক্ষার শেষ চেষ্টা ক'রতে ব্রিটিশেরা একবার মরিয়া হ'য়ে লড়্‌বে, কারণ ভারত হাত ছাড়া হ'লে ব্রিটেন একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হবে—ব্রিটিশেরাও এ কথা বেশ ভাল ক'রে জানে।

নেতাজী আমাদের বিজয় সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে উৎসাহে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যান। কি গভীর বিশ্বাস! নেতাজীর অবস্থা দেখে আমি ত শিউরে উঠি। আমি ভাবি—যদি কোন রকমে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় তা' হ'লে নেতাজীর অবস্থা কি হবে? তাঁর সকল আশা-ভরসা ঐ এক আজাদি। পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমরা যত ভারতীয় আছি সকলেরই ঐ এক আশা। ভগবান্ আমাদের সহায় হবেন।

১০ই জুলাই, ১৯৪৪

নেতাজী আজ এক জনসভায় বজ্রনির্ঘোষে এক বক্তৃতা দেন। প্রায় ৩০ হাজার শ্রোতা এই সভায় উপস্থিত ছিল।

তিনি আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কর্ম্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে বলেন :—

"আমরা জানি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী যতদিন ভারতের বাইরে থেকে আক্রান্ত না হবে, ততদিন তারা ভারতের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবকে দমন ক'রতে সমর্থ হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজ সেই জন্যই ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি ক'রেছে। আমরা যখন ভারতবর্ষের ভিতরে আরও কতকদূর এগিয়ে যাব এবং দেশবাসী যখন নিজের চোখে দেখ্‌বে ব্রিটিশ সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা বুঝ্‌বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের আর দেরী নেই। তখন তারা জীবন-ভয় তুচ্ছ ক'রে আমাদের ফৌজের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রবে। আমরা তখন সবাই মিলে ব্রিটিশদের পিছনে ধাওয়া ক'রে তা'দের ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত ক'রব।

বন্ধুগণ—শত্রুর শক্তিকে কম ক'রে ভাবা আমাদের মূর্খতার পরিচয় হবে। আরাকান, কালাদন এবং হাকা রণাঙ্গনে, তিদ্দিম এলাকায়, মণিপুর ও আসাম অঞ্চলে আমরা শত্রুপক্ষের বিচিত্র সৈন্যদলের সাক্ষাৎ পেয়েছি। ওদের রসদ ও সমরোপকরণ আমাদের চেয়ে বহুলাংশে শ্রেয়। আমরা এ কথা আগে থেকেই জান্‌তাম,—কারণ, আমাদের সঙ্গে লড়্‌বার জন্য ভারতবর্ষ থেকে সব কিছু লুট ক'রে আন্‌ছে ওরা। এ সত্ত্বেও আমরা ওদের সর্ব্বত্রই পরাজিত ক'রেছি। বিপ্লবী সৈন্যদলকে পৃথিবীর সব দেশেই আমাদের এই

অবস্থায় থেকেই যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছে, শেষে তারা বিজয়লাভই ক'রেছে। 'বিয়ার', 'রাম' প্রভৃতি নানা রকম মদ এবং টিনে ভর্ত্তি শূকর ও গরুর মাংস খেয়ে তা'দের শক্তি আসে নি, তা'দের শক্তির মূলে র'য়েছে—বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও দৃঢ়তা। আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ সৈন্যদলের মত শিক্ষা পায় নি—তারা শিক্ষা পেয়েছে নানা দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তির মাঝে থেকে যুদ্ধ ক'রতে—সুতরাং আশা করা যায় যে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসীর মুক্তির জন্য তারা যুদ্ধ ক'রছে—তা'দের স্বার্থ তারা কিছুতেই ক্ষুণ্ন ক'রবে না।

নেতাজীর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল পরিদর্শন

১৯৪৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নেতাজী পাইনমানায় (Pyinmana) উপস্থিত হন। ১নং ডিভিশান তখন এইখানেই অবস্থান কর্‌ছিল—২নং ডিভিশান ছিল ক্যায়ুকপাডাং (Kyaukpadang) ও পোপায়। এই দুই ডিভিশান সৈন্য পরিদর্শন করাই নেতাজীর পাইনমানা যাবার উদ্দেশ্য। এই সময় ১নং ডিভিশানের অধিকাংশ অফিসার ও সাধারণ সৈনিকের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তা' ছাড়া সামান্য সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র ছিল মাত্র শতকরা কুড়ি জনের মত সৈন্যের। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল এই ডিভিশান শীঘ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে পার্‌বে না।

নেতাজী আমায় বল্‌লেন—২নং ডিভিশান ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হ'য়েছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার কর্ণেল আজিজ আহম্মদ যাত্রা কর্‌বার মুখেই বোমার আঘাতে আহত হ'য়েছেন। সুতরাং নেতাজী আমাকে পোপায় গিয়ে ২নং ডিভিশানের নেতৃত্বভার গ্রহণ ক'রতে আদেশ দিলেন।

ইম্ফল অভিযানে যে সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধ ক'রে আমি বিশেষ গৌরব অনুভব ক'রেছি তা'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি পাইনমানা পরিত্যাগ ক'রলাম। এখান থেকে নেতাজী ও তাঁর খাস সহকারীদের (Personal Staff) সঙ্গে আমি প্রথমে মিকটিলায় (Meiktila) পরে পোপায়

গেলাম। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সকাল বেলায় আমাদের দল মিকটিলার ২০ মাইল দক্ষিণে 'ইন্দো' (Indo) নামে ভারতীয় এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। ঐদিন আমরা ওখানেই রইলাম। সারাদিন ধ'রে শত্রু-বিমানের হানার জন্য মোটরে ক'রে বেরুবার উপায় ছিল না—রাত্রেও লরী ও মোটর গাড়ীগুলির আলো না জ্বেলে পথ চ'ল্‌তে হ'য়েছিল—আলো জ্বাললেই ওরা দেখ্‌তে পেয়ে বিমান থেকে ঐগুলি আক্রমণ ক'রবে।

এই গ্রামে থাক্‌বার সময়েই আমরা খবর পেলাম—শত্রুদল প্যাকোকাউ (Pakokou)-এর নিকটবর্ত্তী ন্যান্‌গু (Nyangu) ও প্যাগনে (Pagan) অবস্থিত আমাদের ৪নং রেজিমেণ্টের (Nehru Brigade) ব্যূহ ভেদ ক'রেছে। আমাদের ফৌজের অনেক সৈন্য হতাহত হ'য়েছে এবং শত্রুদল মিকটিলার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।

নেতাজী তখনই মিকটিলা রওয়ানা হওয়া সাব্যস্ত ক'রলেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা এগিয়ে আস্‌বার পথে আমাদের ব্যূহের যেখানটা ভেঙ্গে দিয়ে এসেছে, নেতাজী গিয়ে সেই ফাঁকটা বন্ধ ক'রবার চেষ্টা ক'রবেন। আমাদের দল ১৯৪৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে মিকটিলায় গিয়ে হাজির হ'ল। এই দলে ছিলেন নেতাজীর খাস সহকারীরা এবং কুড়িজন তাঁর দেহরক্ষী সৈনিক। এই দলে একজন জাপানী মেজর ছিলেন—ইনি দোভাষীর কাজ ক'রতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা তখন বড়ই গোলমেলে। কাউকসেতে

(Kyaukse) তখন ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। মান্দালয় শত্রুপক্ষ অধিকার ক'রে নিয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্যদল বিপুল সাজসরঞ্জাম নিয়ে মান্দালয়-মিকটিলা-রেঙ্গুন-সড়ক ধ'রে দক্ষিণে এগিয়ে আস্‌ছে। মান্দালয় এলাকায় যে সব জাপানী সৈন্যরা যুদ্ধ ক'রছিল, ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক এবং এরোপ্লেনের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে তারা একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়েছে। এই দলের যারা বেঁচেছে তার কতক মে-মিও-এ এবং অবশিষ্ট পাহাড়ে আশ্রয় নেবার জন্য শান রাজ্যের (Shan States) দিকে পশ্চাদপসরণ ক'রেছে। মিকটিলার পশ্চিমে ব্রিটিশ সৈন্যরা ইরাবতী কয়েক জায়গায় পার হ'য়েছে এবং ম্যিনগাঁ (Myingyan), পেকোকাউ (Pakokou), ঙ্যান্‌গু (Nyangu) এবং প্যাগনে ভীষণ যুদ্ধ চ'লেছে। মিকটিলায় জাপানী রেলপথ এবং অন্যান্য যানবাহনের পথের সংযোগস্থল ;. সুতরাং এটা একবার অধিকার ক'রতে পার্‌লে ব্রহ্মদেশে জাপানী সৈন্যবাহিনী একেবারে পঙ্গু হ'য়ে যাবে, এইজন্য ব্রিটিশরা মিকটিলার দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রছে। এইজন্য মিকটিলাতে নেতাজীর অবস্থান করা সমীচীন মনে হ'ল না—কারণ এই স্থানটা রক্ষা ক'রবার জন্য কোন ব্যবস্থাও করা হয় নি—এখানে কোন সৈন্যদলও রাখা হয় নি।

আমরা সবাই নেতাজীকে মিকটিলা পরিত্যাগ ক'রতে অনুরোধ ক'রলাম এবং তিনি পোপায় যেখানে যুদ্ধ ঘোরতর হ'য়ে উঠ্‌ছে সেখানে যাবার যে মনস্থ ক'রেছেন সে

সঙ্কল্পও তাঁ'কে ত্যাগ ক'রতে বললাম। প্রথমে তিনি এসব কথায় কান দিতেই চাইলেন না কিন্তু অনেক ক'রে ধরায় শেষে তিনি আমার এই প্রস্তাবে রাজী হ'লেন যে, আমি প্রথমে পোপায় গিয়ে সেখানকার অবস্থা সব স্বচক্ষে দেখে এসে তাঁ'কে জানাব, তারপর আমিই তাঁ'কে সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাব। ইত্যবসরে নেতাজী কালাও-এ গিয়ে সেখানকার আজাদ হিন্দ ফৌজের হাসপাতাল পরিদর্শন ক'রবেন।

নেতাজীর মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর মহবুব আহম্মদ ও আমি ২১।২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে মিকটিলা ত্যাগ করি। প্রায় মধ্যরাত্রিতে আমরা ওখান থেকে রওয়ানা হই। নেতাজী আমাদের যাত্রাকালে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে এসে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও পন্থা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়ে গেলেন। এই মহা-সঙ্কটময় অবস্থায় সবাই প্রায় বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন—ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই অক্ষশক্তিনিচয়ের পতন অনিবার্য্য;—কিন্তু নেতাজীর মনে তবুও দৃঢ় বিশ্বাস—আমরা বিজয়-লাভ কর্‌বই। তিনি বল্‌লেন—"অক্ষশক্তিনিচয় যদি যুদ্ধে বিরতও হয় —আমরা তবুও যুদ্ধ চালিয়ে যাব। ব্রিটিশের শেষ প্রাণীটি পর্য্যন্ত আমাদের দেশের সীমানা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত আমাদের যুদ্ধে বিরতি নেই।" তিনি আরও বল্‌লেন,—বাধা দিতে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল সৈন্যও যদি মারা যায় তবুও ব্রিটিশদের আমাদের বাহিনীর কাছে এগুতে বা

আমাদের ব্যূহ ভেদ ক'রতে দেওয়া হবে না। মোট কথা—তিনি চাইতেন—আজাদ হিন্দ ফৌজের সহীদেরা বীরত্বের এমন একটা কীর্ত্তি রেখে যাবে যে,পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয়েরা তা'দের জন্য নিজেদের গৌরবান্বিত মনে ক'রবে। তাঁর এই ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করা হবে এবং আজাদ হিন্দ দলের একটি সৈন্যও বেঁচে থাক্‌তে আমাদের কাছে ব্রিটিশদের এগুতে দেওয়া হবে না—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা পোপা যাত্রা ক'রলাম। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভোর পাঁচটার সময় আমরা ক্যায়ুকপাডাং (Kyaukpadang) গিয়ে পৌঁছলাম—সেখানে ৪নং ডিভিশানের কম্যাণ্ডার কর্ণেল ধীলনের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সব রকমের পরামর্শ দিয়ে আমরা পোপার দিকে রওয়ানা হ'লাম—এখানে গিয়ে ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্স এবং কর্ণেল পি, কে, সাইগলের অধীনস্থ ২নং ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট পরিদর্শন ক'রতে হবে আমাদের। ডিভিশানের পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব আমি হাতে নিলাম। বিভিন্ন ব্রিগেড কম্যাণ্ডারদের কর্ত্তব্য মোটামুটি নির্দ্ধারিত ক'রে দিলাম। আরও বিশদ্ নির্দ্দেশ পরে দেওয়া হবে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মহবুব আহম্মদ ও আমি মিকটিলায় ফিরে এসে পোপা রণাঙ্গনের সমস্ত অবস্থা নেতাজীকে জানালাম। আমি তাঁকে ব'ললাম—যুদ্ধের অবস্থা সেখানে বড় গোলমেলে, এরূপ অবস্থায় তাঁর আর অগ্রসর হওয়া খুবই বিপজ্জনক, সুতরাং তা' করা উচিত হবে না। খোলা

মাঠে রাত্রি দ্বিপ্রহরের অনেক পরে জ্যোৎস্নালোকে আমাদের এই সব আলোচনা। দূর থেকে কামান ও মেসিনগান ছোঁড়ার আগুন আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। অবস্থা অতি সঙ্কটময়। যে কোন মুহূর্ত্তে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক এসে নেতাজী সমেত মিকটিলা অধিকাব ক'রে বস্‌তে পারে। মেজর রাওয়াত (Rawat), কর্ণেল মহবুব ও আমি নেতাজীকে বারবার অনুরোধ ক'র্‌ত লাগ্‌লাম—পোপায় যাবার সঙ্কল্প তিনি যাতে পরিত্যাগ করেন। ঠিক সেই সময় একজন জাপানী অফিসার এসে ব'ললেন,—শক্তিশালী ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া বাহিনী আমাদের ব্যূহ ভেদ ক'রে পাইনবিন (Pyinbin) অধিকার ক'রেছে এবং মিকটিলার ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তাউঙথা (Taungtha) আক্রমণ ক'রবার উদ্যোগ ক'রছে। তিনিও নেতাজীকে সেই রাত্রেই মিকটিলা ত্যাগ ক'রে পাইনমানার দিকে স'রে যেতে ব'ললেন। ওখানে ১নং ডিভিশানের সৈন্যদল আছে—শত্রু ওদিকে এগিয়ে এলে দরকার হ'লে তারা তা'দের সঙ্গে ল'ড়তে পার্‌বে। তিনি নেতাজীকে আরও জানালেন যে, তাউঙথা ও মিকটিলার মধ্যে শত্রুকে বাধা দেবার জন্য কোন সৈন্যদল নেই। আমি নেতাজীকে ব'ললাম—সাজোয়া বাহিনীর কাছে ৪০ মাইল পথ একটা কিছুই নয় বল্‌লে হয়—এই পথ আস্‌তে ওদের দু' ঘণ্টার বেশী সময় লাগ্‌বার কথা নয় এবং ওদের বাধা দেবার মত সৈন্যদলও এখন আমাদের হাতে নেই। নেতাজীর দেহরক্ষার জন্য যে কুড়িজন সশস্ত্র

প্রহরী আছে, তা'দের কাছেও রাইফেল ছাড়া অন্য অস্ত্র নেই—মাত্র এই তোড়জোড় নিয়ে সাজোয়া বাহিনীকে বাধা দেওয়া যায় না। মিকটিলা ছেড়ে যাবার জন্যে আমি বারবার নেতাজীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাতে লাগ্‌লাম—কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হ'লেন না। অবশেষে সকল ধৈর্য্য হারিয়ে তাঁকে বল্‌লাম,—"নেতাজী, আপনি বড় স্বার্থপরের মত কাজ ক'রছেন—শুধু বীরত্ব দেখানোর জন্য আপনি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রছেন কিন্তু এমনি ক'রে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রবার অধিকার আপনার নেই। আপনার জীবন ভারতবর্ষের একটি অমূল্য সম্পদ, এ সম্পদ আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে, এ আমি এমনি ক'রে বিপন্ন হ'তে দিচ্ছি না।" আমি আবার তাঁকে মিনতি ক'রে বল্‌লাম—"নেতাজী, একবার ভেবে দেখুন, যদি কোন রকমে আপনার কিছু ঘটে—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কি দশা তখন হবে ?"

তিনি ধীরচিত্তে আমার সব কথা শুন্‌লেন—কারণ তিনি জান্‌তেন আমি যা বল্‌ছি তা' প্রাণ থেকেই বল্‌ছি এবং তাঁরই নিরাপত্তার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন হ'য়েই বল্‌ছি। আমার বলা শেষ হ'লে তিনি মৃদু হেসে বল্‌লেন,—শাহনওয়াজ, আমাকে এরূপ অনুরোধ করা তোমার বৃথা। পোপায় যাওয়া আমি যখন সাব্যস্ত ক'রেছি, তখন সেখানে আমি যাবই। আমার জন্যে তুমি ভেবো না, সুভাষচন্দ্র বোসকে মার্‌তে পারে এমন বোমা ইংলণ্ড এখনও তৈরী

ক'রতে পারে নি।" নেতাজী যা বলেছিলেন তা সত্যিই, বস্তুতঃ তাঁর জীবন যেন দৈবশক্তির এক রক্ষা-কবচে ঘেরা থাকৃত। সেই দিনই বিকেলে তিনি যেখানে ছিলেন সেই স্থানটির উপর শত্রুরা ষাটখানা B-25S বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে—ফলে চারিদিক একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য্য—নেতাজী কি ক'রে অব্যাহতি পেয়েছেন, তাঁর গায়ে একটা আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নি।

যাই হ'ক—আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম—তিনি যাতে পোপায় না যান কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। একবার তিনি কোন কিছু সাব্যস্ত ক'রে ব'সলে কারো সাধ্য নেই, তাঁর সে মত পরিবর্ত্তন করায়; কিন্তু আমরা সবাই বুঝেছিলাম, এ সময় তাঁর পোপায় যাওয়া ভীষণ বিপজ্জনক। কি যে করা যায় কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমরা। অবশেষে নেতাজীর এ্যাডজুট্যাণ্ট মেজর রাওয়াত এক মতলব ঠাওরালেন। রাত্রি তখন দুটো—মিকটিলা থেকে রওনা হ'তে নেতাজীর যদি কোনরকমে আর দু'ঘণ্টা দেরী করিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লেই রাত্রি প্রভাত হ'য়ে যাবে—দিনের আলো দেখা দেবে—সুতরাং নেতাজীর সেদিন অন্ততঃ আর যাওয়া হবে না। এই যুক্তি ক'রে মেজর রাওয়াত ইচ্ছা ক'রে কাজে বিলম্ব ক'রতে লাগলেন। এদিকে নেতাজী রওয়ানা হবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন—কিন্তু মেজর রাওয়াতের উপর একটা জরুরী চিঠি টাইপ করার ভার প'ড়েছিল—সে চিঠি টাইপ করা তাঁর আর শেষ হয় না। এদিকে আবার

নেতাজীর ড্রাইভারকে তিনি টিপে দিয়েছেন, সে যেন এঞ্জিনের কিছু দোষ বের করে। সে রাত্রেই আমরা জেনারেল কিয়াণি এবং জাপ-বাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছ থেকে যে জরুরী তার পাই তাতে নেতাজীকে অবিলম্বে রেঙ্গুনে ফিরে যেতে অনুরোধ করা হ'য়েছে। নেতাজী পোপায় যাবার জন্যে অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন—সুতরাং যাত্রার উদ্যোগে বিলম্ব দেখে সবার উপর মেজাজ খারাপ ক'রতে লাগ্‌লেন; কিন্তু তাঁর ড্রাইভার এবং মেজর রাওয়াত এমন ভাব দেখাতে লাগ্‌লেন যে যতশীঘ্র পারেন তাঁরা রওয়ানা হবার খুব চেষ্টা ক'রছেন। এমনি ক'রে ভোর পাঁচটা হ'য়ে গেল—আমি বুঝ্‌লাম অন্ততঃ একটা দিনও নেতাজীকে এখানে আট্‌কে রাখা গেল—এর মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা বুঝ্‌তেও খানিকটা সময় পাব আমরা। সাড়ে পাঁচটার সময় নেতাজীকে অনেক ব'লে ক'য়ে পাশের গ্রামের একটা খড়ের চালা-ঘরে তাঁর একটু ঘুমানোর ব্যবস্থা ক'রলাম। ইত্যবসরে জাপানী লিয়েজং অফিসার শত্রুসৈন্যের গতিবিধির শেষ সংবাদ সংগ্রহ ক'রতে বেরিয়ে গেলেন। সকাল ৮ টার সময় তিনি ফিরে এসে সংবাদ দিলেন মিকটিলার দশমাইল উত্তরে মাহ্‌লেয়িং (Mahlaing) নামক জায়গায় শত্রুর সাজোয়া বাহিনী এসে গেছে এবং মিকটিলা থেকে মান্দালয় এবং মিকটিলা থেকে ক্যায়ুকপাডাং (Kyaukpadang) সড়ক বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তিনি আমাদের জানালেন যে, শত্রুদল ক্রমেই অগ্রসর হ'তে চেষ্টা ক'রছে, তা' ছাড়া মিকটিলা ও মাহ্‌লেয়িং-

এর মাঝে আমাদেব কোন সৈন্যদল না থাকায় যে কোন মুহূর্ত্তে ওরা মিকটিলা অধিকার ক'রতে পারে। তিনি বল্‌লেন—আমাদের বড়ই দেরী হ'য়ে গেছে, এমন কি আমাদের পশ্চাদপসরণের পথ মিকটিলা রেঙ্গুন সড়ক পর্য্যন্ত হয়ত বন্ধ হ'য়ে গেছে। বড়ই সঙ্কটে পড়া গেল! এখন আমাদের সামনে ছুইটি মাত্র পথ: হয় (১) আমরা যেখানে আছি সেইখানে থেকেই আমাদেব যুদ্ধ ক'রে মরতে হবে—(কারণ মাত্র এই কয়েকজন সৈন্য নিয়ে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব) না হয় (২) মিকটিলা থেকে রেঙ্গুন যাবার প্রধান সড়ক শত্রুদল কর্ত্তৃক রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ পথেই আমাদের পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রতে হবে। নেতাজীর ইচ্ছা আমরা ওদের ব্যূহ ভেদ কর্‌বারই চেষ্টা করি। আমাদের পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ ক'রেই যদি ওরা দাঁড়ায় তবে আমাদের সেখানে যুদ্ধ ক'রে মরাই ভাল। নেতাজীর প্রস্তাবটি ঠিক বীরের মতই হ'য়েছিল, কারণ পশ্চাদপসরণের পথ শত্রুরা রুদ্ধ হয়ত ক'রেছে, তা' ছাড়া আরও বিপদ্ আছে, দিনের বেলা এ পথে চলার মানে এক রকম আত্ম-হত্যা করা: শত্রুর বিমান-আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা ক'রবার কোন আচ্ছাদনই এ পথে কোথায়ও ছিল না—অথচ এর উপরে শত্রু-বিমান অবিরত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যাই হ'ক নেতাজী যখন সিদ্ধান্ত ক'রেছেন—সে সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নিতেই হবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা সব যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে

গেলাম, কিন্তু মুস্কিল হ'ল গাড়ী নিয়ে। একখানা মাত্র মোটর তখন হাতে ছিল—তাতে চারজন লোক ধরে। কে কে এতে যাবেন, সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন—সুতরাং ও ভারটা নেতাজীর উপরেই আমি দিলাম। আমি যে কি ক'রব মহাস 'স্যায় প'ড়ে গেলাম, পোপা ও ক্যায়ুকপাডাং-এ আমার সৈন্যদল যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে যুদ্ধ ক'রছে এবং তারা আমার পথ চেয়ে আছে, সুতরাং শত্রুদল কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার মনে প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল—ঐ বাধা এড়িয়ে পোপায় গিয়ে আমার সৈন্যদলের পাশে দাঁড়াই। এদিকে আবার রয়েছে নেতাজীর প্রতি আমার কর্ত্তব্য। তাঁর জীবনও বিপন্ন। এই অবস্থায় তাঁকে ফেলেই বা আমি যাই কেমন করে? দুই কর্ত্তব্যেব কোন্‌টি পালন করি—বুঝ্‌তে না পেরে' সিদ্ধান্তের ভার নেতাজীর উপরই দিলাম। নেতাজী সাব্যস্ত ক'রলেন তাঁর জাপানীজ লিয়েজং অফিসার এবং তাঁর নিজস্ব ডাক্তার কর্ণেল রাজু তাঁর সঙ্গে যাবেন, সুতবাং আর একটি মাত্র লোকের জায়গা গাড়ীতে রইল। নেতাজী বল্‌লেন—"পথে হয়ত যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে আমাদের এগুতে হবে, সুতরাং গাড়ীতে আর একটি লোক যিনি যাবেন তিনি লড়াই ক'রবার উপযুক্ত হওয়া চাই।" তখন আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন—"তা' হ'লে তুমিই এস আমার সঙ্গে।" আমি তাঁর আদেশ মেনে নিলাম। অতঃপর গাড়ীতে যতটা পারা গেল হাতবোমা ও গুলিগোলা ভরলাম। এত বিপৎ-সঙ্কুল পথ নিরাপদে উত্তীর্ণ হবার আশা অবশ্য খুব কমই

ছিল,—কিন্তু তা' ব'লে পিছুলে চল্‌বে না। আমাদের কেউই কোন কথা বল্‌ছিলেন না—কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জান্‌তাম—আর সবাই কি ভাব্‌ছেন। সবাইকেই হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। শত্রুরা যে আমাদের জীবন্ত বন্দী ক'রতে পার্‌বে না এ বিষয়ে আমরা সবাই এক রকম নিশ্চিত ছিলাম। এরপর আমরা গাড়িতে উঠ্‌লাম—নেতাজীর কোলের উপর রইল একটা গুলি ভর্ত্তি টমী গান, রাজুর কাছে রইল দুটি হাত বোমা, জাপানী লিয়েজং অফিসারের হাতে আর একটা টমী গান—আমার হাতে গুলিভর্ত্তি একটি ব্রেন গান। আমরা সব এমন তৈরী হ'য়ে রইলাম যে, দরকার হ'লে একসঙ্গে গুলি চালাতে পার্‌ব। জাপানী অফিসার গাড়ীর পাদানির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন, ঐখান থেকে তিনি শত্রুবিমান আসে কিনা লক্ষ্য রাখ্‌বেন। নেতাজী ও আমি পিছনে বসে রাস্তার দুই দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লাম।

প্রায় ৪০ মিনিট পর আমরা 'ইন্দো' নামে ভারতীয় গ্রামে এসে হাজির হ'লাম। গ্রামটি মিকটিলার প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে। খুবই আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে—এই ৪০ মিনিট মোটরে আস্‌তে পথে আমাদের একটি শত্রুবিমানও চোখে পড়ে নি—রাস্তা কোথাও বন্ধও দেখ্‌তে পাই নি। ইন্দো-য় এসে আমরা ঠিক ক'রলাম,—দিনের বাকী সময় ঐখানেই কাটাব। আমরা ঐ গ্রামে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ জঙ্গীবিমান এসে গ্রামের উপর মেশিনগান চালাতে লাগ্‌ল। মিনিট পাঁচের জন্য আমরা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে

গেছি। বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ ও মেশিনগানের গুলি-চালানোর সম্মুখীন যে না হ'য়েছে সে বুঝ্‌বে না খোলা জায়গায় বা মাঠে জঙ্গী বিমানের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অর্থ কি। এই সব জঙ্গী বিমানের কোন কোনটায় ১২টা পর্য্যন্ত মেশিনগান ছিল। তা' ছাড়া ওরা আমাদের সৈন্যদের উপর ২০ ও ৪০ মিলিমিটার কার্টি্রজের গুলি চালাতে কসুর ক'রত না। এ সব কার্টি্রজ সাধারণতঃ প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা—রেলওয়ে এঞ্জিন বা ভারী ট্যাঙ্ক প্রভৃতি ভেদ করতেই এগুলি ব্যবহার করা হয়, মানুষের উপর ছুঁড়লে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এই সময় 'ইন্দো' এবং মিকটিলার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামগুলি শত্রুপক্ষের গুপ্তচরে ভ'রে গেছে। এই সব চিন্তা ক'রে নেতাজীকে আমি গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকবার জন্য অনুরোধ করলাম। প্রথমে আমরা গ্রামের কাছেই এক সিজমনসার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলাম—একটু পরেই একটি লোক এসে চারদিক ঘুরে জায়গাটা ভাল ক'রে দেখে গেল, লোকটাকে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। সে চ'লে গেলে আমি নেতাজীকে বল্‌লাম—"লোকটাকে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, ও বোধহয় ব্রিটিশের গুপ্তচর—চলুন আমরা এখান থেকে সরে যাই।" নেতাজী আমার কথায় রাজী হ'লেন—আমি তখন তাঁকে গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটা ঘন জঙ্গলে নিয়ে গেলাম। আমরা ওখানে আস্‌বার ঠিক পরেই দুটি ব্রিটিশ প্লেন এসে আগেকার

সেই সিজমনসার ঝোপের উপরে খুব নীচু হয়ে চক্র দিতে লাগ্‌ল। আমি সেদিকে নেতাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে রহস্য ক'রে বল্‌লাম,—"ঐ দেখুন নেতাজী ওরা আপনাকে খুঁজ্‌ছে"। সিজমনসা ঝোপের কাছে যে বর্ম্মী লোকটা আমাদের দেখে গিয়েছিল সে যে ব্রিটিশের গুপ্তচর সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না। সেদিনটা আমাদের জঙ্গলেই কাট্‌ল। শেষের দিকে বড়ই ক্ষিদে পেয়েছিল আমাদের। আমি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এক ক্ষেতে গিয়ে কিছু ছোলা নিয়ে এলাম—তাই খেয়েই নেতাজী ও আমার সে দিনটা কেটে গেল।

সেদিন আকাশে অনেক শত্রু-বিমান টহল দিচ্ছিল কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের দেখ্‌তে পায় নি। শত্রুদের বিমান আক্রমণ ও কামানের গোলা থেকে আত্মরক্ষা ক'রতে নেতাজীর জন্য আমি একটা ছোট্ট পরিখা খুঁড়েছিলাম। একবার কয়েকখানি শত্রু-বিমান এসে আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার চারধারে প্রায় গাছের মাথা সমান উঁচু দিয়ে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। দেখে মনে হ'ল—হয় ওরা আমাদের সন্ধান পেয়েছে, না হয় গুপ্তচরেরা আমাদের আগমনবার্ত্তা ওদের জানিয়েছে। আমরা দুই জনেই শত্রু-বিমান দেখে আমাদের সেই ছোট্ট পরিখায় আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ দেখি মস্তবড় একটা বিষধর কালো বিছে পরিখার গা বেয়ে এগিয়ে আস্‌ছে—নেতাজীর গলার কাছে ওটা তখন প্রায় এক ইঞ্চির মধ্যে এসে পড়েছে। নেতাজী নিজেও সেটা দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন, কিন্তু শত্রু-বিমান থেকে দেখ্‌তে পাবে এই

আশঙ্কায় নেতাজী একটুও নড়লেন না। মিনিট খানেক পরে শত্রু-বিমান আমাদের খুঁজ্তে অন্য ঝোপের উপরে চ'লে গেল। বাঁচলাম—ওরা আমাদের দেখ্তে পায় নি। তখন আমরা সেই বিছেটাকে মেরে ফেল্লাম।

সন্ধ্যাকালে অন্ধকার হ'লেই নেতাজী আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বল্লেন—তিনি আবার মিকটিলায় ফিরে যেতে চান। মিকটিলায় তখনও কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য র'য়েছে—তা'দের ওখান থেকে সরানোর কোন ব্যবস্থা না ক'রে তিনি রেঙ্গুনে ফির্তে রাজী নন। অনেক বলা কওয়ার পর তিনি পাইনমানায় যেতে রাজী হ'লেন এবং আমি গেলাম মিকটিলায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমি মিকটিলায় পৌঁছে দেখলাম সহরে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। মিকটিলায় জাপানীদের বেশ বড় একটা হাসপাতাল ছিল, প্রায় ১০০০ হাজার শয্যাশায়ী রোগী সেখানে ছিল কিন্তু শত্রুরা এত দ্রুতগতিতে এসে প'ড়ল যে, জাপানীরা আর তা'দের সরানোর সময় পেলে না—সুতরাং একজন অফিসার ও একজন প্রহরীকে হুকুম দিয়ে পাঠান হ'ল—যে সব রোগী পায়ে হেঁটে পশ্চাদপসরণ ক'রতে পার্বে না তা'দের গুলি ক'রে মেরে ফেল্তে হবে। অফিসার এ হুকুম যথাযথ পালন করেছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের জিনিসপত্র ও লোকজনকে মিকটিলা থেকে সরিয়ে আমি পাইনমানায় ফিরে এলাম।

নেতাজী সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ্চ তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে দেখ্‌লাম শত্রুদল পাইনমানায় এসে প'ড়লে কি করা যাবে তার একটা পরিকল্পনা তিনি খাড়া ক'রেছেন। সে সময়কার যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল—শত্রুদল অতি দ্রুতবেগে মিকটিলা থেকে পাইনমানা ও টাউনগুতে (Toungoo) এসে যাবে। নেতাজীর পরিকল্পনা হচ্ছে ১নং ডিভিশানের যে কয়েকটি সৈন্য অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে একটা "X" রেজিমেণ্ট গঠন করা। এই রেজিমেণ্ট নিয়ে পাইনমানার কয়েক মাইল উত্তরে গিয়ে তিনি একটি আত্মরক্ষা ব্যূহ রচনা ক'রবেন। তিনি আমাকে জানালেন—তিনি পাইনমানাতে থাকাই সাব্যস্ত ক'রেছেন এবং এখানেই তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ ক'রবেন। অবশিষ্ট রুগ্ন সৈন্যদের সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দেশ দিলেন—ওদের পিছনে ১০ মাইল দূরে একটা শিবিরে সরিয়ে নিতে হবে এবং ব্রিটিশ সৈন্যরা যদি "X" রেজিমেণ্টের আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ ক'রে সেখানে এসে পড়ে তা' হ'লে ওরা আত্ম-সমর্পন ক'রবে। "X" রেজিমেণ্টের উপর তাঁর আদেশ রইল—তা'দের একজনও জীবিত থাকা পর্য্যন্ত তারা যুদ্ধ চালাবে।

"X" রেজিমেণ্টের নেতৃত্ব-ভার প'ড়ল কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর উপর। ইনি খুব সাহসী কম্যাণ্ডার ছিলেন। মণিপুর যুদ্ধে ইনি আমার সহকারীর কাজ ক'রেছিলেন। ১নং ডিভিশানের অবশিষ্ট সৈন্যদলের নেতৃত্ব-ভার প'ড়ল

কর্ণেল আর্, এম্, আর্শাদের উপর। নেতাজী সব উপর-ওয়ালা অফিসারদের নিয়ে এক বৈঠক ক'রে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁর বিভিন্ন আদেশ দিতে লাগ্‌লেন। তাঁর বলা শেষ হ'লে আমি তাঁকে জানালাম—তাঁর আদেশ যথাযথ পালন করা হবে কিন্তু তাঁর নিজের এই সময় পাইনমানায় থেকে ব্রিটিশদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ ক'রবার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই তাঁকে রেঙ্গুনে ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রলাম—সেখান থেকে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের ১, ২ ও ৩নং ডিভিশানের সৈন্যদলের পরিচালনা ক'রবেন। আমরা তাঁকে বুঝিয়ে ব'ললাম—শত্রুদল সম্ভবতঃ প্রথমে মিকটিলায় পাকাপাকি ক'রে তা'দের ঘাঁটি কর্‌বে, তারপর তারা এগিয়ে আস্‌বে। এই সব ক'রতে অন্ততঃ তা'দের পনের দিন সময় লেগে যাবে। নেতাজী সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে শেষে আমাদের কথায় রাজী হ'লেন। আমাকে তিনি রেঙ্গুনে যেতে আদেশ দিলেন—সেখান থেকে আমায় প্রোম-য়েনাঙ্গিয়ান-ক্যায়ুকপাডাং (Prome-Yennangyun-Kyaukpadang)-এর পথে পোপায় যেতে হবে—সুতরাং নেতাজীকে নিরাপদে রেঙ্গুনে এনে আমার ডিভিশানের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হ'তে আমার কোন অসুবিধা হয় নি।

আমরা রেঙ্গুনে গিয়ে খবর পেলাম যে ২নং ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্সের চারজন উর্দ্ধতন ষ্টাফ্ অফিসার পোপা থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ব্রিটিশ পক্ষে গিয়ে যোগদান ক'রেছেন।

নেতাজী এতে বড়ই মুষ্‌ড়ে পড়্‌লেন। তিনি মধ্যরাত্রে আমায় ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—এই কয়জন ষ্টাফ্‌ অফিসারের কাজে তিনি ভীষণ লজ্জা বোধ ক'রছেন। তিনি আমায় বুঝিয়ে বল্‌লেন—যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং কয়েক জায়গায় ব্রিটিশদের জয়লাভ হওয়ায় কোন কোন অফিসারের নৈতিক বল একেবারে লোপ পেয়েছে। তিনি এখন থেকে আমাকে ষ্টাফ্‌ অফিসার নির্ব্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। আমিও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তিনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন—ভবিষ্যতে আমাদের সৈন্যদলের কেউই আর দল ছেড়ে যাবে না। আমি বাছাই ক'রে কয়েকজন খুব ভাল ষ্টাফ্‌ অফিসার নিযুক্ত ক'রলাম। এঁদের নাম হচ্ছে—মেজর রামস্বরূপ, মেজর মেহর দাস, মেজর আজইব সিং এবং মেজর বি, এস্‌, রাওয়াত। ১৯৪৫ সালের ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে আমরা রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রলাম। যাত্রা ক'রবার আগে আমি আমার সমস্ত ষ্টাফ্‌ অফিসারদের নিয়ে নেতাজীকে বিদায় অভিবাদন জানাতে গেলাম। সেদিন আমরা নেতাজীর সাথে এক সঙ্গে ব'সে আহার ক'রলাম—আহারের পর নেতাজী আমাদের বল্‌লেন—"আমি জানি যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি কিন্তু এতেও আমাদের নিরুৎসাহ হবার কিছু নেই। ভারতবর্ষের সম্মান বজায় রাখ্‌বার জন্য যুদ্ধ আমাদের চালাতেই হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অতি সঙ্কটময় অবস্থায় আপনারা এসে যুদ্ধের ভার গ্রহণ ক'রেছেন, এটা কম গৌরবের কথা নয়।...ফৌজের মান-মর্য্যাদা এখন

আপনাদেরই হাতে এবং আমি নিশ্চিত জানি যে দায়িত্ব-ভার আপনারা গ্রহণ ক'রেছেন—আপনাদের কাজে প্রমাণ হবে যে আপনারা ঐ ভারবহনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" এর পর আমরা বিদায় নেবার সময় তিনি বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর চোখে তখন জল। হয়ত তিনি ভাব্‌ছিলেন—যে বিপদসঙ্কুল পথে আমরা যাত্রা ক'রছি—আর হয়ত আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না।

আমি আমার ষ্টাফ্‌ অফিসারদের পক্ষ থেকে নেতাজীকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম—তিনি আমাদের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রতে পারেন, কোন অবস্থাতেই আমরা ভারতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'তে দেব না। ১৯৪৫ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে আমরা পোপায় গিয়ে পৌঁছই।

২নং ডিভিশানের গঠন ও কার্য্যকলাপ

২নং ডিভিশান প্রথম গঠন করা হয় সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। কর্ণেল এন্‌, এস্‌, ভগত ছিলেন এর কম্যাণ্ডার। প্রথম দিকে এ ডিভিশান নিম্নলিখিত দলগুলি নিয়ে গঠিত হ'য়েছিল :—

১নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট
হেভি গান ব্যাটেলিয়ান
সাঁজোয়া গাড়ী সৈন্যদল
সিগন্যালস্‌ ডিভিশান
ইঞ্জিনীয়ার্স ডিভিশান

১নং ডিভিশানের চেয়ে ২নং ডিভিশানের অস্ত্র-শস্ত্র ও সমরোপকরণ একটু ভারী ধরণের ছিল, কারণ ১নং ডিভিশানের প্রধান কাজ ছিল গেরিলা যুদ্ধ আর ২নং ডিভিশানের কাজ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্‌না-সাম্‌নি যুদ্ধ করা। এর পদাতিক দলে ৩" কামান, অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক কামান ও রাইফেল এবং ভারী মেশিনগান ছিল।

প্রথমে মনে হ'য়েছিল যে ইম্ফলের পার্ব্বত্য-অঞ্চলে ল'ড়বার জন্য গেরিলা যুদ্ধেরই বেশী প্রয়োজন—ইম্ফল অধিকারের পর যখন ভারতবর্ষের সমতল-ভূমিতে যুদ্ধ সুরু হবে—তখন এই ভারী সমরোপকরণ সমেত ২নং ডিভিশানকে সেখানে এগিয়ে যেতে হবে।

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে এই ডিভিশানকে ইপো-য় (Ipoh) নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ৫নং গেরিলা ব্রিগেড নামে একটা নতুন রেজিমেণ্ট গঠন ক'রে ২নং ডিভিশানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই রেজিমেণ্টের নেতৃত্ব-ভার পড়ে কর্ণেল রোডারিগ্‌সের (Roderignes) উপর। কিছুকাল অক্লান্তভাবে শিক্ষা নেওয়ার পর এই ডিভিশানের সৈন্যদলগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করে। ডিভিশনাল হেড্-কোয়ার্টার্স ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে 'ইপো' থেকে যাত্রা ক'রে পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে রেঙ্গুনে পৌঁছয়। ডিভিশনাল হেড্‌কোয়ার্টার্স ইপো থেকে স্থানান্তরিত ক'রবার আগে নেতাজী কতকগুলি আভ্যন্তরীণ অসুবিধার জন্য এর কম্যাণ্ডার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন বোধ করেন। তদনুসারে কর্ণেল

আজিজ আহম্মদকে মালয় থেকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে এর কম্যাণ্ডারের পদ দেন। এর আগে কর্ণেল আজিজ আহম্মদ ব্রহ্মদেশে নেহরু ব্রিগেডের নেতৃত্ব ক'রেছিলেন।

রেঙ্গুনে ডিভিশানের সৈন্যদের একত্র সমাবেশ

১৯৪৪ সালের মে মাসে ১নং পদাতিক সৈন্যদল লেফ্‌ট, কর্ণেল এস্, এম্, হুসেনের নেতৃত্বে জিত্রা (Jitra) থেকে ব্রহ্মদেশে রওয়ানা হয়। ১নং ডিভিশানের সৈন্যদল যে পথে গিয়েছিল এরাও সেই পথ ধ'রে যায়। এই সময় শত্রুপক্ষেব বিমান ও ডুবো জাহাজের কর্ম্মতৎপরতা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা যা'তে নতুন সৈন্যদল আমদানী না ক'রতে পারি, সেইজন্য ওদের বোমারু-বিমান-বাহিনী অবিরত আমাদের রেলপথ, সেতু ও সৈন্য-সমাবেশকেন্দ্রগুলির উপর বোমা বর্ষণ ক'রছিল। ক্বাশি (Kwashi—Victoria Point) থেকে মারগুই-য়ে (Mergui) সমুদ্রপথে আসা ভীষণ বিপজ্জনক হ'য়ে উঠেছিল। এই পথটার উপর শত্রুর বোমারু বিমান ও ডুবো জাহাজের প্রখর দৃষ্টি ছিল। একবার একখানা জাহাজে ক'রে ১নং ডিভিশানের অনেকগুলি ভারী ভারী মর্টার কামান, অ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক গান, মেশিনগান প্রভৃতি সমরোপকরণ আস্‌ছিল—শত্রুপক্ষ টরপেডোর আঘাতে ঐ সকল সরঞ্জাম সমেত আমাদের জাহাজখানাকে ডুবিয়ে দেয়, ফলে ১নং পদাতিক সৈন্যদল যখন রেঙ্গুনে উপস্থিত হ'ল তখন শুধু রাইফেল ও অল্প কয়েকটি হাল্‌কা

মেশিনগান ছাড়া তাদের আর অন্য অস্ত্রশস্ত্র ছিল না ; সুতরাং উপযুক্ত সমরোপকরণের সংস্থান না হওয়া পর্য্যন্ত এদের আর এগনো অসম্ভব হ'য়ে গেল।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) থেকে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত সারা পথ আমাদের সৈন্যদলের পায়ে হেঁটে আস্‌তে হ'য়েছিল, সুতরাং ১নং রেজিমেণ্টের রেঙ্গুন পৌছতে প্রায় ৪ মাস সময় লাগে।

ডিভিশনাল হেড্‌কোয়ার্টার্স এবং ৫নং গেরিলা রেজিমেণ্ট ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে 'ইপো' থেকে যাত্রা করে। ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরের শেষে ২নং ডিভিশানের সৈন্যদল রেঙ্গুনে সমবেত হয়। এই সময়ের কাছাকাছি ১নং ডিভিশানের অন্তর্গত ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্টকে (নেহরু ব্রিগেড) ২নং ডিভিশানের অন্তর্গত ক'রে নেওয়া হয়। কর্ণেল আজিজ আহম্মদের নেতৃত্বাধীনে এই ব্রিগেড ১৯৪৪ সালের মে মাসে মান্দালয়ে উপস্থিত হয় এবং তাঁকে মালয়ে বদলি ক'রবার পর কর্ণেল আর্শাদকে এর কম্যাণ্ডার করা হয়। এর পরে এর কম্যাণ্ডার করা হয় মেজর এ, কে, রাণাকে—মেজর রাণার কাছ থেকে এর নেতৃত্বের ভার যায় মেজর মহবুব আহম্মদের হাতে। ১নং ডিভিশানকে কালেওয়া থেকে মান্দালয়ে সরানোর সময় এই ব্রিগেড যথেষ্ট কাজ করেছিল।

যুদ্ধে ২নং ডিভিশানের কার্য্যকলাপ

৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট (নেহরু ব্রিগেড)

১৯৪৪ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে নেহরু ব্রিগেডকে মেজর মহবুব আহম্মদের নেতৃত্বে ইরাবতীর উপত্যকায় মাইনগাঁ-এ (Myingyan) বদলি করা হয়। ঐ রণাঙ্গনে বৃটিশদের ইরাবতী পার হ'য়ে আসায় বাধা দেবার ভার প'ড়েছিল এই ব্রিগেডের উপর। কয়েক দিন পরে মেজর মহবুব আহম্মদকে রেঙ্গুনে নেতাজীর মিলিটারী সেক্রেটারীর কাজ ক'রতে ডাকা হয়, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে মেজর জি, এস্, ধীলন এই ব্রিগেডের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা খুব কম ছিল—এর সমরোপকরণও তেমন ভাল ছিল না। অস্ত্রের মধ্যে ছিল শুধু কতকগুলি রাইফেল, হাল্কা অটোমেটিক—প্রধানতঃ লিউইস গান ও কয়েকটি ব্রেন গান। এই বাহিনীতে অনেকগুলি তামিল সৈন্য ছিল, এদের মালয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হয় এবং ঐখানেই তা'দের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। অবিরত ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণ সত্ত্বেও মাইনগাঁ-এ আমাদের কাজ সুরু হ'য়ে বেশ ভালই চ'ল্‌তে থাকে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শত্রুবিমান-আক্রমণে আমাদের বহু লোক মারা যায়।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে মেজর ধীলন শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হন :—

(১) এক ডিভিশান ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয়ের

কাছাকাছি ইরাবতী পার হ'য়েছে। (২) ২নং ব্রিটিশ ডিভিশান সার্গাই (Sagaing) উপস্থিত হ'য়ে মিনবু (Minbu) ও অন্যান্য সন্নিহিত স্থানে পারের ঘাঁটি করেছে। (৩) আর এক ডিভিশান কালেমিও (Kalemyo) থেকে যাত্রা ক'রে গঙ্গা (Gangaw) উপত্যকা ধ'রে কান-গঙ্গা-তিলিন-পক সড়ক (Kau-Gangaw-Tilin-Pauk Road) ধ'রে পাকোকউ (Pakokou) অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। এরা ন্যান্‌গু (Nyangu) ও প্যাগন (Pagan) অঞ্চলে ইরাবতী নদী পার হবার জন্য বিভিন্ন স্থানে সৈন্যের ঘাঁটি ক'রবার চেষ্টা ক'রছে।

২৯শে জানুয়ারী মেজর ধীলন নিম্নলিখিত আদেশ পান :—

"৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট অবিলম্বে ন্যান্‌গু (Nyangu) ও প্যাগনের দিকে অগ্রসর হবে—সেখানে গিয়ে তারা শত্রুদলকে ইরাবতী পার হ'তে বাধা দেবে। পাকোকৌ-তে রক্ষী-বাহিনী পাঠাতে হবে—ওরা সেখানে পাকোকৌ-তিলিন সড়কে টহল দেবে। ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে এই দলকে তার জায়গায় গিয়ে পৌঁছন চাই।"

এই আদেশ থেকে বুঝা যায় মেজর ধীলনের সৈন্যদলের ২০শে জানুয়ারীর মধ্যেই গিয়ে ঘাঁটি প্রস্তুত ক'রবার কথা, অথচ আদেশ-পত্র পেলেন তিনি ২৯শে জানুয়ারী। সংবাদ আদান-প্রদানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না আমাদের। মেজর ধীলন তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তবুও তখনই কাজ সুরু ক'রে দিলেন। যন্ত্রচালিত কোন প্রকার যানবাহন তাঁর ছিল

না, সুতরাং বর্ম্মীদের কাছ থেকে গরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে তাঁর সৈন্যদের ৮০ মাইল পথ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রলেন। তাঁর ব্যাটেলিয়ানের কয়েকটি অগ্রগামী দল সঙ্গে নিয়ে ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে তিনি মিয়নগাঁ (Myingyan) পরিত্যাগ ক'রলেন। পথে যেতে যেতেই তিনি শুন্‌লেন—ব্রিটিশরা ইরাবতী পার হ'য়ে এসেছে, তা' সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে চ'ললেন। সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তিনি দেখ্‌লেন—পাকোকৌ-তে শত্রুপক্ষের অনেক টহলদার সৈন্য এসে গেছে বটে কিন্তু তারা এখনও ইরাবতী পার হয় নি। মেজর ধীলন প্রথমে সন্ধানী-দল দিয়ে জায়গাটার চারিদিকের খবর সংগ্রহ ক'রলেন, তারপর বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি ক'রতে নিযুক্ত ক'রলেন। ন্যান্‌গু এলাকার ভার দিলেন তিনি ৭নং ব্যাটেলিয়ানের উপর—এর নেতা হ'লেন লেফ্‌ট, হরিরাম। প্যাগনের ভার পড়্‌ল ৯নং ব্যাটেলিয়ানের উপর—এর নেতৃত্বের ভার পড়্‌ল লেফ্‌ট, চন্দ্রভানের উপর। ৮নং ব্যাটেলিয়ানকে পিছনের একটি গ্রামে 'রিজার্ভ' রাখা হ'ল।

যুদ্ধার্থী দলগুলিকে ইরাবতী পার করিয়ে পাকোকৌ এলাকায় শত্রুদলের কাছাকাছি রাখা হ'ল। ব্রিগেডের মূল দলগুলি নিয়ে আস্‌ছিলেন মেজর জগীর সিং। ১৯৪৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ওরা এসে নিজের নিজের এলাকায় সমবেত হ'ল। তারপর আত্মরক্ষী পরিখা কাটা সুরু হ'ল। আমাদের সৈন্যদল জায়গা ঠিক ক'রে,

বস্‌তে না বস্‌তে শত্রুদল আক্রমণ সুরু ক'রে দিলে। নদীর ওপারে আমাদের টহলদার সৈন্যদের ওরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য ক'রলে এবং ৯।১০ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রে একটি ব্রিটিশ টহলদার সৈন্যদল ইরাবতী পার হ'য়ে একেবারে আমাদের এলাকায় এসে হাজির হ'ল। তা'দের কতকগুলি হ'ল নিহত—বাকীগুলি হ'ল বন্দী।

ইত্যবসরে ব্রিটিশ পক্ষের একটি পুরো ডিভিশান খুব সম্ভব ৭ম ভারতীয় ডিভিশান নদীর অপর পারে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা তা'দের বড় বড় কামান আমাদের সৈন্যদের চোখের সাম্‌নে ওপারে পাত্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের সৈন্যদেব অস্ত্রশস্ত্র বল্‌তে ছিল কেবল রাইফেল, হাল্‌কা অটোমেটিক এবং কয়েকটা মাঝারি ধরণের মেশিনগান।

১০ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলা শত্রুদল আমাদের ঘাঁটির উপর জোর কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। রাত্রিতে তারা বহু স্থানে নদী পার হবার চেষ্টা করে কিন্তু তা'দের সে আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তা'দের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। এর পর তিন দিন ধ'রে তারা বহুবার নদী পার হ'তে চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবারই আমাদের সৈন্যরা তা'দের বাধা দেয় এবং তা'দের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৩।১৪ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রে তারা নতুন গোলন্দাজ সৈন্য আমদানী ক'রে বিপুল বিক্রমে আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের ঘাঁটির উপর জোর কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে থাকে

এবং সেই সুযোগে মোটর বোটে ক'রে তা'দের অন্য দল নদী পার হ'তে চেষ্টা করে। সারা রাত্রি ধ'রে ভীষণ যুদ্ধ চলে এবং তা'দের প্রতি আক্রমণই আমাদের সৈন্যদল কর্ত্তৃক প্রতিহত হয়। সব চেয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ হ'য়েছিল—প্যাগন (Pagan) রণাঙ্গনে। এইখানে লেফ্‌ট, চন্দ্রভান খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর মেশিনগানগুলি সাজিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমে তিনি শত্রুদলকে তীরে তাঁর কাছাকাছি আস্‌তে দিয়েছিলেন, তারপর তারা আয়ত্তের ভিতরে এলে তাঁর সৈন্যদল তা'দের উপর একযোগে গুলি ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। শত্রুপক্ষের ব্রিটিশ সৈন্যগুলি ছিল ইষ্ট ল্যাঙ্কাশায়ার রেজিমেণ্টের কতকগুলি "টমী"। ক্যাপ্টেন চন্দ্রভানের সৈন্যরা এদের সঙ্গে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যুদ্ধ করেছে। এই যুদ্ধে প্রায় কুড়িখানা নৌকা ভর্ত্তি শত্রুসৈন্য জলমগ্ন হয়। বাকী সৈন্যরা দ্রুত পালিয়ে অপর তীরে গিয়ে ওঠে। পরে বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা যায়—ওদের কম্যাণ্ডিং অফিসার তাঁর নৌকাডুবি হবার পর সাঁতরে কোন রকমে তাঁর নিজ দলের সাথে গিয়ে মিলিত হন—সাঁতরে নদী পার হ'তে গিয়ে তাঁর পাজামাটা নাকি ইরাবতীর জলে বিসর্জ্জন দিয়ে যেতে হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-বিমান আমাদের উপর ভীষণভাবে বোমা ফেল্‌তে এবং মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়্‌তে সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে নদীর অপর তীর থেকে শত্রুর গোলন্দাজবাহিনী ঘন ঘন কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে থাকে। আমাদের সৈন্যদের একটা ২" ইঞ্চি

কামানও ছিল না যে এর প্রত্যুত্তর দেবে। শত্রুরা রাইফেলের পাল্লার মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত তা'দের ধীরচিত্তে অপেক্ষা ক'রতে হচ্ছিল। আমাদের ডাইনে পাকোকৌয়ের ঠিক বিপরীত দিকে একটা জাপানী ঘাঁটি ছিল, ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রায় দুপুর বেলায় ব্রিটিশ সৈন্যরা ঐ ঘাঁটি দখল ক'রে নিয়ে ইরাবতীর পূব পারে নিজেদের ঘাঁটি করায় অনেক সৈন্য নদী পাব হ'য়ে এল। এই সময় অবিরত যুদ্ধ ক'রে এবং মেরামতের জিনিসের অভাবে আমাদের অধিকাংশ মেশিন-গানগুলি অচল হ'য়ে উঠেছিল—গোলাগুলিও প্রায় শেষ।

শত্রুদল জাপানীদের রণাঙ্গনে নদী পার হ'য়ে দক্ষিণে ফিরে আমাদের ৭নং ব্যাটেলিয়ানকে ঘিরে ফেল্‌লে। এ ছাড়া তারা প্যারাসুটের সাহায্যে আমাদের লাইনের পিছনেও অনেক সৈন্য নামিয়েছিল। আমাদের সৈন্যদের গোলাগুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় একমাত্র সঙ্গিনের সাহায্যেই তা'দের যুদ্ধ ক'রতে হচ্ছিল, সুতরাং ৭নং ব্যাটেলিয়ানের অধিকাংশ সৈন্য পরাস্ত হ'য়ে শেষে আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হ'ল কিন্তু রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান এবং চন্দ্রভানের নেতৃত্বে ৯নং ব্যাটেলিয়ান নিজের নিজের ঘাঁটি দৃঢ়ভাবে দখল ক'রে রইল। সন্ধ্যাকালে মেজর ধীলন তাঁর সৈন্যদের পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে শত্রুদের উপর পাল্টা আক্রমণ ক'রে তা'দের নদীপারে তাড়িয়ে দিতে মনস্থ ক'রলেন; শত্রু বিমান ও কামানের সামনে দিবালোকে এই আক্রমণ চালানো কখনও সম্ভব নয়।

ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে মেজর ধীলনের সংবাদ-আদান-প্রদান করাও এক দুরূহ ব্যাপার—সংবাদ প্রেরণের একমাত্র উপায় হ'চ্ছে দ্রুতগামী লোক পাঠানো (Runners)। তাঁর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটা টেলিফোন পর্য্যন্ত তাঁর ছিল না। এমনি ক'রে কখনও বাহিনীকে শৃঙ্খলায় রেখে পরিচালনা করা যায় না। কাজেই বাহিনী কম্যাণ্ডারদের হাতেই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

রাত্রে শত্রু-বিমান থেকে মেশিনগান চালানো এবং বোমা ফেলা বন্ধ হ'লে মেজর ধীলন নিজে গিয়ে তাঁর বাহিনী কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁ'দের যুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে এলেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার মধ্যে শত্রু-সৈন্যের প্রায় গোটা ডিভিশান ইরাবতী পার হ'য়ে এল। মেজর ধীলন তাঁর সৈন্যদলকে পোপা ও ক্যায়ুকপাডাং-এ (Kaukpadang) পশ্চাদপসরণ ক'রে সেখানে আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রতে আদেশ দিলেন। মেজর ধীলনের রেজিমেণ্ট্যাল সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড, মেজর জগীর সিং অবিলম্বে ক্যায়ুকপাডাং-এ এসে সৈন্যদের পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ক'রলেন এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও ঐখান থেকেই রসদ ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রবার অতি সুব্যবস্থা ক'রলেন।

এর পর কয়েকদিন মেজর ধীলনের সৈন্যদের পুনর্সঙ্ঘবদ্ধ ক'রতেই কেটে গেল। ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে নেতাজী মিকটিলা থেকে মেজর মহবুব আহম্মদ ও আমাকে

পাঠালেন নেহরু ব্রিগেড ও ২নং পদাতিক সৈন্যদল পরিদর্শন ক'রতে। ঐ দুইটি সৈন্যদল তখন যথাক্রমে ক্যায়ুকপাডাং ও পোপায় অবস্থান ক'রছিল।

২৩শে ফেব্রুয়ারী পোপায় রেজিমেণ্ট্যাল কম্যাণ্ডারদের নিয়ে একটা বৈঠক ক'রে—ব্রিটিশ সৈন্যদের ইরাবতীর অপর পারে বিতাড়িত ক'রবার উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন সৈন্যদলের উপর নিম্নলিখিতরূপ কর্ম্মভার ন্যস্ত ক'রলাম :—

১। ২নং পদাতিক সৈন্যদল কর্ণেল পি, কে, সাইগলের নেতৃত্বে পোপায় একটি দৃঢ় ঘাঁটি প্রস্তুত ক'রবে ও শত্রুকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে।

২। ৪নং রেজিমেণ্ট তাউঙ্গজিন (Taungzin) এলাকার ক্যায়ুকপাডাং-ন্যান্‌গু সড়কের আশে-পাশে শত্রু-দলের উপর গেরিলা যুদ্ধ চালাবে।

৪নং গেরিলা রেজিমেণ্টের বহু লোক পূর্ব্বেই হতাহত হওয়া সত্ত্বেও আমার দেওয়া এই নূতন কর্ম্মভার তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ ক'রল। এর পর পূর্ণোদ্যমে তারা গেরিলা যুদ্ধ স্থুরু ক'রে দিল—ফলে ক্যায়ুকপাডাং সড়কে শত্রুদের অগ্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক-সমন্বিত একটি সাজোয়া-বাহিনী ক্যায়ুকপাডাং-এর পথে পোজু-তে (Pozu) এসে পৌঁছল। এখানে আমাদের এক টহলদার সৈন্যদলের সঙ্গে তা'দের দেখা হ'ল। আমাদের সৈন্যদের হাতে রাইফেল ছাড়া অন্য অস্ত্র ছিল না—তাই দিয়েই তারা শত্রুদের ট্যাঙ্কের

উপর গুলি চালাতে লাগ্‌ল। এতে কোন ফল হবে না—এই কথাই তা'রা জান্‌ত কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—শত্রুদল এই গুলির ঘায়েই ট্যাঙ্কগুলি নিয়ে পালিয়ে গেল।

আমাদেব সৈন্যদলের অবিবত প্রবল আক্রমণে শত্রুদল তা'দের ঘঁাটি তুলে পালিয়ে গেল এবং মার্চ্চের প্রথম দিকেই শত্রু-সৈন্যদল ন্যান্‌গুব (Nyangu) নদীকূলের ঘাঁটি থেকে মাত্র আট মাইল পূবে অবস্থান ক'রছিল।

১১ই মার্চ্চ মেজর ধীলন তাউঙ্গজিন আক্রমণ ক'রলেন। এই স্থানটা শত্রুদল কিছুকাল যাবৎ অধিকার ক'রে বসেছিল। আমাদের আক্রমণ শেষ হবাব আগেই ওরা ওখান থেকে সৈন্যদল সবিয়ে নিয়ে গেল।

১৬ই মার্চ্চ তারিখে ক্যাপ্টেন খান মোহাম্মদের উপর সাদি (Sade) গ্রামের সন্নিহিত একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত শত্রুঘাঁটি আক্রমণ ক'ববাব ভার প'ড়ল। অন্যূন এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য দিয়ে শত্রুপক্ষ এ পাহাড়টাকে বেশ ভাল ক'রে আগ্‌লে রেখেছিল। ঐ পাহাড়েব নীচেই একটা জলশূন্য পাহাড়ে নদীর খাদ ছিল—খান মোহাম্মদ রাত্রে চুপি চুপি সেখানে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে গেলেন। পাহাড়টি খুব খাড়া ও গাছপালাশূন্য সেইজন্য পাহাড়ের নিম্নদেশে দুর্ব্বল ও নগ্নপদ সৈনিকদের পশ্চাদপসরণের পথ উন্মুক্ত রাখ্‌বার জন্য রেখে গেলেন—আক্রমণ শেষ হবার পর তাঁর অন্যান্য সৈন্য এই পথে পিছিয়ে আস্‌তে পার্‌বে। তাঁর অনেক সৈন্যেরই পায়ে জুতা ছিল না, তা' সত্ত্বেও তা'দের কর্ত্তব্য কাজ

ক'রবার কোন প্রকার ত্রুটি হয় নি। বস্তুতঃ পোষাক, ঔষধ ও খাদ্য—এর কোন কিছুর অভাবেই আমাদের সৈন্যদের শত্রুর বিরুদ্ধে কর্ম্মতৎপরতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। খান মোহাম্মদের দল নীরবে গুড়ি মেরে মেরে পাহাড়টায় উঠ্‌ছিল কিন্তু হঠাৎ কয়েকখানা পাথর গড়িয়ে প'ড়বার শব্দে শত্রুদল আমাদের সৈন্যদের সাড়া পেয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুই পাশ থেকে গুলি চালাতে সুরু ক'রে দিল। ইহা দ্বারা আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ হ'ল না। তারা এগুতে এগুতে শত্রু-ঘাঁটির একেবারে কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। শত্রুদল আর রক্ষা নেই দেখে সমূহ বিপদের সঙ্কেতে (S. O. S.) নতুন সৈন্যদল ওখানে পাঠাতে সংবাদ দিলে। ক্যাপ্টেন খান মোহাম্মদের সৈন্যদল সঙ্গিন উঁচিয়ে শত্রুদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লে সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গেল। এর মধ্যে নতুন শত্রুসৈন্যদল এসে গেল। প্রায় ৪০০ জন নবাগত শত্রুসৈন্য সাদি পাহাড়ের ঘাঁটিতে পাল্টা আক্রমণ সুরু ক'রলে এবং আক্রমণরত ক্যাপ্টেন খান মোহাম্মদের সৈন্য-দলকে ঘিরে ফেল্‌লে। আমাদের সৈন্যদলের তখন দুইদিকেই বেষ্টনী—তারা ফিরে দাঁড়িয়ে নবাগত এই শত্রুসৈন্যদের সঙ্গে 'চলো দিল্লী', 'নেতাজী-কি-জয়' ব'লে হুঙ্কার ক'রতে ক'রতে প্রচণ্ড বিক্রমে ল'ড়তে লাগ্‌ল। ক্যাপ্টেন খান মোহাম্মদ যে অল্প কিছু সৈন্য পশ্চাদপসরণের পথ উন্মুক্ত রাখ্‌তে পাহাড়ের নীচে নালায় রেখে গিয়েছিলেন—তারা আর আত্মসম্বরণ ক'রতে না পেরে "ভারতমাতা কি জয়", "নেতাজী কি জয়"

হুঙ্কার দিতে দিতে নবাগত শত্রুসৈন্যের উপর ভীষণভাবে গুলিবৃষ্টি স্থরু ক'রলে। শত্রুসৈন্যেরা সংখ্যাধিক্যের জন্য পাহাড়ে ভিড় জমিয়ে তুলেছিল, স্থতরাং তা'দের উপর গুলি চালাতে আমাদের সৈন্যরা খুব স্থবিধাই পেয়েছিল। শত্রুদলের অনেক লোক ক্ষয় হ'ল। আমাদের যে সব সৈন্যরা নালা থেকে যুদ্ধ ক'রছিল—তা'দের গোলাগুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা সঙ্গিন উঁচিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর লাফিয়ে প'ড়ল। জুতো ছিল না ব'লে যে সব সৈন্যদের পিছনে রেখে যাওয়া হ'য়েছিল—তারাও পাহাড়ের খোঁচা খোঁচা পাথরের টুক্‌রোর কথা বিস্মৃত হ'য়ে তা'দের অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে আক্রমণে যোগ দিল। রাত্রি তিনটে থেকে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। শেষে শত্রুদল আমাদের বহির্ব্যূহের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল—আজাদ হিন্দ ফৌজ যে সব লোমহর্ষণকর যুদ্ধ করেছে—সাদি পাহাড়ের যুদ্ধ তার মধ্যে একটি। আমাদের সৈন্যরা এ যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। আমরা অনুমান করি এবং পরে সে অনুমান আমাদের বর্ম্মী গুপ্তচরের দ্বারা সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হয় যে এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অন্ততঃ ২০০ শত লোক মারা গিয়েছিল। আমাদের লোক মারা গিয়েছিল মাত্র ১৭টি।

সাদি পাহাড় আক্রমণ শেষ ক'রে খান মোহাম্মদ তাঁর হেড্ কোয়ার্টার্সে ফিরে এলেন। এই আক্রমণে শত্রুদল একেবারে মুষ্‌ড়ে প'ড়ল, কারণ ওরা ভেবেছিল ঘ্যানৃগু ও প্যাগনের যুদ্ধে ওরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে শেষ ক'রে দিয়েছে।

যে অঞ্চলে আমাদের যুদ্ধ হ'চ্ছিল সে জায়গাটা সমতল, চারিদিক খোলা, জনশূন্য মরুভূমি—অনেক দূরে দূরে কেবল দুই একটা ঝোপ। সৈন্যদের খাবার এবং জল আন্‌তে হ'ত আমাদের প্রায় বিশ মাইল দূরে ক্যায়ুকপাডাং থেকে। পর্য্যাপ্ত মোটর যান না থাকায় জল ইত্যাদি গরুর গাড়ী ক'রেই আন্‌তে হ'ত।

এই সময় শত্রুপক্ষের প্রধান রণকৌশল ছিল প্যাগন, ন্যান্‌গু, প্যাকোকাউ ও মাইন্‌গ্যা-এর পারের ঘাঁটিতে সৈন্য সমাবেশ করা, আর ন্যান্‌গু থেকে পাইনবিন-টাউঙথা (Taungtha) সড়ক দিয়ে মিকটিলায় সাজোয়া বাহিনী প্রেরণ করা।

জাপানী সৈন্যদল আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে শত্রুদলের মিকটিলা আক্রমণের পথে তা'দের উপর চারিদিক থেকে প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছিল। উদ্দেশ্য শত্রুদলকে ইরাবতীর অপর তীরে বিতাড়িত ক'রে দেওয়া।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ওদের মূল ঘাঁটি ন্যান্‌গু আক্রমণ ক'রবার সম্ভাবনা হওয়ায় ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার রীতিমত ভড়্‌কে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন খান মোহাম্মদের সাদি পাহাড় আক্রমণের পর দিনই তিনি (ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার) অনেক সৈন্য নিয়ে আমাদের দল আক্রমণ ক'রবেন সাব্যস্ত ক'রলেন।

তাউঙ্গজিনের যুদ্ধ—১৭ই মার্চ্চ, ১৯৪৫

১৭ই মার্চ্চ তারিখে আমাদের একটি ব্যাটেলিয়ান তাউঙ্গজিন অঞ্চলে আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রে অবস্থান

ক'রছিল। নালাইঙ (Nalaing) গ্রামাঞ্চলে আমাদের "এ" কোম্পানী নামে ছোট একটি দল ছিল—এর কম্যাণ্ডার ছিলেন—লেফ্‌ট, কর্ত্তার সিং। ২য় লেফ্‌ট, গিয়ান সিং বিশতের (Gian Singh Bishet) নেতৃত্বাধীনে "বি" কোম্পানী অবস্থান ক'রছিল তাউঙ্গজিনের উত্তর-পূব দিকে। "সি" কোম্পানীকে ব্যাটেলিয়ানের রিজার্ভ সৈন্যদলরূপে রাখা হ'য়েছিল।

বেলা প্রায় ১১টার সময় শত্রুপক্ষের গোলন্দাজবাহিনী উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আমাদের উপর ভীষণ ভাবে কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে থাকে। এই সময় "এ" কোম্পানীর একদল টহলদার সৈন্য আমাদের সামনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ মোটর লরীতে ক'রে প্রায় এক প্লেটুনের মত গুর্খা সৈন্য ন্যান্‌গুর দিক থেকে এসে এদের আক্রমণ ক'র্‌লে।

আমাদের টহলদার সৈন্যদল তখনই আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রে শত্রু আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিলে, ফলে ওদের সাত জন লোক মারা গেল। এদিকে ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার শত্রু-পক্ষের এই আক্রমণের খবর পেয়ে লেফ্‌ট, দিত্তু্‌রামের অধীনে আর একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন—তারা এসে প্রথম দলের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে শত্রুর অগ্রগতি রোধ ক'রতে লাগ্‌ল।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় শত্রুপক্ষের পনেরটা ট্যাঙ্ক, এগারটা সাজোয়া গাড়ী ও দশখানা ট্রাক্‌ প্রধান সড়ক ধ'রে এগিয়ে এসে আমাদের সামনের ঘাঁটিগুলির উপর ভীষণ ভাবে কামান ও মেশিনগান ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের

সৈন্যরা রাইফেল ও মেশিনগান দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগ্‌ল। শত্রুদল এরপর দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেল—এক ভাগ গেল "এ" কোম্পানীর দিকে, আর এক ভাগ "বি" কোম্পানীর দিকে। "বি" কোম্পানী তখন ২য় লেফ্‌ট, গিয়ান সিং বিশতের নেতৃত্বে তাউঙ্গজিনের উত্তর-পূবে আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রে অবস্থান ক'রছিল।

যে জায়গাটায় এই কোম্পানী অবস্থান ক'রছিল—সেটা একেবারে সমান খোলা মাঠ—তার আশে পাশে, উপরে কোথাও কোন ঢিপি বা গাছপালা ছিল না—সুতরাং শত্রুর গোলাগুলি বা দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়াবার কোন উপায় ছিল না এদের। পাশেই এক অগভীর পুকুর, তাতে জল ছিল না। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এর কাছে এসে মিশেছে। এই তে-মাথার ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ১৪২৩ ফুট উঁচু এক পাহাড়, শত্রু গোলন্দাজবাহিনী তার আড়ালে অবস্থান ক'রে এই তিন রাস্তার সংযোগস্থল এবং তার দক্ষিণ এলাকা তা'দের কামানের পাল্লার ভিতর রেখেছে। সুতরাং এই পাহাড়টা অধিকার ক'রতে পার্‌লে ওদের যুদ্ধের সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ ক'রে দেওয়া যায়।

এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গিয়ান সিং-এর "বি" কোম্পানী অবস্থান ক'রছিল। গিয়ান সিং সিঙ্গাপুরের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে অফিসার হ'য়েছিলেন। তাঁর এই দলে ৯৮ জন মাত্র সৈন্য ছিল—সৈন্যদের হাতে ভারী বা হাল্কা কোন রকমের মেশিনগানই ছিল না—অস্ত্রের মধ্যে

ছিল তা'দের শুধু রাইফেল—এই দিয়েই তা'দের আত্মরক্ষা—এই দিয়েই তা'দের আক্রমণ। তাদের উপর গিয়ান সিং-এর আদেশ ছিল—শত্রুদল যেন কোন রকমে এ স্থান দখল ক'রতে না পারে।

গিয়ান সিং-এর দল পুরো দু'দিন এখানে এই অবস্থায় কাটিয়ে দেয়, শত্রুদল এগিয়ে আস্তে আর সাহস পায় না। ১৯৪৫ সালের ১৭ই মার্চ্চ শত্রু-জঙ্গী-বিমান সকাল থেকে আরম্ভ ক'রে বেলা এগারটা অবধি আমাদের সৈন্যদের উপর বোমা ফেল্‌তে থাকে ও মেশিনগান চালাতে থাকে। এর পর শত্রুদল আমাদের সৈন্যদলের অবস্থান-কেন্দ্রের উপর কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে থাকে এবং সেই সুযোগে আমাদের ঐ দলের দিকে তারা মোটর-বাহিনী পাঠায়। সেই শুক্‌না পুকুরটার কাছে আমাদের এই দলের কয়েকটি অগ্রণী 'প্লেটুন' ছিল,—ওদের মোটর-বাহিনী তা'দের দিকে ধাওয়া করে। আমাদের পরিখাগুলির উপর শত্রুপক্ষের সাজোয়া গাড়ী ভীষণ ভাবে গোলাগুলি ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের সৈন্যরা পরিখায় আত্মগোপন ক'রে শত্রুদল কখন চ'লে যায় তার অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌ল। ওদের ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ীগুলি লৌহ-দানবের মত অগ্নিবৃষ্টি ক'রতে ক'রতে আমাদের সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন ক'রতে আমাদের পরিখাগুলির অতি কাছে এসে গেল। আমাদের পক্ষ থেকে দুটো 'মাইন' ওদের পথে নিক্ষেপ করা হ'ল—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দু'টির একটিও ফাট্‌ল না।

আমাদের এই ঘাঁটি এবং ব্যাটেলিয়ান হেড্‌কোয়ার্টার্সের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। ২য় লেফ্‌ট, কর্ণেল গিয়ান সিং যখন বুঝ্‌লেন যে শত্রুদের কামান, মেশিনগান, হাতবোমা ও হালকা অটোমেটিকের অগ্নিবৃষ্টির সামনে আমাদের রাইফেল চালান বৃথা—সৈন্যদের এমনি পরিখায় প'ড়ে থাকায় মৃত্যু বা বন্দী হওয়া নিশ্চিত অথচ ওদের কিছু ক্ষতি হ'বে না,—তখন তিনি নিজের দলের সৈন্যদের আক্রমণের হুকুম দিলেন। "নেতাজী কি জয়", "ইন কিলাব জিন্দাবাদ", "আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ"—প্রভৃতি ধ্বনি ক'রতে ক'রতে তিনি নিজেই সৈন্যদের নিয়ে লৌহ-দানব-সংরক্ষিত শত্রু-পদাতিক-সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন। আমাদের সৈন্যরা তাঁর সাথে ঐ সব হুঙ্কারে যোগ দিতে লাগ্‌ল—শত্রুদের গোলাগুলির আওয়াজ এদের হুঙ্কারশব্দে চাপা প'ড়ে গেল। আমাদের সৈন্যদল জান্‌ত যে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে চ'লেছে, তবুও তারা কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না। এদের দৃঢ় সঙ্কল্পই একমাত্র অবলম্বন—আর শত্রুর হাতে আধুনিক উন্নতধরণের সব সমরোপকরণ। ভারতবর্ষ এবং তার স্বাধীনতার কথা স্মরণ ক'রে আমাদের সৈন্যরা ওদের ট্যাঙ্কগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল এবং তার পরই হাতাহাতি যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গেল। পুরো দু'ঘণ্টা ধ'রে যুদ্ধ চল্‌ল—আমাদের সৈন্যরা কিছুতেই দম্‌বার পাত্র নয়। বহু শত্রুনাশ ক'রে আমাদের সৈন্যরা তা'দের মাত্র ৪০ জন

সঙ্গীর প্রাণ হারাল। শত্রুদল শেষে এদের দৃঢ় পণ দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল।

এরপর লেফ্‌ট, গিয়ান সিং তাঁর তৃতীয় প্লেটুনকে ডেকে তা'দের যুদ্ধের নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন এমন সময় শত্রুপক্ষের এক বন্দুকের গুলি মাথায় লেগে তিনি প'ড়ে গেলেন—আর উঠ্‌লেন না। তাঁর সহকারী তখন দলের নেতৃত্বভার নিয়ে সৈন্যদের পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে নিলেন।

২য় লেফ্‌ট, গিয়ান সিং বিশৎ তাঁ'র সৈন্যদের বল্‌তেন—তিনি তা'দের সঙ্গেই যুদ্ধে প্রাণ দেবেন। এমনি ক'রে তিনি তাঁর সে প্রতিশ্রুতি রাখ্‌লেন, জীবনে-মরণে তিনি তা'দের সঙ্গী হ'লেন।

শত্রুদের যে দল "এ" কোম্পানীর দিকে এগিয়ে আস্‌ছিল প্রথমে তা'রা গ্রামটার ওপর কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে থাকে —এর পর তা'রা ট্যাঙ্ক, সাজোয়া গাড়ী এবং মোটর বাহিত সৈন্যদল নিয়ে "এ" কোম্পানীর অবস্থান-কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আস্‌তে থাকে। সাজোয়া গাড়ী গ্রামে প্রবেশ ক'রেই গুলি ছুঁড়্‌তে থাকে। আমাদের সৈন্যদলও এর প্রত্যুত্তর দেয়। বিকাল ছয়টার সময় শত্রুদল সঙ্গীন উঁচিয়ে ভারী ট্যাঙ্কের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকে। আমাদের সৈন্যরা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শত্রুদের ট্যাঙ্কের অগ্রগতিতে বাধা দিতে থাকে। ট্যাঙ্কের রক্ষাবরণের অভাবে শত্রুদের আর এগনোর সাহস থাকে না। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে তা'দের তিন জন মৃত সঙ্গীকে ফেলে রেখে তা'রা পালিয়ে

যায়। সারাদিন ধ'রে যে তাউঙ্গজিনে এমন ভীষণ যুদ্ধ চলে—সে তাউঙ্গজিন আমাদের অধিকারেই থেকে যায়।

১৯৪৫ সালের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে আমি মেজর ধীলনের সঙ্গে তা'র হেড্‌কোয়ার্টার্সে দেখা করি। সেখানেই তাঁর ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার লেফ্‌ট, খান মোহাম্মদ ও ক্যাপ্টেন মহম্মদ হুসেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। পর পর দু'টো যুদ্ধতে ল'ড়ে থাক্‌লেও আমাদের সৈন্যদলের মনেব স্ফূর্ত্তি কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি। এর পরের সপ্তাহ ধ'রে দুই পক্ষেরই টহলের কাজ বেশ পুরো মাত্রায় চ'লতে থাকে।

সাধারণতঃ শত্রুদলকে দিনের বেলায়ই বেশী কর্ম্মতৎপর থাক্‌তে দেখা যেত—কারণ ঐ সময় তা'রা বিমান ও ট্যাঙ্কের সাহায্য পেত। এই সব সাহায্য না পেলে তা'রা নিজেদের একেবারে অসহায় মনে ক'রত, এই জন্য রাত্রে তা'রা কাঁটা তারের বেড়ার পেছনে আশ্রয় নিত। এদিকে আমাদের সৈন্তরা দিনের বেলায় শত্রুদের বিমানের দৌরাত্ম্যে আত্ম-গোপন ক'রে থাকৃত—যত কর্ম্মতৎপরতা তা'দের রাত্রে। প্রায়ই দেখা যেত—কোনও স্থান দিনের বেলা থাকৃত শত্রুদের অধিকারে—রাত্রে সে স্থান হ'ত আমাদের।

২৭শে মার্চ্চ তারিখে ২নং ডিভিশানের উপর হুকুম হ'ল ৩০।৩১শে মার্চ্চের রাত্রে তা'দের পাইনবিন (Pyinbin) আক্রমণ ক'রতে হবে।

৪নং রেজিমেণ্টের (নেহরু ব্রিগেডের) উপর যে কর্ম্মভার ন্যস্ত ছিল তা' যথাযথ পালন ক'রবার পর তা'দের

পোপায় ফিরে আস্তে আদেশ দেওয়া হ'ল। এই দল ৫ই এপ্রিল তারিখে পোপায় ফিরে এল। এরপর এর উপর আবার নতুন কাজের ভার দেওয়া হ'ল—কাজটা হ'চ্ছে—মিকটিলা-ক্যায়ুকপাডাং সড়ক ও পোপা রক্ষা করা।

৮ই এপ্রিল তারিখে সংবাদ এল—শত্রুদল মিকটিলা অধিকার ক'রে আরও কিছুদূর এগিয়ে এসেছে এবং পাইনমানা এলাকায় যুদ্ধ চলেছে।

আর একটা শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনী মিকটিলা থেকে ক্যায়ুকপাডাং সড়ক ধ'রে এগিয়ে এসে নাতমাউক (Natmauk) ও তোয়ানডুইঙ্গি (Taundwingy) অধিকার ক'রবার জন্য দক্ষিণে ফিরেছে। এমনি ক'রে দুই ডিভিশান শত্রুসৈন্য আমাদের পিছনে প্রায় ১৫০—২০০ মাইল প্রবেশ করেছে। অবস্থা বেশ ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌ল—জাপানী সৈন্যদের উপর আদেশ হ'ল—যে ভাবে পারে পশ্চাদপসরণ ক'রে তারা মৌলমিনে চ'লে যাবে।

২নং ডিভিশানের উপর হুকুম হ'ল—তা'দের ম্যাগউয়ি-মিনবু (Magwe-Minbu) এলাকায় চ'লে যেতে হবে। ১নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট কর্ণেল হুসেনের নেতৃত্বে এই এলাকা শত্রুপক্ষের প্যারাস্যুট ও গেরিলা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করছে।

যুদ্ধাদেশ

ইউনিট নং ৫৯৯ অতীব গোপনীয়

বেলা ১২টা মানচিত্র নং ৮৪এল্ ও ৮৪ এফ্ কপি নং ৩

মানচিত্রের স্মারক (Ref.) ১: ২৫০,০০০তারিখ—এপ্রিল ১৯৪৫

১। জ্ঞাতব্য :—৫৯৯নং ইউনিটকে নতুন কার্য্যভার দেওয়া হ'ল। এর কাজ হ'বে (ক) প্যারাস্যুট-ধ্বংসাত্মক কাজ। (খ) আই, ও, সি,-র (I.O.C.) রক্ষা-বিধান। (গ) যে এলাকায় আজাদ হিন্দ ফৌজ অবস্থান করছে সেখানে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। (খ) ও (গ) সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে—কয়েক দল ডাকাত অসামরিক লোকজনের বাড়ীতে এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সরবরাহ লাইনে লুট-তরাজ করছে। আমাদের প্রধান কাজ হ'বে তা'দেরই দমন করা।

২। অভিপ্রায় :—৫৯৯ ইউনিটের বিভিন্ন শাখার গতিবিধি :—(ক) ইউনিট নং ৬০৩—ইহার বর্ত্তমান অবস্থান ম্যাগউয়ি-মিনবু (Magwe-Minbu) এলাকাতেই থাক্‌বে। ৬০৬-নং ইউনিট ছাড় পাওয়ার পর ম্যাগউয়িতে ৬০৩নং ইউনিটের সঙ্গে মিলিত হ'বে। (খ) ৭৪৭নং ইউনিট—অবস্থান নাতমাইক-তোয়ানডুইঙ্গি (Natmauk-Taundwingy)। (গ) ৮০১নং ইউনিট—অবস্থান মিনহালা—সিনবয়াঙ্গুই এলাকায় (Minhala to Sinbaungwe)। (ঘ) হেড্-কোয়ার্টার্স ইউনিট নং ৫৯৯ ম্যাগউয়ি এলাকার বিশেষ একটি জায়গায় স'রে যাবে—নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরে জানানো হবে।

৩। প্রণালী :—(ক) ১৯৪৫ সালের ১০ই এপ্রিলের সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন ইউনিট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাত্রা সুরু ক'রবে। যত শীঘ্র সম্ভব এরা এদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছবে। প্রত্যেক ইউনিট তার পূর্ব্ব অবস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সম্যক্ বিবরণ তার হেড্ কোয়ার্টার্সের কাছে দাখিল ক'রবে। (খ) পথ :—(ক) ৫৯৯নং ইউনিটের অভিযাত্রী দলগুলির মাঝে ৮০১নং ইউনিট গরুর গাড়ীর পথ ধ'রে নিম্নলিখিত গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'বে : ক্যায়ুকপাডাং (চাউপাডাঁও) ওয়ালা (Ywala)—ইয়েজন (Yezon)—ওক্ষিতন্-ওয়েতম্যাসুৎ (Okshitton Wetmasut)—ম্যাগউই। (২) ৭৪৭নং ইউনিট গরুর গাড়ীর পথে যাবে—ক্যায়ুকপাডাং—ক্যাৎকুন (Kyatkun) —স্যাঙ্গন (Sangon)—ম্যাজ্যিগন ইয়ামুন (Magyigon Yamun)—নাতমাউক (Natmauk)—সেখান থেকে যাবে তারা তোয়ানডুইঙ্গ্যি (Taundwingy)।*

৪। পরিচালনা—(ক) মালপত্র স্থানান্তরিত করা

---

* নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি ইউনিটের এইরূপ সাঙ্কেতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হ'য়েছিল :—

৫৯৯—২নং ডিভিশান
৬০৩—১নং পদাতিক সৈন্যদল
৭৪৭—২নং " "
৬০৬—৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট (নেহরু রেজিমেণ্ট)

—প্রত্যেক ইউনিটই সাধ্যমত নিজেদের যে সব দল ভারী মালপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌ছে না ব'লে পিছনে প'ড়ে থাক্‌ছে তা'দের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রবে। যদি কখন পরে যানবাহন পাওয়া যায় তবে এই সমস্ত পরিত্যক্ত মাল পাঠাবার ব্যবস্থা হ'বে।

(খ) রসদ (১) নাতমাউকে যে সব ইউনিট যাচ্ছে সেগুলি ছাড়া আর সবাই পথের খাবার সঙ্গে নিয়ে যাবে—তা' ছাড়া তিন দিনের খাদ্য অতিরিক্ত রাখ্‌তে হ'বে। (২) যে সব ইউনিট নাতমাউকে যাবে তা'দের পথের খাবার ছাড়া অন্ততঃ ৭ দিনের খাবার সঙ্গে নিতে হ'বে। এই এলাকায় যে সব ইউনিটকে এক মাসের অতিরিক্ত (Reserve) খাবার দেওয়া হ'য়েছিল—তা'দের ঐসব খাবার ডেপুটি কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের কাছে ফেরত দিতে হ'বে। ডেপুটি কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল বিভিন্ন ইউনিটকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এ বিষয়ে বিশেষ নির্দ্দেশ দিবেন। যে ইউনিটকে পূর্ব্বে যতটা দেওয়া ছিল—সেই পরিমাণ মজুত রসদ—বিশেষ ক'রে চা'ল ও লবণ ডেপুটি কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলকে তার ফেরত দিতে হ'বে। (গ) চিকিৎসা। ১৯৪৫ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে এখানকার 'মেডিক্যাল এড্ পার্টি হস্‌পিটাল' বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'বে—ওখানকার রোগী, ঔষধ ও জিনিসপত্র এ, ডি, এম্, এস্,-এর বিভিন্ন নির্দ্দেশ মত অন্যান্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হবে।

৫৯৯নং ইউনিটের স্থানান্তর গমন সম্পর্কে বিশেষ

নির্দ্দেশ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয়েছে—ঐ নির্দ্দেশগুলি যথাযথ-ভাবে পালন ক'রতে হ'বে।

৫। জ্ঞাতব্য :—গন্তব্য স্থানে পৌঁছবামাত্র প্রত্যেক ইউনিট তা'র যাত্রার সঠিক বিবরণ হেড্‌কোয়ার্টার্স ৫৯৯নং ইউনিটের কাছে দাখিল ক'রবে।

৬। স্বীকৃতি।

(স্বাক্ষর) কর্ণেল শাহনওয়াজ খান, কম্যাণ্ডার ৫৯৯নং ইউনিট।

বিজ্ঞপ্তি—৬০৫নং ইউনিট, ৭৪৭নং ইউনিট, ৮০১নং ইউনিট ; এ, ডি, এম্, এস্, ; ডি, কিউ, এম্, জি, ; অফিসার।

৫৯৯নং ইউনিট—২ ডিভিশানের সঙ্কেত।

পরে এই ইউনিটটি ১৯৪৫ সালের ১১।১২ই এপ্রিল রাত্রে পোপা ত্যাগ ক'রে দুইটি শত্রু পরিবেষ্টনী ভেদ ক'রে ১৯শে এপ্রিল সকালে ম্যাগউই পৌঁছে। ঐ দিনই বেলা ৩টার সময় শত্রু ট্যাঙ্ক ঐখানে প্রবেশ করায় ঐ ইউনিটকে প্রোমে পশ্চাদপসরণের হুকুম দেওয়া হয়। সেখান থেকে আবার একে রেঙ্গুনের ৩০ মাইল উত্তর তাইকাই-তে (Taikyi) স'রে যেতে হয়। তারপর রাস্তা বন্ধ দেখে এ ইউনিট পূবের দিকে ফিরে পেগু-যোমাস-এ (Pegu-Yomas) প্রবেশ করে। এরপর ১৪ই মে তারিখে পশ্চাদপসরণের সকল পথ রুদ্ধ হওয়ায় এই ইউনিটের অধিকাংশকে পেগুতে ব্রিটিশদের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে হয়। পোপা থেকে পেগু—এই

সুদীর্ঘ ৫০০ মাইল পশ্চাদপসরণের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের শেষাংশে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

২নং পদাতিক সৈন্যদলের কার্য্যকলাপ

২নং পদাতিক সৈন্যদল গঠন করা হয় সিঙ্গাপুরে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। কর্ণেল রোডারিগ্‌সকে (Roderigues) করা হয় এর কম্যাণ্ডার। এই দল প্রথমে ইপোয় স্থানান্তরিত হ'য়ে ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে রেঙ্গুনে আসে।

রেঙ্গুনে আসার পর কর্ণেল রোডারিগ্‌সের পরিবর্ত্তে কর্ণেল পি, কে, সাইগলকে এর কম্যাণ্ডার করা হয়। কর্ণেল রোডারিগ্‌স ডিভিশনাল হেড্‌ কোয়ার্টার্সের ১নং জেনারেল ষ্টাফ্‌ অফিসারের পদে নিযুক্ত হ'ন।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে এই রেজিমেণ্টকে আদেশ দেওয়া হয় প্রোম ও ক্যায়ুকপাডাং-এর পথে পোপার দিকে অগ্রসর হ'তে। সেখানে গিয়ে এরা পোপা পাহাড়কে শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর একটা সুদৃঢ় ঘাঁটি ক'রে তুল্‌বে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কর্ণেল সাইগল তাঁর হেড্‌-কোয়ার্টার্সের সব কিছু নিয়ে রেঙ্গুন থেকে পোপার দিকে রওয়ানা হ'ন। যাবার পথে তিনি জাপানীজ আরাকন কম্যাণ্ডারের (সাকু-বুতাই) হেড্‌ কোয়ার্টার্স হ'য়ে যান। এখানে তাঁর সিঙ্গাপুর-খ্যাত জেনারেল ইয়াকুরোর সঙ্গে দেখা

হয়। জেনারেল ইয়াকুরো তখন আরাকান কম্যাণ্ডের জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষরূপে কাজ ক'রছিলেন। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে গোলাযোগ হবার পর থেকে তাঁহাকে আজাদ হিন্দের লিয়েজং ডিপার্টমেণ্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'য়েছিল বটে—কিন্তু তবুও আজাদ হিন্দ ফৌজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে আগ্রহ তাঁর একটুও কমে নি। যুদ্ধার্থে ২নং ডিভিশানকে সাকু-বুতাই-এর নেতৃত্বাধীনে রাখা হ'য়েছিল। জেনারেল ইয়াকুরো কর্ণেল সাইগলের মুখে যখন শুনলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের কামান, ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইন, ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান প্রভৃতি কিছুই নেই, তখন তিনি এ সমস্তই তা'দের দেবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সাকু-বুতাই-এর হেড্‌কোয়ার্টার্স রেঙ্গুনের প্রায় ৩০ মাইল দূরে প্রোম সড়কের পাশে এক জঙ্গলে অবস্থিত ছিল। এখানে হয়ে সাইগল য়েন্নাওগিয়াঙ-এর (Yennawgyaung) দিকে অগ্রসর হ'ন—পথে জেনারেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে তাঁ'র দেখা হয়। তিনি এই অঞ্চলে যুদ্ধরত এক জাপানী ডিভিশানের নেতৃত্ব ক'রছিলেন। জেনারেল ইয়ামামোতোর সৈন্যদলের সঙ্গে কর্ণেল সাইগলের সৈন্যদলের মিলে-মিশে যুদ্ধ করা স্থির হয় এবং বিভিন্ন সৈন্যদলের যুদ্ধ স্থানও নির্দ্দিষ্ট হয়।

কর্ণেল সাইগল এইখানে এসে জানলেন যে ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট (নেহরু ব্রিগেড) ন্যান্‌গু ও প্যাগনে যুদ্ধ ক'রবার পর বাধ্য হ'য়ে পোপা ও ক্যায়ুকপাডাং-এ পশ্চাদপসরণ

ক'রেছে। ব্যাপার বড়ই সঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে। কর্ণেল সাইগল সেইজন্য ঠিক ক'রলেন—যত শীঘ্র সম্ভব তিনি তাঁ'র সৈন্যদল নিয়ে পোপায় গিয়ে পোপা ও ক্যায়ুকপাডাং-এর দিকে শত্রুর অগ্রগতিতে বাধা দেবেন।

ইত্যবসরে শত্রুদল ন্যানৃগু, প্যাগন এবং প্যাকোকাউ-এর ওখানে ইরাবতী পার হ'য়ে পাইনবিন, তাউঙ্গথা (Taung-tha) ও মিকটিলার বহির্ভাগ অধিকার ক'রেছে। নেতাজীও এই সময় মিকটিলায় ব্রিটিশ সৈন্যদল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হ'ন। কর্ণেল সাইগল ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পোপায় উপস্থিত হ'য়ে সেখানকার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হ'ন। প্রায় দু'শো ক'রে ছোট ছোট দলে তাঁ'র ইউনিট আস্‌তে সুরু করে।

এই সময় মেজর জি, এস্‌, ধীলনের সঙ্গে তাঁ'র দেখা হয়। তিনি ন্যানৃগু থেকে এখানে পশ্চাদপসরণ ক'রেছিলেন। এই দুই কম্যাণ্ডার এক সঙ্গে যুক্তি ক'রে তাঁ'দের সৈন্য ও সমরোপকরণ একত্র ক'রে পোপা ও ক্যায়ুকপাডাং রক্ষা ক'রতে সঙ্কল্প ক'রলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি (কর্ণেল শাহনওয়াজ খান) পোপায় উপস্থিত হ'য়ে ২নং ডিভিশানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করি। বিভিন্ন বিগ্রেডের উপর নিম্নলিখিতভাবে আমি কার্য্যভার অর্পণ করি :—

১। কর্ণেল পি, কে, সাইগল ২নং পদাতিক সৈন্যদলের নেতৃত্ব নিয়ে পোপায় আমাদের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি গ'ড়ে

তুল্‌বেন—যে সব শত্রু ইরাবতী পার হ'য়েছে এখান থেকে তা'দের উপর আক্রমণ চালাতে হ'বে। পোপার উত্তর এবং উত্তর-পূবে এদের বেশ ভালভাবে টহল দিতেও হ'বে। ব্রহ্মদেশ রক্ষা কার্য্যে পোপার পার্ব্বত্য এলাকার গুরুত্ব সবার চেয়ে বেশী। পোপা একটা ছোট মালভূমি বটে—কিন্তু এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এসে মিশেছে, তা' ছাড়া এখান থেকেই ২০ মাইল পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের জল সরবরাহ হয়। এই জন্যই যুদ্ধের ব্যাপারে এর উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। এই জায়গা অধিকারে থাক্‌লে এই রণাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-পরিচালনার বিশেষ সুবিধা। এই স্থানটি শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং ২নং রেজিমেণ্ট বিশেষ আগ্রহে এই স্থানটা রক্ষার আয়োজন ক'রতে লাগ্‌ল। বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানকে বিভিন্ন এলাকার ভার দেওয়া হ'ল। যথা—

(ক) পাইনবিন-পোপা সড়কের চারিধারের ভার প'ড়ল ১নং ব্যাটেলিয়ানের উপর।

(খ) ক্যায়ুকপাডাং—পোপা সড়কের ভার প'ড়ল ২নং ব্যাটেলিয়ানের উপর।

(গ) তাউঙ্গথা সড়কের ভার প'ড়ল ৩নং ব্যাটেলিয়ানের উপর।

এ ছাড়া ২নং ব্যাটেলিয়ান ক্যায়ুকপাডাং-মিকটিলার সড়কের উপর—ক্যায়ুকপাডাং থেকে এক মাইল পূবে একটা আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রে অবস্থান ক'রবে।

২। মেজর জি, এস্, ধীলনের নেতৃত্বাধীন ৪নং রেজিমেণ্টের (নেহরু ব্রিগেডের) উপর আদেশ হ'ল—তা'রা ক্যায়ুকপাডাং (চাউপাডাঁও) এর পশ্চিমে শত্রুদলের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ চালাবে।

কর্ণেল শাহনওয়াজ মিকটিলায় নেতাজীর কাছে যুদ্ধের সংবাদ দিতে যাওয়ায় কর্ণেল সাইগল তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়িভাবে ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের কাজ ক'রছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা হঠাৎ তিনি খবর পেলেন—শত্রুদল সিকতিনে (Seiktin) প্রবেশ ক'রে পোপার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানী দ'ল পাঠানো হ'ল এবং টহলের ব্যবস্থা করা হ'ল এবং এর পরই শত্রুর সঙ্গে সংঙ্ঘর্ষ সুরু হ'ল।

কয়েকদিন পরে এস্, ও, আবদুল্লা খাঁর অধীনস্থ একদল অনুসন্ধানী সৈন্য দাওয়াঙ্গল (Daungle) গ্রামের আশে পাশে ঘুরাফিরা ক'রবার সময় দেখে শত্রুপক্ষের এক সাঁজোয়া বাহিনী ঐ গ্রামের দিকে আস্ছে। দলপতি তখনই ওদের আক্রমণ করা স্থির করেন। আবদুল্লার সঙ্গে মাত্র ২০ জন সৈন্য তখন ছিল, ঐ অল্পসংখ্যক সৈন্যকেই দুই দলে ভাগ ক'রে নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। শত্রুদল তখনই তা'দের উপর গুলিবর্ষণ সুরু ক'রলে। আমাদের সৈন্যরা আড়ালে গিয়ে তা'দের উপর গুলি ছুঁড়্তে থা'কল, ফলে তা'দের কতকগুলি মারা গেল। এস্, ও, আবদুল্লা খাঁ বিশেষ সমর-কৌশল অবলম্বন ক'রে আমাদের সৈন্যদলকে

শত্রুর অনেক কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে আক্রমণ ক'রতে গিয়ে দেখেন—তারা দু'টি মৃত সৈনিক আর তিনখানা জিপ গাড়ী রেখে আগেই পালিয়ে গিয়েছে। আমাদের সৈন্যরা কতকগুলি বেতার-যন্ত্র, মেশিনগান ও প্রচুর গোলাগুলি দখল করে।

পরদিন প্রায় এক ব্যাটেলিয়ান শত্রুসৈন্য ট্যাঙ্ক ও কামান সঙ্গে নিয়ে দাওয়াঙ্গল গ্রামের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে,—দেখে মনে হয়, ওরা হয়ত পোপা আক্রমণ ক'রবে। আমাদের সৈন্যরা নিজের নিজের জায়গায় প্রস্তুত হ'য়ে শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষা ক'রতে থাকে। তা'ছাড়া শত্রুদের বিপন্ন ক'রবার জন্য কয়েক দল শক্তিশালী টহলদার সৈন্যও তা'দের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শত্রুদল তবুও দাওয়াঙ্গল গ্রামের দিকে অগ্রসর হয় এবং ভীষণভাবে কামানের গোলা ছুঁড়্‌বার পর গ্রামটি অধিকার করে। ওখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন সৈন্য ছিল না, সুতরাং শত্রুরা গ্রামটায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাকালে পাইনবিনের দিকে ফিরে যায়।

এর পরের কয়েক দিন শত্রুদল ২নং রেজিমেণ্টের আর কোন বিঘ্ন করে না—ওরা হয়ত পোপা থেকে কিছুদূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করেছিল।

১৪ই মার্চ্চ তারিখে ২নং রেজিমেণ্ট পাইনবিন আক্রমণ ক'রতে আদেশ পায়। আক্রমণকারী দল পোপা থেকে রাত্রি এগারোটায় যাত্রা করে। এতে মাত্র দুইটি 'রাইফেল কোম্পানী' ছিল—তা'দের নেতা ছিলেন কর্ণেল সাইগল।

এই দল যেখানে যুদ্ধ ক'রতে যাচ্ছে সেখানে জল পাওয়া যায় না ব'লে গরুর গাড়ীতে ক'রে তারা জল নিয়ে যায়। ২নং পদাতিক সৈন্যদলের অস্ত্রশস্ত্র এবং গুলিবারুদের ব্যবস্থা একেবারে ভাল ছিল না।

এই বাহিনীর সঙ্গে মাত্র তিনটি ওলন্দাজ কামান এবং ৮০ বার ছুঁড়্বার মত গোলাবারুদ ছিল—দরকার হ'লে আর পাবার সম্ভাবনা একেবারে ছিল না। তা'দের মাঝারী আকারের মেশিনগানগুলির কতকগুলি ব্রিটিশ কারখানায় তৈরী আর কতকগুলি ওলন্দাজ কারখানায়,—প্রত্যেকটির জন্য মাত্র ৪০০ বার ছুঁড়্বার মত গুলি ছিল। নতুন সরবরাহ পাবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের হাল্কা অটোমেটিকগুলির কতকগুলি হ'চ্ছে ব্রেন গান—আর কতকগুলি লিউইচ্ (Lewis)। প্রত্যেক সৈন্যের মাত্র ১০০ বার ছুঁড়্বার মত গুলি ছিল এবং ব্রিগেডের সঙ্গে অতিরিক্ত (Reserve) আর গুলি বারুদ কিছু ছিল না। বাহিনীর যে গোলাগুলি হাতে ছিল—অবিরত যুদ্ধ হ'লে মাত্র দু' ঘণ্টা তাতে চল্‌তে পারে।

এ এলাকার সব দিকই খোলামেলা, সুতরাং বাহিনীর অন্তর্গত ছোট ছোট দলকে এখানকার নানা দিকে ছড়িয়ে প'ড়তে হ'য়েছিল—অথচ তা'দের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ক'রবার জন্য কোন বেতার বা টেলিফোন যন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল না।

এই আক্রমণকারী দল রাত্রি এগারোটায় পোপা ত্যাগ

ক'রে ভোর ৬টায় সেতসায়োতে (Setsayo) গিয়ে পৌঁছে। সেখানে জাপানীদের একটা ছোট ঘাঁটি ছিল। পথ বালুকাময়—তাই আমাদের সৈন্যদলের যেতে অত্যন্ত কষ্ট হ'য়েছিল, তা' ছাড়া গরুর গাড়ীতে সৈন্যদের জল যাচ্ছিল—জলের গাড়ী সৈন্যদের সাথে সাথে যেতে পারে নি, তাই স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তা'দের জল কিনে খেতে হ'য়েছিল।

দিনের বেলা আমাদের সৈন্যরা লুকিয়েছিল এবং কর্ণেল সাইগল জাপানী কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা ক'রে শত্রুর তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রলেন। আমাদের টহলদারী সৈন্যের কাছ থেকে সমস্ত খবর পেয়ে কর্ণেল সাইগল ১৫।১৬ই মার্চ্চের রাত্রে পাইনবিন আক্রমণ করা স্থির ক'রলেন।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় আমাদের সৈন্যদল সেতসায়ো (Setsayo) থেকে যাত্রা ক'রে মেইন (Meyne) নামে একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়। এইখানে গিয়ে সৈন্যদলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বিভক্ত দলের একটি প্রথমে ডা'ন দিক থেকে আক্রমণের ভাণ ক'রবে, সামান্য পরে অপর দলটি প্রধান আক্রমণ স্থরু ক'রবে বাঁ দিক থেকে। এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করায় ফল খুব ভা'ল হয়: শত্রুদল বিচ্ছিন্ন—বিধ্বস্ত হ'বার ভয়ে পরিখা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যরা এর পর যখন ওদের পরিখাগুলি আক্রমণ করে, তখন দেখে সেগুলি শূন্য। কেবল এক পরিখায় তারা একটু বাধা পায় কিন্তু

লেফ্‌ট, যোগীন্দ্র সিং হাত বোমা ফেলে এখানকার শত্রুদের বিনাশসাধন করেন—প্রায় ৮টি শত্রুসৈন্য এখানে মারা যায়। এই যুদ্ধে লেফ্‌ট, যোগীন্দ্র সিং সেতসায়ো থেকে এক প্লেটুন জাপানী সৈন্য নিজের নেতৃত্বাধীনে পেয়েছিলেন। আমাদের দলের মাত্র একটি লোক নিহত হয়—আর একটি হয় আহত। পাইনবিনের মেটে ঘরবাড়ী এবং মজুদ মালপত্র ধ্বংস ক'রবার পর আমাদের সৈন্যদল সেতসায়োয় ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ১৭ই মার্চ্চ তারিখে তারা পোপায় ফিরে আসে।

ঠিক এই সময় মিকটিলায় জাপানী ও ব্রিটিশ সৈন্যদলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চ'লতে থাকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকটি সৈন্যদলও এইখানে যুদ্ধরত ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যদল সব বিমান ঘাঁটিগুলি অধিকার ক'রে নেয়, তা' ছাড়া মান্দালয়, রেঙ্গুন, থাজি এবং ক্যায়ুকপাডাং (চাউপাডাঁও) থেকে মিকটিলা যাবার রাস্তাগুলি বন্ধ ক'রে দেয়। ব্রহ্মদেশে জাপানীদের শত্রু প্রতিরোধের প্রধান শক্তিকেন্দ্রই হ'চ্ছে মিকটিলা,—জাপানীরা তাই এটাকে পুনরধিকার ক'রতে উঠে প'ড়ে লাগে। থাজি প্যাবউই (Pyabwe) মীনগাঁ এবং ক্যায়ুকপাডাং থেকে জাপানীরা ব্রিটিশের উপর প্রবল আক্রমণ চালাতে থাকে।

১৯৪৫ সালের ২০শে মার্চ্চের কাছাকাছি সাব্যস্ত হয় যে, আমাদের কোন সৈন্যদল যদি পাইনবিন অধিকার ক'রতে পারে তা' হ'লে মিকটিলা আক্রমণরত জাপানী সৈন্যদলের

বিশেষ সাহায্য করা হয়—কারণ যে সকল পথে রসদ, সমরোপকরণ এবং নতুন সৈন্যদল মিকটিলায় আসতে পারে —সেগুলির সংযোগস্থল হ'চ্ছে পাইনবিন। এই জন্য এই স্থানটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুদল আমাদের গতবার পাইনবিন আক্রমণের পর ওখানে নিজেদের আত্মরক্ষা ঘাঁটি সুদৃঢ় করেছে। যতদূর সম্ভব ওরা প্রায় এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ওখানে সমবেত করেছিল—তা' ছাড়া প্রচুর রসদ ও সমরোপকরণও সংগ্রহ করেছিল।

অবশেষে ঠিক হ'ল—আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপ সৈন্যদল একত্রে মিলিত হ'য়ে পাইনবিন আক্রমণ ক'রে ওদের সৈন্যও ভাণ্ডার বিধ্বস্ত ক'রবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী আক্রমণ চালাতে নিম্নলিখিত আদেশ দেওয়া হয় :—

২নং ডিভিশানের যুদ্ধাদেশ নং ৫

১। শত্রুদল : শত্রুদলের এক ব্রিগেডের মত একটা সাজোয়া বাহিনী গত মাসের শেষে মিকটিলায় প্রবেশ ক'রে সেইখানেই র'য়ে গেছে। তা'দের বলবৃদ্ধির জন্যে ন্যান্‌গু ও প্যাকোকু-তে (Pakoku) দু'টি প্রবল পারের ঘাঁটি করেছে। এই দুই ঘাঁটিতে সেনাবল প্রায় দুই ব্রিগেডের মত।

এও জানা গেছে যে শত্রুপক্ষ সম্প্রতি ১০টি ট্যাঙ্ক, ১০টি সাজোয়া গাড়ী এবং প্রায় ১ ব্যাটেলিয়ান পদাতিকের সাহায্যে পাইনবিন অধিকার ক'রেছে। পাইনবিনের প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পূবে অবস্থিত থিড (Thedaw) নামক

স্থানে তাউঙ্গথা (Taungtha) রণাঙ্গনের জন্য রিজার্ভ সৈন্য রেখেছে। মীনগাঁ, তাউঙ্গথা ও মাহলেইঙ্‌-এ (Mahlaing) শত্রুসৈন্যের শক্তিশালী কয়েকটি দল অবস্থান ক'রছে।

২। মিত্র বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ: শক্তিশালী জাপানী সৈন্যদল বীর বিক্রমে মিকটিলা আক্রমণ ক'রে শত্রুদলকে সহর থেকে বিতাড়িত ক'রে হ্রদের পশ্চিম তীরে নিয়ে গিয়েছে। পাইনবিনের ১০ মাইল দক্ষিণ-পূবে আমাদের রণাঙ্গনের সিকতিন (Seiktin) নামক স্থানে একদল নতুন হিদান (Heidan) এসেছে।

খাঞ্জো বাহিনীগুলি র'য়েছে পাইনবিনের ৪ মাইল দক্ষিণে সেতসায়োতে (Setsayo)। আরও পশ্চিমে ক্যায়ুকপাডাং-ম্যান্‌গু সড়কের উপর নতুন এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য এসে তাউঙ্গজিন্‌ এবং মায়াউকি্য-নেগালেয়িন (Mayaukye-Negalaine) রক্ষার ভার ৪৫৯নং ইউনিটের কাছ থেকে নিজেরা গ্রহণ করেছে। কানটেটস্থ সৈন্যদল ইরাবতীর দুই তীর দিয়েই বেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

অভিপ্রায়: ৫৩১নং বাহিনী খাঞ্জো বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ৩০।৩১শে মার্চ্চ রাত্রে পাইনবিনে অবস্থিত শত্রু-সৈন্য দলকে বিধ্বস্ত ক'রবে।

৩। পদ্ধতি: আক্রমণের সূচনায় বাহিনীগুলি নিজের নিজের জায়গা থেকে নিম্নলিখিত এলাকায় নিম্নলিখিত তারিখে সমবেত হবে:—

বাহিনী	স্থান	তারিখ
(ক) ৫৪৫ বাহিনী	সিকতিন (Seiktin)	২৯।৩০ মার্চ্চের রাত্রি
(খ) (১) নং খাপ্পো বাহিনী	ওয়িন (Oyin) (পাইনবিনের ২ মাইল দক্ষিণ-পূবে)	”
	তাউসঙ (পাইনবিনের ৫ মাইল দক্ষিণ)	”
(২) ৪৫০নং বাহিনী ও হোসো-কাওয়া বাহিনী	রাস্তার মোড় (পাইনবিনের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম)	”

৩০শে মার্চ্চ তারিখের রাত্রে ৪৫০নং বাহিনী ও খাপ্পো বাহিনী তা'দের কেন্দ্র থেকে অগ্রসর হ'য়ে রাত্রি ১টার সময় পাইনবিন আক্রমণ ক'রে শত্রুদলকে ধ্বংস ক'রবে। ৫৪৫নং বাহিনী থেকে একটি শক্তিশালী দল এগিয়ে গিয়ে পূবদিক থেকে (১) পাইনবিন-তাডা, (২) পাইনবিন-থাব্যেওয়া ও (৩) পাইনবিন-কামা সড়ক ছিন্ন ক'রে দেবে।

এই দলগুলি ৩০শে মার্চ্চ রাত্রি ১১টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্তুত থাকবে। খাপ্পো ও ৪৫০নং বাহিনী পাইনবিন আক্রমণ ক'রলে ৫৪৫নং বাহিনী এগিয়ে পাইনবিন থেকে পলায়ন-পর শত্রুদলকে বিধ্বস্ত ক'রবে এবং পূব বা উত্তর-পূব এলাকা থেকে নতুন শত্রুবাহিনী আস্‌তে দেখ্‌লে তা'দের বাধা দেবে।

৫৩১নং বাহিনী : যুদ্ধাদেশ নং ২ :—পূর্ব্বোক্ত সড়কগুলি.

দিয়ে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক আস্‌তে না পারে এ জন্য এরা যথেষ্ট পরিমাণে মাইন ব্যবহার ক'রবে। ওয়িনের (Oyin) দিক থেকে ভারী কামান-বাহিনী আমাদের আক্রমণ-কার্য্যে সহায়তা ক'রবে।

আক্রমণের পরের কাজ: আক্রমণ-কার্য্য শেষ হ'লে ৫৩১নং-এর সমস্ত সৈন্যদলগুলিই তা'দের নিজের নিজের জায়গায় ভোর হওয়ার আগেই ফিরে আসবে। দিনের বেলায় এরা দূরে দূরে ছড়িয়ে থেকে শত্রুর বিমান ও দূরপাল্লা কামানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক'রবে।

৪। শাসন পরিচালনা শৃঙ্খলা: বাহিনীগুলির সরবরাহের পথ হ'বে এইরূপ:

(ক) ৪৫০নং বাহিনী—পোপাওয়া-দোয়াঙ্গি ক্রস্ রোড (পাইনবিনের দক্ষিণ-পশ্চিম)।

(খ) ৫৪৫নং বাহিনী—পোওয়া-সিকতিন (Poaywa-Seiktin)।

গরুর গাড়ী যতগুলি দরকার হয়—সৈন্যদল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে সামরিক প্রয়োজনের দাবীতে আদায় ক'রে নেবে, আক্রমণ শেষ হ'য়ে গেলে ওগুলি মালিকদের ফেরত দেবে।

রসদ, জল ও অন্যান্য জিনিসের সরবরাহ:—বাহিনীগুলি তা'দের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা পোপাওয়ায় ডেপুটি কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের (D. Q. M. G.) কাছে দাখিল ক'রবে, তিনি সেইগুলি সরবরাহ ক'রবার যথাসাধ্য

চেষ্টা ক'রবেন। যে সব বাহিনী অগ্রণী হ'য়ে যুদ্ধ ক'রছে—তা'দের জন্য অন্ততঃ সাত দিনের শুক্‌নো খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হ'বে।

S. A. A. A.—D. Q. M. G. র কাছে সঞ্চিত ৩০৩" এস্, এ, এ, বল খুব কমই ছিল। প্রত্যেক দলকেই খুব কম সম্ভব গোলা-বারুদ ব্যবহার ক'রবার জন্য অনুরোধ করা হ'য়েছিল।

অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন :—এই মাইনের সংখ্যা আমাদের বড় বেশী ছিল না। যা ছিল সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছিল।

চিকিৎসা : আহত ব্যক্তিদের সবাইকেই পোপাওয়ায় স্থানান্তরিত ক'রতে হবে। যেখানে জল ফুটিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়—সেখানে ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু ব্লিচিং পাউডার পাঠানো হচ্ছিল।

বিভিন্ন দলের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা : ৪৫০নং ও ৫৩১নং দলের মধ্যে হোসোকাওয়া দলের মধ্যস্থতায় বেতার-বার্ত্তা পাঠানো হবে। ৫৪৫নং ও ৫৩১নং দলের মধ্যে বেতার-বার্ত্তা পাঠানোর ব্যবস্থা হ'য়েছিল। ৫৩১নং বাহিনীর যুদ্ধের হেড্ কোয়ার্টার্স ২৯শে মার্চ্চ রাত্রে পোপাওয়া থেকে সিকতিন অঞ্চলে যাত্রা ক'রবে। ৫৩১নং বাহিনীর প্রধান হেড্ কোয়ার্টার্স মেজর রামস্বরূপের নেতৃত্বাধীনে পোপাওয়াতেই অবস্থান ক'রবে।

বিভিন্ন দলের প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ : ১। পাইনবিনের

উপর আক্রমণটি আকস্মিক গেরিলা আক্রমণের মত হবে। শত্রুদের যতটা সম্ভব ক্ষতিসাধন ক'রে দলগুলি ওখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রবে। সেনানায়কেরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সৈন্যদল পরিচালনা ক'রবেন—হতাহতের সংখ্যা যত কম হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে তাঁদের। ২। সম্ভব হ'লে শত্রুদের জীবিতাবস্থায় বন্দী ক'রে আন্‌তে হবে। ৩। শত্রুশিবিরে কাগজ-পত্র, দলিল, ব্যাজ ইত্যাদি যা পাওয়া যায় সঙ্গে নিয়ে আস্‌তে হবে।

বিজ্ঞপ্তি :—

৪৫০নং বাহিনী	১	
৫৪৫ ,, ,,	১	শাহ নওয়াজ খান, কর্ণেল
৫৩১ ,, ,,	১	কম্যাণ্ডার, নং ৫৩১ বাহিনী

অনেকগুলি অনুসন্ধানী টহলদারী সৈন্যদল পাঠান হ'য়েছিল। তা'দের কোন কোন দল শত্রুপক্ষের পিছনে গিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে এনেছিল।

২৮শে মার্চ্চ তারিখে ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্স যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়।

২৯শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় ২নং ব্রিগেডের সৈন্যদলগুলি আক্রমণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়। কর্ণেল পি, কে, সাইগল রাত্রি ৯টার সময় ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টার্সের অনুসন্ধানী দল ও ১নং ব্যাটেলিয়ান সঙ্গে নিয়ে পোপা থেকে যাত্রা করেন। এই দলের আগে আগে একজন মোটর সাইকেলে যায়—পিছনে একখানা জিপ ও

একখানা মোটর ট্রাক্ চ'ড়ে অন্যান্য সকলে যায়। টহলদার সৈন্যদের মুখে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল সিকতিন তখন শত্রু শূন্য—তাই কর্ণেল সাইগল তাঁ'র দলবল নিয়ে সিকতিন এবং ওয়েল্যাওয়াঙে (Wellaung) যাওয়াই সাব্যস্ত ক'রলেন।

সেই রাত্রে আমাদের সৈন্যদল যখন মার্চ্চ ক'রে তা'দের সমাবেশ-এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আমি তখন এক-খানা জিপ গাড়ীতে চ'ড়ে ঐ রাস্তাতেই ঘুরাফিরা কর্ছিলাম। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় যখন আমি লেগিতে (Legy) এলাম, তখন আমার সামনে কয়েক শ'গজ দূরে মেশিনগান ও রাইফেলের আওয়াজ হ'চ্ছে শুন্তে পেলাম। একটু পরেই একজন অফিসার আমার কাছে দৌড়ে এসে ব'ল্লেন—কর্ণেল সাইগলের গোটা দলকে শত্রুরা গুপ্তস্থানে থেকে আক্রমণ ক'রেছে। আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের পাতা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে প'ড়েছে বল্লেই হয়। শত্রুদল ওদের উপর ত্রিশ গজ দূর থেকে গুলি ছুঁড়েছিল—কি ক'রে যে ওদের একজনও রক্ষা পেল, সেই আশ্চর্য্য। কর্ণেল সাইগল যে গাড়ীতে আস্ছিলেন তাতে ১৪টা গুলির ছেঁদা। এই সময়ের মধ্যে ২নং কোম্পানীর পদাতিক সৈন্যদলও মার্চ্চ ক'রে এসে গেল—আমি এগিয়ে গিয়ে কর্ণেল সাইগলের খোঁজ করা স্থির ক'রলাম। যে অফিসারটি কর্ণেল সাইগলের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি নিজেও জান্তেন না—কর্ণেল সাইগল এবং তাঁর দল মৃত না বন্দী। একটু পরেই কর্ণেল সাইগল-

নিজে এসে গেলেন—তার মুখে সমস্ত অবস্থা শুন্‌লাম। আমরা ঠিক ক'রলাম—আমরা এগিয়ে গিয়ে আমাদের জিপগাড়ী ও ট্রাক্‌টা ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌ব।

পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আমাদের গাড়ী দু'টি আমরা ফিরিয়ে আন্‌লাম বটে, কিন্তু ওর ভিতরকার কাগজপত্র, দলিল, চিহ্নিত মানচিত্র, যুদ্ধাদেশ প্রভৃতি সব কিছুই শত্রুরা ও থেকে সরিয়ে ফেলেছে।

এই সব ঘটনায় বড়ই দেরী হ'য়ে গেছে—আর এগিয়ে যাবার সময় নেই,—সুতরাং লেগি-তে(Legy) প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে সেখানে আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রে অবস্থানই সাব্যস্ত করা গেল।

কাব্যুর যুদ্ধ

পাইনবিন আক্রমণের জন্য কাব্যুতে আমাদের একদল সৈন্য রাখা হ'য়েছিল। ৩০শে মার্চ্চ তারিখে শত্রুপক্ষের পদাতিক ও ট্যাঙ্ক-বাহিনী তা'দের ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। আমাদের এই দলের নেতা ছিলেন—ক্যাপ্টেন বাগড়ি (Bagri)। তিনি ৩নং ব্যাটেলিয়ানের কম্যাণ্ডার ছিলেন। পাইনবিন আক্রমণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রবার জন্য তিনি নিজেই এই সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের সৈন্যদলের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল একদল জাপানী সৈন্য। বেলা প্রায় দশটার কাছাকাছি—দেখা গেল শত্রুপক্ষের প্রায় একহাজার পদাতিক ও কতকগুলি

ট্যাঙ্ক পাইনবিনের দিক থেকে কাব্যুর দিকে আস্‌ছে। আমাদের দলটি ছিল একটা খোলা মাঠের ভিতরে পরিখা কেটে—মাথার উপরে তা'দের কোন ছাউনি নেই—আশে পাশে কোন আবরণ নেই—আত্মরক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে আমরা শুধু কয়েকটা ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইন আমাদের অবস্থানের চারিধারে চক্রাকারে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। এ মাইনগুলি পাশের একটা জাপানী বাহিনী কাছ থেকে ধার করা। আমাদের দলের কারোই অবশ্য বুঝ্‌তে বাকী ছিল না যে এমনি ক'রে কখনও শত্রুদলকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এ ছাড়া শত্রু বিমান-বাহিনীও বিশেষ কর্ম্মতৎপর হ'য়ে উঠেছিল এবং সকাল থেকেই আমাদের সৈন্যদলের উপর মেশিনগান চালাচ্ছিল আর বোমা ফেল্‌ছিল। এরূপ বিপদের মুখেও আমাদের সৈন্যদল তা'দের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন্ ক'রতে দৃঢ়-সঙ্কল্প ছিল।

শত্রুদল প্রথমে আক্রমণ ক'রল জাপানী সৈন্যদলকে। এই আক্রমণ চালাতে গিয়ে ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইনে (Anti-tank mine) লেগে তা'দের একটা ট্যাঙ্ক অকেজো হ'য়ে গেল। এই দেখে জাপানী সৈন্যরা অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এর পর শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কবাহিনী আমাদের দলের দিকে ধাওয়া ক'রল। পিছনে তা'দের পদাতিক সৈন্যদল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। আমাদের দলের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওদের আর একটা ট্যাঙ্ক মাইনে ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে পড়্‌ল। এই দেখে আমাদের সৈন্যদল উল্লসিত হ'য়ে

উঠ্‌ল—শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কবাহিনীর অগ্রগতিও বন্ধ হ'ল। কিন্তু পদাতিক দল তখনও এগিয়ে আস্‌ছে। পদাতিক সৈন্যদের সবাই ইংরেজ। ওদের এত কাছে আস্‌তে দেখে আমাদের সৈন্যরা "জয় হিন্দ" ও "নেতাজী কি জয়" ধ্বনি ক'রতে ক'রতে ওদের দিকে প্রায় ২০০ গজ এগিয়ে গেল। জাপানী সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের আক্রমণ ক'রতে দেখে প্রায় ৬০০ গজ এগিয়ে গেল।

জাপানী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০ অথচ শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। শত্রুদল জাপানীদের উপর ভীষণভাবে 'মেশিনগান' ও বন্দুকের গুলি চালাতে লাগ্‌ল। জাপানীদের অনেকে নিহত হ'ল, অবশিষ্ট সৈন্যদের ঘিরে ফেল্‌বার জন্য শত্রুদল এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। জাপানী দলের শতকরা প্রায় ৬০ জন অফিসার ও সৈন্য এই যুদ্ধে মারা যায়—যারা বেঁচে ছিল তা'রা শত্রুদলের অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে আহত ও নিহত সঙ্গীদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলেই পালিয়ে নিজেদের পরিখায় এসে আশ্রয় নিলে।

ক্যাপ্টেন বাগড়ি সমস্ত ব্যাপার দেখে শত্রুদের উপর ভীষণভাবে গুলি চালাতে লাগ্‌লেন—ফলে অনেক শত্রু নিহত হ'ল। এর পর তিনি এক পাশ থেকে ওদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ওদের হটিয়ে দিলেন, তারপর জাপানী নিহত ও আহত সৈন্যদের নিয়ে তা'দের স্বস্থানে পৌঁছে দিলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যাকালে জাপানী সৈন্যদলের নেতা স্বয়ং আমার কাছে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ধন্যবাদ

জানিয়ে গেলেন—কারণ সেদিন তারাই জাপানী সৈন্যদলকে রক্ষা ক'রেছে—তা' ছাড়া আহত ও নিহতদের তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে লাইনে পৌঁছে দিয়েছে।

ঐদিন রাত্রেই আমাদের পাইনবিন আক্রমণের কথা ছিল কিন্তু আমাদের যুদ্ধাদেশপত্র শত্রুদের হাতে পড়ায়, ঐ পরিকল্পনা স্থগিত রাখ্‌তে হ'ল। তা' ছাড়া কথা ছিল, আমাদের সৈন্যদল পাইনবিন আক্রমণ ক'রবার সময় একটা জাপানী গোলন্দাজ বাহিনী ওয়িনে অগ্রসর হয়ে গোলা ছুঁড়ে তা'দের সাহায্য ক'রবে কিন্তু ৩০শে মার্চ্চ তারিখে শত্রু-বিমান-বাহিনী এই বাহিনীকে আক্রমণ ক'রে তা'দের সব কিছু সমরোপকরণ নষ্ট ক'রে দেয়।

পরদিন ক্যাপ্টেন বাগড়ির ওপর হুকুম হ'ল—তাঁ'কে গেদেক্কনে (Gwedekkon) ফিরে যেতে হবে—লেগিতে (Legy) ১নং ব্যাটেলিয়ান আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রে অবস্থান ক'রছে—তিনি ঐ ব্যূহের বাম পার্শ্ব রক্ষা ক'রবেন।

৩০শে মার্চ্চ রাত্রে আমাদের পাইনবিন আক্রমণ ক'রবার কথা ছিল। তদনুসারে ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্ট (নেহরু ব্রিগেড) ও জাপানী ব্রিগেড 'খান জো বুতাই' (Khan Jo Butai) তা'দের নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌ল। ওয়িন (Oyin) থেকে গোলন্দাজ সৈন্যরা গোলা ছুঁড়্‌তে আরম্ভ ক'রলে তবে এরা এগিয়ে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যাকালে শত্রু-বিমান-বাহিনী বোমা ফেলে এদের কামানগুলি সব নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। সুতরাং সে রাত্রে

পাইনবিন আক্রমণ করা আর হ'ল না—পরদিন আমাদের সৈন্যদলগুলি নিজেদের সমাবেশ-কেন্দ্রে ফিরে এল। এখানে এসে তা'রা পাইনবিন আক্রমণ ক'রবার পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে আদেশ পেল।

দুই পক্ষেই রীতিমত টহল দেওয়া চলেছিল,—আমাদের টহলদার সৈন্যেরা লেগি (Legy) থেকে অনেক বার সিকতিনে (Seiktin) গিয়ে শত্রু সৈন্যের শক্তি ও অবস্থান সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর আনতে লাগল। ২রা এপ্রিল বেলা প্রায় একটার সময় শত্রুদল লেগিতে আমাদের সৈন্যদের উপর মেশিনগান ও কামান থেকে গুলি গোলা ছুঁড়্তে লাগ্ল। এতে আমাদের পক্ষের ছয়টি লোক মারা যায়। পরিখা খুঁড়্বার যন্ত্রপাতি যথেষ্ট না থাকায় লেগিতে অতি অল্প জায়গায়ই পরিখা খোঁড়া হ'য়েছিল, সুতরাং শত্রু-বিমান মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়ে ও বোমা ফেলে আমাদের সৈন্যদের বিশেষ বিপন্ন ক'রে তুল্ল। শত্রুপক্ষের ১৪টি জঙ্গী বিমান দু' ঘণ্টা ধ'রে অবিরত আমাদের সৈন্যদের ওপর বোমা ফেলেছে আর মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়েছে। তা' ছাড়া ওদের গোলন্দাজ সৈন্যরাও সারাদিন অবিরত আমাদের সৈন্যদের ওপর গোলা ছুঁড়েছে। ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে—কি ক'রে এত লোক আমাদের তবু বেঁচে রইল। ওদের এই ভীষণ আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেবার মত অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কিছুই ছিল না, থাক্বার মধ্যে ছিল তিনটি তিন ইঞ্চি ব্যাসের কামান—এ দিয়ে ওদের কোন কিছু করাই সম্ভব নয়।

আমাদের সৈন্যরা এ সব সত্বেও বিশেষ ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে সব কিছু সহ্য ক'রতে লাগ্‌ল। কয়েকটি দুর্ব্বলচেতা লোক মাত্র শত্রুপক্ষের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের সৈন্যদের মন এতে অনেকটা দ'মে গেল বটে—কিন্তু এখন যখন ভাবি কি বাধা-বিপত্তির মধ্যে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আমাদের সৈন্যদের ল'ড়তে হ'য়েছিল তখন যারা শত্রুপক্ষে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিল তা'দের আর নিন্দা ক'রতে পারি না।

এই সময় ব্রহ্মযুদ্ধে আমাদের ও জাপানীদের অবস্থা অতি সঙ্কটময় হ'য়ে ওঠে।

প্রথমতঃ:—শান রাজ্যে শত্রুদল কালাও (Kalaw) অধিকার ক'রে টাঙ্গ্যি ও মোছি খনির (Tangyi and Mochi mines) দিকে এগিয়ে আস্‌ছে—উদ্দেশ্য ওরা তোয়াঙ্গুর (Toungoo) জাপানী প্রধান আত্মরক্ষা-ব্যূহকে ঘেরাও ক'রবে।

দ্বিতীয়তঃ :—মধ্য রণাঙ্গনে শত্রুদল মিকটিলা অধিকার ক'রে নিয়েছে এবং প্যাবউই-তে (Pyabwe) যুদ্ধ চ'লেছে।

তৃতীয়তঃ :—আরও পশ্চিমে মিকটিলা ক্যায়ুকপাডাং (চাউপাডাঁও) সড়কের উপর শত্রুদল প্রায় পনের মাইল এগিয়ে এসেছে এবং শক্তিশালী সাজোয়া, পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনী দক্ষিণে এগিয়ে নাতমাউক ও তাউনডুইঙ্গ্যি অধিকার ক'রে নিয়েছে।

চতুর্থতঃ :—পোপা রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের একটা শক্তিশালী ডিভিশান তোয়াঙথায় (Taungtha) এসে তোয়াঙথা-পোপা সড়ক ধ'রে এগিয়ে আস্‌ছে।

পঞ্চমতঃ :—শত্রুদল ইরাবতীর ন্যান্‌গু ও পাকোকো পারের ঘাঁটি অনেক বাড়িয়ে ফেলেছে।

অবশেষে বলা যায়—আরাকান রণাঙ্গনে শত্রুদল তাউঙ্গুপ অধিকার ক'রে প্রোমের দিকে দ্রুত এগিয়ে আস্‌ছে।

জাপানীরা ব্রহ্মদেশীয় লোক নিয়ে যে সৈন্যদল গ'ড়ে তুলেছিল ঐ দল প্রোমের দিকে শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ ক'রতে জেনারেল আউঙস্যাঙের নেতৃত্বাধীনে মার্চ্চের মাঝামাঝি রেঙ্গুন থেকে যাত্রা করে। প্রোমে পৌঁছে প্রায় ৭০০০ সৈন্যে গঠিত এই দলটি ইরাবতী পার হ'য়ে পশ্চিম তীরে থায়েটমেয়ো এলাকায় গিয়ে হাজির হয়। এই এলাকায় বেশী জাপানী সৈন্য না থাকায় এরা ব্রহ্ম-সরকারের অধীনতা অস্বীকার ক'রে জাপানীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরা ছোট ছোট গেরিলা দলে বিভক্ত হ'য়ে রেঙ্গুন থেকে প্রোম ও তেয়াঙ্গুর পথে জাপানী সৈন্যের চলাচল বন্ধ ক'রে দিতে চেষ্টা করে। এমনি ক'রে তারা যুদ্ধরত জাপানী সৈন্যদের রসদ ও গোলাগুলি পাঠানো এক রকম অসম্ভব ক'রে তোলে। সুতরাং জাপানীদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। এই সব বর্ম্মী গেরিলারা অসামরিক লোকজনের মত জামা-কাপড় প'রে গ্রামের ভিতরেই বাস ক'রত। গ্রামের লোকেরাই তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রত।

এমনি ক'রে সাধারণ লোকের বেশে থেকে তারা কেবল ছোট ছোট জাপানী সৈন্যদল খুঁজে বেড়াত এবং সুযোগ

পেলেই তা'দের একেবারে শেষ ক'রত। আমার মনে হয়—ব্রহ্মে জাপানীরা হঠাৎ যে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেল্‌লে এর মূলে ব্রিটিশ সৈন্যের পরাক্রমের চেয়ে বর্ম্মীসৈন্যদলের জাপানীপক্ষত্যাগই কাজ ক'রেছে বেশী। আর বর্ম্মী সৈন্যরা যে জাপানীদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার ক'রেছে এর জন্যও তা'দের দোষ দেওয়া যায় না—কারণ জাপানীরা ব্রহ্মদেশ অধিকার ক'রবার পর থেকে তা'দেরকে নিষ্ঠুরের মত শোষণ ক'রেছে। জাপানীরা ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা ক'রে বর্ম্মীসেনা গঠন ক'রেছিল একথা ঠিক, কিন্তু এ সবকিছুই লোক দেখানো—ভুয়ো। ব্রহ্মসরকারের সর্ব্বাধিনায়ক ডাঃ বা ম (Baw Maw) এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গ অত্যন্ত স্বার্থপর ও দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁরা জাপানীর শোষণ নিবারণ ক'রবার কোন চেষ্টা করেন নি, আর এদিকে বর্ম্মীসৈন্যদল জাপানী অফিসারদের শাসনাধীনে থাকায় স্বাধীনভাবে কোন কাজ ক'রবার সুযোগ পায় নি। ১৯৪২ সালে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ থেকে যখন ব্রিটিশ বিতাড়নের চেষ্টা করে তখন বর্ম্মীরাও তা'দের হ'য়ে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়ে—এরপর তিন বৎসর জাপানী রাজত্বে বাস ক'রে তারা দেখ্‌লে—এর চেয়ে ব্রিটিশ রাজত্বে তারা অনেক ভাল ছিল। দেশে নিদারুণ অন্নাভাব—কারণ চা'ল ও গরু-বাছুর সব জাপানীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে। বস্ত্রাভাবও কম নয়—কারণ দেশের অধিকাংশ কাপড়চোপড় আস্‌ত ভারতবর্ষ ও জাপান থেকে। টাকা পয়সারও তখন কিছুমাত্র মূল্য ছিল না—কারণ

একটা ছোট মুরগীর দাম তখন ষাট টাকা—একটা ডিমের দাম তিন টাকা। দেশের লোকের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি কারো ছিল না—না জাপানীদের, না জাপানীদের হাতের ক্রীড়া-পুত্তলী ব্রহ্মসরকারের। ছেলেদের লেখাপড়া এক রকম বন্ধ। এই সব নানা কারণে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা জাপানী রাজত্বে তেমন সুখে-শান্তিতে বাস ক'রতে পারে নি, বরং তারা এদের উপর বিরক্ত হ'য়েই উঠেছিল। দেশের সুন্দর সুন্দর নগর ও সহরগুলি ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমান-বাহিনীর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাচ্ছিল, সুখশান্তি বিনষ্ট হ'য়ে যাচ্ছিল, সুতরাং ব্রহ্মের লোকেরা মনে মনে ভাব্‌ছিল—এ যুদ্ধ যত শীঘ্র শেষ হ'য়ে যায় সেই ভাল। যে বর্ম্মীরা জাপানীদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা ক'রে সর্ব্বান্তঃকরণে একদিন তা'দের সাহায্য করেছে, তা'রাই এখন ব্রিটিশ সেনাকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ব্রহ্মদেশের এই অবস্থায় সেখানকার তরুণ (৩২ বৎসর বয়স্ক) বিপ্লবী-নেতা জেনারেল আউঙ স্যাঙ জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ব্রহ্মে জাপানী প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হন। কয়েকজন বিশ্বাসী অফিসার এবং ব্রহ্মের অধিবাসীদের উপর প্রতিপত্তি আছে এমন কয়েকজন বৌদ্ধ পুরোহিতদের নিয়ে তিনি একটা গোপন সমিতি ক'রে ঠিক ক'রলেন যে, ব্রহ্মে জাপানী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। মার্চ্চের মাঝামাঝি বর্ম্মী-সেনাদলে নেতৃত্ব নিয়ে যখন তিনি রেঙ্গুন থেকে যাত্রা

করেন তখন বর্ম্মী ও জাপানীরা সমভাবে তাঁ'কে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এসেছিল। বর্ম্মী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত জাপানী অফিসার ও অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। থায়েটমেয়োতে (Thayetmayo) উপস্থিত হ'য়ে আউঙ স্যাঙের দল প্রথমেই জাপানী অফিসারদের শেষ ক'রলে,—তারপর ছোট ছোট গেরিলা দলে বিভক্ত হ'য়ে জাপানীদের রসদ ও সমরোপকরণ সরবরাহ ক'রবার লরী ও ট্রেনগুলি ধ্বংস ক'রতে লাগ্‌ল।

তা'দের সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে স্থানীয় তরুণদল তা'দের সঙ্গে যোগ দিল এবং সুযোগ পেলেই বর্ম্মী তলোয়ার 'দা' দিয়ে জাপানীদের আক্রমণ ক'রে তা'দের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিতে লাগ্‌ল।

লেগির যুদ্ধ

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২নং ডিভিশানকে যুদ্ধ ক'রে পোপা-ক্যায়ুকপাডাং অঞ্চলে শত্রুর অগ্রগতি রোধ ক'রতে হ'য়েছিল। শত্রুপক্ষ তা'দের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বাধা অপসারণের চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌ল এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশেরা আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর তিন দিক থেকে আক্রমণ করা সাব্যস্ত করে। আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল এইরূপ :—

(ক) ২নং ব্রিটিশ ডিভিশান টোয়াঙথা থেকে সুরু ক'রে ওয়েলায়াঙ-সিকতিন-পোপার পথে আক্রমণ চালাবে।

(খ) ৭নং ব্রিটিশ ডিভিশান ন্যান্‌গু-ক্যায়ুকপাডাং থেকে আক্রমণ চালাবে।

(গ) ৫নং ব্রিটিশ ডিভিশান মিকটিলা-ক্যায়ুকপাডাং থেকে আক্রমণ চালাবে।

পোপাতে ২নং ব্রিটিশ ডিভিশানের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রবার জন্যই লেগিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ২নং পদাতিক সৈন্যদল রাখা হয়।

সিকতিন-ওয়েলোয়াঙর কাছাকাছি একটি ঘাঁটি থেকে ১লা এপ্রিল তারিখে শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ আসে :—

(১) বেলা সাড়ে এগারটার সময় শত্রুপক্ষের প্রায় পঞ্চাশজন লোক দশটা ট্যাঙ্ক নিয়ে লেগি থেকে ওয়েলোয়াঙের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

(২) বিকেল সাড়ে তিনটের সময় শত্রুপক্ষের আঠারখানা লরী, দু'টো ট্যাঙ্ক, একটা সাজোয়া গাড়ী, দু'খানা মোটর সাইকেল ও দু'টো ভারী কামান ওয়েলোয়াঙ থেকে লেগির দিকে এগিয়ে আস্‌তে দেখা গেছে। এই লরীগুলিতে মালপত্র বোঝাই ছিল—তা' ছাড়া সৈন্যরাও ছিল।

(৩) বিকেল চারটার সময় লেগির দিকে আরও ট্যাঙ্ক আস্‌তে দেখা গেছে। শত্রুপক্ষের এই ট্যাঙ্কগুলির সবই মাঝারি ও ভারী শারমন (Sherman Tank) ও চার্চ্চহিল ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্কবাহিনী সিকতিন পর্য্যন্ত এসে সেইখানেই অবস্থান করে।

সাব অফিসার আবদুল্লা খাঁর অধীনে রণদক্ষ আমাদের একদল টহলদার সৈন্য সিকতিন অঞ্চলে পাঠানো হয়। এই দল এগিয়ে গেলে সিকতিন থেকে শত্রুপ্রেরিত টহলদার সৈন্যদের সঙ্গে এদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে বেলা ১০টা ৪০ মিনিটের সময় এরা ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টার্সে ফিরে আসে। ১লা এপ্রিলের রাত্রে আমাদের রণাঙ্গণে শত্রুসৈন্যের কোন কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় না।

২রা এপ্রিল বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় প্রায় দু'হাজার শত্রুসৈন্য সিকতিনের দক্ষিণে এসে পরিখা খনন ক'রতে আরম্ভ করে এবং বেলা ১টা ১০ মিনিটের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শত্রু-বিমান-বাহিনী লেগির উপর ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করে ও মেশিনগানের গুলি চালায়। সমগ্র গ্রামব্যাপী অগ্নিকাণ্ড সুরু হয়—ফলে গরুর গাড়ী ও লরীতে ক'রে আমরা যে রসদ ও জল এনেছিলাম, তা' সবই নষ্ট হ'য়ে যায়। বিমান আক্রমণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের গোলন্দাজবাহিনী আমাদের সৈন্যদের উপর ভীষণভাবে কামানের গোলা ছুঁড়্তে আরম্ভ করে। রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত এই অগ্নিবর্ষণ সমানে চল্তে থাকে।

বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত শত্রুসৈন্য টহল দিতে থাকে। ৫টার সময় ৫টা লরী ভর্ত্তি শত্রুসৈন্য ট্যাঙ্ক সঙ্গে নিয়ে সিকতিন থেকে লেগির দিকে অগ্রসর হয়। কাছাকাছি এসে লরী থেকে নেমে ওরা আমাদের দিকে আরও অগ্রসর

হ'তে থাকে। আমাদের মেশিনগানের আয়ত্তের ভিতর এসে গেলেই আমরা ওদের উপর গুলি চালাতে সুরু করি। কতকগুলি শত্রুসৈন্য ভূ-পতিত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে দলের অবশিষ্ট লোক নালার ভিতর অদৃশ্য হয়। ওদের ট্যাঙ্ক ও লরীগুলিও ঘুরে সিকতিনের দিকে ফিরে যায়। এই দেখে আমাদের সৈন্যদের মনের জোর বেড়ে যায় এবং দিনের বাকী সময় তা'রা বেশ স্ফূর্ত্তিতেই কাটায়। সেদিন শত্রু-পক্ষের আর কোন কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায় নি। ওদের রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল—ওরা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে সেদিন শুধু খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছে এবং পরদিন ওরা আমাদের ভীষণভাবে আক্রমণ ক'র্‌বে। এইজন্য পোপায় অবস্থিত আমাদের ৩নং ব্যাটেলিয়ান থেকে এক কোম্পানী সৈন্য এনে লেগিতে ১নং ব্যাটেলিয়ানের ডান পাশে রেখে ওর বল বৃদ্ধি করা হ'ল। এই কোম্পানীর নেতা ছিলেন দ্বিতীয় লেফট্, কানওয়াল সিং। এঁর সামরিক শিক্ষা সিঙ্গাপুর অফিসার্স ট্রেণিং স্কুলে। সিঙ্গাপুরে যখন ব্রিটিশদের পতন হয়, তখন তিনি ওদেরই একটি দলের নায়ক ছিলেন।

আমাদের কয়েকজন অফিসার ও সৈন্য আমাদের পক্ষ ত্যাগ ক'রে যাওয়ায় ১৯৪৫ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে আমাদের সৈন্যদের ভিতরে একটু নৈরাশ্য ও ভীতির সঞ্চার হয়। সবাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল—শত্রুরা আমাদের অবস্থানের সব কিছু জেনে ফেলেছে এবং ওদের যা জনবল ও অস্ত্রবল

তা'তে আমাদের আর রক্ষা নাই। এই সময় কর্ণেল সাইগল লেগিতে ছিলেন। তিনি সবার মনের অবস্থা দেখে যুদ্ধ পরিচলনার ভার নিজে গ্রহণ ক'রলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় শত্রুপক্ষ ১০০০ পদাতিক সৈন্যের একটি দল ১৩টা মাঝারি ও ১৩টা হাল্‌কা ট্যাঙ্ক, ৬০টা লরী, ১২টা কামান নিয়ে আমাদের 'সি' কোম্পানীর সাম্‌নে এসে উপস্থিত হয়। 'সি' কোম্পানীর অবস্থান ছিল বাঁ দিকে।

বেলা বারোটার সময় শত্রুপক্ষের গোলন্দাজ সৈন্য আমাদের অবস্থানের উপর ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ স্থুরু করে।

বেলা একটার সময় দেখা গেল শত্রুপক্ষের একটা বাহিনী ১১টা মাঝারী ট্যাঙ্ক, ৩০টা সাজোয়া গাড়ী ও ৬০ খানা লরী নিয়ে লেগির দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। আমাদের সাম্‌নে প্রায় ১০০০ গজ দূরে এরা ক্রমশঃ ছড়িয়ে প'ড়তে লাগ্‌ল।

বেলা দেড়টার সময় শত্রু-সৈন্যের একটি ছোট দল আমাদের অবস্থানের ডানদিক ঘুরে আমাদের 'বি'-এশিলন (Echelon) আক্রমণ করে। এই এশিলনের লোকেরা তখন রান্না বা রসদ ও জল আনার কাজে ব্যস্ত ছিল—স্থুতরাং এইরূপে শত্রুদল কর্তৃক আক্রান্ত হ'য়ে তারা হতভম্ব হ'য়ে প'ড়ল। আমাদের পক্ষের লোক মারা গেল অনেক বেশী। শত্রুদল এই এলাকা অধিকার ক'রে নিল কিন্তু এই যুদ্ধের খবর হেড্‌কোয়ার্টার্সে সন্ধ্যা ৭টার আগে পৌঁছয় নি।

বেলা ১-৪৫ এর সময় প্রথমে ওরা আমাদের অবস্থানের ডান দিকে ভীষণভাবে কামানের গোলা ছুঁড়তে থাকে, এর পর ওদের প্রায় এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য ২য় লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং-এর অধীনস্থ সৈন্যদলের উপর আক্রমণ চালায়। শত্রুদল এমনি ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে যায়—সুতরাং যুদ্ধটিও হয় অতি ভীষণ। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের অনেক লোক মারা যাওয়ার পর তারা পশ্চাদপসরণ করে।

বেলা দু'টোর সময় প্রায় এক প্লেটুন শত্রু-সৈন্য আমাদের অবস্থানের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের পিছন থেকে গুলি চালাতে সুরু করে। আমাদের দল এর যথোচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ায় শত্রুদল স্থানচ্যুত হ'য়ে পড়ে। এই সময়কার যুদ্ধে শত্রুদল ডান, বাঁ, সুমুখ, পিছন—সবদিক থেকে আমাদের উপর ছোট বড় কামানোর গোলা ছুঁড়তে থাকে।

বেলা চারটার সময় শত্রু-গোলন্দাজবাহিনী আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে দ্রুত কামানের গোলা ছুঁড়তে থাকে : প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে ওরা প্রায় ১৫০টা গোলা ছোঁড়ে। এর পরেই লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং-এর সৈন্যদলেব ওপর আর এক ব্যাটেলিয়ান শত্রু-সৈন্য আক্রমণ চালায়। লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং-এর সৈন্যরা পুনরায় বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান রক্ষা করে এবং শত্রুদের অনেককে নিহত করার পর তা'দের বিতাড়িত করে।

. এই যুদ্ধের সময় এই কোম্পানীর কম্যাণ্ডার লেফ্‌ট,

কানওয়াল সিং এবং একটি প্লেটুন কম্যাণ্ডার, হাবিলদার আব্দুল মান্নান—দুইজন দুটো পাহাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের দলের সৈন্যদের গুলিচালনার নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন। শত্রুদল ছোট ছোট কামান থেকে তাঁ'দের দু'জনকেই লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়্ছিল—তবুও তাঁ'রা নিজেদের জায়গা থেকে এক পা নড়েন নি। এই দুই অফিসারের সাহসিকতা গুনেই বারবার শত্রু আক্রমণ প্রতিহত হ'য়েছে।

শত্রুদলের রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল—ওরা যেন আমাদের ডা'ন পাশটা ভেদ ক'রতে চায়। ব্যাপার বুঝে বাঁ পাশ থেকে আমাদের 'সি' কোম্পানীকে সরিয়ে এনে লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং-এর দলের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করা হ'ল।

সন্ধ্যা ৭টার সময় খবর পাওয়া গেল শত্রুরা আমাদের 'বি' এশিলন আক্রমণ ক'রে তা'দের এলাকা অধিকার ক'রে তা'দের ওখান থেকে বিতাড়িত ক'রেছে। রাত্রি ৯টার সময় লেফ্‌ট্, গঙ্গা সিং 'সি' কোম্পানী নিয়ে পাল্টা আক্রমণ সুরু করেন, তার ফলে শত্রুদের অনেক ক্ষতি হয় এবং তা'রা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়ে যায়।

সাড়ে সাতটার সময় আমাদের সেনা-সন্নিবেশের ডা'ন দিকে শত্রুদল আবার ভীষণভাবে কামানের গোলা ছুঁড়্‌তে থাকে এবং লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং-এর কোম্পানী আবার আক্রান্ত হয় কিন্তু এই বীর বাহিনী শত্রু-আক্রমণ আবার প্রতিহত করে। এই সময় প্রায় দুই কোম্পানী শত্রুসৈন্য ট্যাঙ্ক নিয়ে আমাদের বাঁ পাশে 'বি' কোম্পানীর দিকে এগুতে

থাকে কিন্তু আমাদের দলের গুলিবর্ষণের ফলে এঁরা শেষে হ'টে যায়।

এই সময় কর্ণেল সাইগল তাঁ'র দলের জন্য আরও নতুন সৈন্য চেয়ে পাঠান, এই জন্য মেজর বি, এস্, নেগির নেতৃত্বে ৩য় ব্যাটেলিয়ানের আর একটি কোম্পানী তাঁ'র কাছে পাঠানো হয়।

আমাদের অবস্থানের চতুর্দ্দিক শত্রুদল ঘিরে ফেলেছিল, তা' ছাড়া আমাদের সৈন্যরাও নানা অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিল। এই জন্য ৪ঠা এপ্রিল রাত্রি তিনটের সময় কর্ণেল সাইগলের উপর হুকুম এল—তাঁ'কে দলবল নিয়ে পোপায় ফিরে যেতে হবে। এই হুকুম পেয়ে তিনি দলবল নিয়ে সকাল ৭টায় পোপায় ফিরে যান।

ঐ একই দিনে কর্ণেল জি, এস্, ধীলনও তাঁর বাহিনীকে নিয়ে পোপায় ফিরে যাবার আদেশ পান—তিনি নেহরু ব্রিগেডের সঙ্গে ৫ই এপ্রিল তারিখে পোপায় ফিরে যান। এর পর ব্রিগেড কম্যাণ্ডারদের নিয়ে আমি একটা বৈঠক করি—এই বৈঠকে ঠিক হয়—পোপায় রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌বে নেহরু ব্রিগেড—আর কর্ণেল পি, কে, সাইগলের অধীনে এক দল পদাতিক সৈন্য সুসংবদ্ধ হ'য়ে শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে।

৭ই এপ্রিল তারিখে পোপার ছ'মাইল উত্তরে অবস্থিত কাউকটগে (Kyauktaga) আমাদের সৈন্যদল শত্রুদল

কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'বার পর, শত্রুদলকে হটিয়ে দেওয়া হয়। ৮ই এপ্রিল তারিখে আদেশ পেলাম-২নং ডিভিশানকে পোপা থেকে ম্যাগউই-মিন্‌বু-ইয়ানবুয়িঙ্গি (Magwe-Minbu-Yaunbuingyi) এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে। এইখানে ১নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট কর্ণেল, এস্, এম্, হাসানের নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাস থেকে যুদ্ধ ক'রছে।

বাহিনীগুলির নতুন কাজ হ'ল—নিজের এলাকা শত্রু প্যারাসুট বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রা,—তা' ছাড়া যাতায়াতের পথের উপর দৃষ্টি রাখা।

পোপা থেকে পশ্চাদপসরণ

পোপায় যে সব বাহিনীগুলি অবস্থান ক'রছিল ১০ই এপ্রিল তারিখে তা'দের ওখান থেকে পশ্চাদপসরণের হুকুম হয়। অপসরণের পথ ছিল এইরূপ—

ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্স এবং ৪নং রেজিমেণ্টকে ফিরে যেতে হবে ক্যায়ুকপাডাং-ইওয়ালু, ইয়েজন, ওক্‌শিত্তন, ওয়েৎম্যাসুৎ, ম্যাগউই গ্রামের (Kyaukpadang-Ywalu-Yezon-Okshitton-Wetmasut-Magwe) ভিতর দিয়ে গরুর গাড়ীর পথ ধ'রে।

২নং পদাতিক সৈন্যদলকে যেতে হবে ক্যায়ুকপাডাং-ক্যাট্‌কুন-সাগাঁই-ম্যাগিগ্যাঁ-ইওয়ামুন-নাৎমউক-তোয়ানডুইঙ্গের (Kyaukpadang- Kyatkun- Sagain- Magyigaon - Ywamun-Natmauk-Taundwingyi) পথে।

১০ই এপ্রিল তারিখে আমাদের হাসপাতাল এবং ডিভিশানাল হেড্‌কোয়ার্টার্সে ৩৫টি ব্রিটিশ জঙ্গীবিমান এসে ভীষণভাবে আগুনে ও বিস্ফোরক বোমা ফেলে আমাদের বহু আহত ও রুগ্ন লোকের প্রাণনাশ করে। যে সব অফিসার ও সৈন্যরা আমাদের পক্ষ থেকে গিয়ে ব্রিটিশ পক্ষে যোগদান ক'রেছে—ব্রিটিশেরা তা'দের কাছ থেকেই এখানকার সকল সংবাদ সংগ্রহ ক'রেছে। ঐ দিনই ডিভিশানাল হেড্‌-কোয়ার্টার্সের উপর শত্রু গোলন্দাজ ভীষণভাবে কামানের গোলা বর্ষণ করে।

১২ই এপ্রিল তারিখে কাউকটাগে (Kyauktag) আমাদের অগ্রগামী দলকে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী একেবারে চারিদিকে ঘিরে ফেলে। এই দলের কম্যাণ্ডার ছিলেন লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং। এর পূর্ব্বে লেগির যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ব্যাটেলিয়ানের অপর অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও লেফ্‌ট, কানওয়াল সিং-এর দল অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগ্‌ল। ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার এ দলের নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখে—লেফ্‌ট, কানওয়াল সিংকে আত্মসমর্পণ ক'রতে চিঠি লিখে পাঠালেন। কানওয়াল সিং উত্তরে জানালেন, "ভদ্র মহোদয়, কিছু গুলিবারুদ আমার এখনও অবশিষ্ট আছে, সুতরাং আপনার কাছে যাবার প্রয়োজন আমি এখনও বোধ করছি না।" এরপর সমস্ত গুলিবারুদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যুদ্ধ চালান, তা'রপর শেষে বাধ্য হ'য়ে আত্মসমর্পণ করেন।

ঐ দিনই শত্রুপক্ষ ভীষণভাবে কামানের গোলাবর্ষণের পর ক্যায়ুকপাডাং অধিকার করে—ফলে আমাদের য়েন্নান্ (Yennan), গ্যাউঙ (Gyaung) এবং ম্যাগউই (Magwe)-এ পশ্চাদপসরণের একমাত্র পথ রুদ্ধ হয়।

এই সময় শত্রুদল মিকটিলা থেকে এসে ক্যায়ুক-পাডাং-এর মাইল দশেক পূবে আমাদের ঘাঁটিগুলির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়—আমাদের সৈন্যদল অতিকষ্টে স্বস্থানে অবস্থান ক'রতে সমর্থ হয়।

আমাদের ডিভিশানের অধিকাংশ সৈন্য ১২ই এপ্রিলের রাত্রি ২টার সময় পোপা ত্যাগ করে। ক্যায়ুকপাডাং-এর পথে কিছুদূর এগিয়ে যেতে দেখা গেল—পথ শত্রু-টহলদার সৈন্যদের দ্বারা রুদ্ধ। বাধ্য হ'য়ে আমরা আমাদের সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি রাস্তার উপর ফেলে রেখে শত্রু-বেষ্টনী কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লাম। ৪নং গেরিলা রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন খান মোহাম্মদকে অগ্রণীদলের গার্ড কম্যাণ্ডার ক'রে তাঁকে একটা ফাঁক সৃষ্টি ক'রতে হুকুম দেওয়া হ'ল—ঐ ফাঁক দিয়ে ডিভিশানের অন্যান্য সৈন্যরা বেরিয়ে যেতে পার্‌বে। তাউঙথা সড়ক দিয়ে পোপার দিকে শত্রুপক্ষের অগ্রগতি রোধ ক'রবার জন্য ক্যাপ্টেন বাগড়ির নেতৃত্বে ৩নং ব্যাটেলিয়ানকে পোপায় রেখে দেওয়া হয়—এতে ডিভিশানের অন্য সৈন্যরা শত্রু-বেষ্টনী ভেদ ক'রে যাবারও সুযোগ পাবে।

১৩ই এপ্রিল সকাল ৮টার সময় ডিভিশান শত্রু-পরি-বেষ্টনী ভেদ ক'রে ইন্দোওয়াক্কি এলাকায় গিয়ে পৌঁছে।

এই স্থানটি দুই একটি গাছ ছাড়া সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। ডিভিশানের সমস্ত সৈন্যরাই এখানে এসে সেদিন বিশ্রাম করে। শক্রবিমানগুলি অবিরত এই এলাকার উপর টহল দিচ্ছিল,—অথচ তারা আমাদের দেখ্‌তে পায় নি। কি ক'রে যে এটা সম্ভব হ'ল—ভাব্‌লে আশ্চর্য্য লাগে। ঐ দিনই পোপায় ক্যাপ্টেন বাগড়ির ব্যাটেলিয়ান নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে ইন্দোওয়াক্কিতে নিজেদের ব্রিগেডে ফিরে আসে।

১৩ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে ইন্দোওয়াক্কি অঞ্চলে আমি বাহিনী কম্যাণ্ডারদের শেষ নির্দ্দেশ দেই। আগের দিন রাত্রে প'ড়ে গিয়ে কর্ণেল সাইগলের পা ম'চ্‌কে যায়। ডিভিশানের অন্যান্য রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে গরুর গাড়ীতে ক'রে নিয়ে যেতে হ'ল। ইন্দোওয়াক্কি থেকে আমাদের বিভিন্ন পথে যাত্রা ক'রতে হ'ল—এরূপ সিদ্ধান্ত আমাদের আগেই করা ছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ নাতমাউক ও তোয়ানডুইঙ্গ্যি শক্রদল অধিকার ক'রে ব'সেছিল—তাই কর্ণেল সাইগলকে ঐ সব জায়গা দিয়ে না গিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে প্রোমে যাবার চেষ্টা ক'রতে হ'ল। পথে যেতে যেতে তাঁর রসদ সব ফুরিয়ে গেল—তা' ছাড়া শক্রদলও তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে। প্রথম প্রথম ২নং রেজিমেণ্টের সৈন্যদল এক 'কলামে'ই যাচ্ছিল—পরে নাতমাউকে পৌঁছবার পর কর্ণেল সাইগল এদের দুই 'কলামে' ভাগ করা সাব্যস্ত করেন। এর কারণ—প্রথমতঃ, এক জায়গা থেকে এত বড় একদল সৈন্যের রসদ সংগ্রহ করা কষ্টকর; দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ বিমান অবিরত

এই এলাকার উপর টহল দিয়ে ফির্‌ছিল, সুতরাং দল বড় থাক্‌লে তা'দের চোখ এড়ানো মুস্কিল। 'কলাম' দুইটির একটিতে রইল ব্রিগেড হেড্‌ কোয়ার্টার্স, ২নং ব্যাটেলিয়ান ও ১নং ব্যাটেলিয়ান—এর নেতা হ'লেন কর্ণেল সাইগল। ৩নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় 'কলাম' ক্যাপ্টেন বাগড়ির নেতৃত্বে—কয়েক মাইল দূরে প্রথম কলামের সমান্তরালভাবে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। এই দুই কলামই শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে তোয়ানডুইঙ্গ্যির পাশ দিয়ে যেতে সক্ষম হ'য়েছিল।

ক্যাপ্টেন বাগড়ির বীরোচিত মৃত্যু

২০শে এপ্রিলের কাছাকাছি ক্যাপ্টেন বাগড়ির 'কলাম' যখন তোয়ানডুইঙ্গ্যির প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থান ক'রছিল, সেই সময় শত্রুপক্ষের অনেকগুলি ট্যাঙ্ক তা'দের ঘিরে ফেলে। ব্যাটেলিয়ানটি তখন একটা ছোট গ্রামের খোলা ধানখেতের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। প্রহরীরা এসে ক্যাপ্টেন বাগড়িকে খবর দিল—বহু-সংখ্যক শত্রু-ট্যাঙ্ক গ্রামের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। ক্যাপ্টেন বাগড়ির ব্যাটেলিয়ান এই আক্রমণের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না: আত্মরক্ষার জন্য গর্ত্ত খুঁড়বার সময় তা'দের ছিল না, আর এই লৌহ-দানবের সঙ্গে লড়বার মত অস্ত্রশস্ত্রও তা'দের ছিল না। ক্যাপ্টেন বাগড়ি দেখলেন—হ'য় তাঁকে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে, না হয় জিত্‌বার আশা না থাক্‌লেও যুদ্ধ ক'রে বীরোচিত মৃত্যুকে বরণ ক'রতে হবে। তিনি তাঁর

সৈন্যদের ডেকে এই অবস্থার কথা বুঝিয়ে বল্‌লেন,—"শত্রু-ট্যাঙ্ক আমাদের চারিদিক্ ঘিরে ফেলেছে, সুতরাং হয় আমাদের শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে, না হয় বীরের মত যুদ্ধ ক'রে মৃত্যু বরণ ক'রতে হবে।...আমি নিজে ঐ কাপুরুষ ব্রিটিশদের কাছে আত্মমণর্পণের কথা ভাব্‌তেই পার্‌ছি না—ওদের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ল'ড়েই প্রাণ দেব আমি।"—এই সব বলার পর মাত্র ১০০ জন সৈন্যের একটি দল নিয়ে তিনি শত্রু-ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হ'লেন। হাতবোমা ও পেট্রোল ভর্ত্তি বোতল ছুঁড়ে তাঁর সৈন্যরা শত্রু-পক্ষের যানবাহন আক্রমণ ক'রে একটি ট্যাঙ্ক ও একখানা সাজোয়া গাড়ী ধ্বংস ক'রলে। শত্রুদের আর একটি ট্যাঙ্ক আক্রমণ ক'রবার সময় শত্রুদের মেশিনগানের গুলিবর্ষণে ক্যাপ্টেন বাগড়ি আহত হ'য়ে প্রাণত্যাগ ক'রলেন। যে সব সৈন্যরা তাঁর অনুসরণ ক'রছিল তা'দের অধিকাংশই মারা গেল।

ব্রিটিশ অফিসারেরা ক্যাপ্টেন বাগড়ির এই অসীম সাহস ও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। শত্রুর বিপুল কঠিন সমরায়োজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষ্ফল জেনেও ক্যাপ্টেন বাগড়ি শত্রু-ট্যাঙ্ক আক্রমণ ক'রতে গিয়ে কেন নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন—তাঁরা তা' কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। এর কারণ বুঝা অবশ্য একেবারেই কঠিন নয়, কিন্তু ইংরেজের মাথায় সে কথা কিছুতেই ঢুক্‌তে চায় না : ভারতমাতার বীর সন্তানেরা মৃত্যু বরণ ক'রতে রাজী, কিন্তু পরাজয় স্বীকার তারা কিছুতে

ক'রবে না। শত্রুদের ট্যাঙ্ক আক্রমণকালে বাগড়ি জান্‌তেন—নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তা'তে তিনি কিছুমাত্র ভয় পান নি। পরাজয় স্বীকার তিনি কিছুতেই ক'রবেন না। এইরূপে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন বীর যোদ্ধা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

২৭শে এপ্রিল তারিখে কর্ণেল সাইগলের নেতৃত্বে দ্বিতীয় 'কলাম' তোয়ানডুইঙ্গ্যিতে অবস্থিত শত্রুদলের চোখে ধুলো দিয়ে ম্যিউ (Myew) নামে একটা ছোট গ্রামে এসে হাজির হ'ল। এই গ্রামটি আল্লেনমেয়োর (Allenmayo) ২ মাইল উত্তরে। এখানে এসে তারা দেখ্‌লে আল্লেনমেয়োতে তখন ভীষণ যুদ্ধ হ'চ্ছে, দুই পক্ষ থেকেই প্রবল গোলা-গুলি বর্ষণ হ'চ্ছে। কর্ণেল সাইগল তখন সড়ক থেকে প্রায় তিন মাইল পূবে মাগির্গাঁ (Magigaon) নামে একটি গ্রামে গিয়ে নিজের বাহিনীগুলির আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ক'রতে আদেশ দিলেন। জায়গাটা আত্মরক্ষার বিশেষ উপযোগী, কারণ এর তিনদিকেই পাহাড়—আর এক দিকে নদীর খাদ। পাহাড়ের উপর প্রহরী সৈন্য মোতায়েন রাখা হ'ল,—সারা রাত্রি তারা সেখানে পাহারা দিলে। পরদিন সকালে কর্ণেল সাইগল তাঁর বাহিনীর সকল অফিসারদের নিয়ে একটা বৈঠক ক'রলেন। এই বৈঠকে তিনি ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের অবস্থা সম্যক্ বর্ণনা ক'রলেন—বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা যে রণাঙ্গনে আছেন তার অবস্থা। তিনি বল্‌লেন—আল্লেন-মেয়ো (Allenmayo) ইতিপূর্ব্বেই শত্রুদল অধিকার ক'রে

নিয়েছে। প্রোমে যাবার প্রধান সড়ক রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। এরপর তিনি তাঁ'দের বুঝিয়ে বল্‌লেন যে, তিনটি মাত্র পথ এখন তাঁ'দের সাম্‌নে র'য়েছে। তার একটি হ'চ্ছে—আগেকার মত যুদ্ধ ক'রে তাঁ'রা শত্রু-লাইন ভেদ ক'রে প্রোমে নিজেদের ডিভিশানের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবেন; দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে—তাঁ'রা সবাই অসামরিকের ছদ্মবেশে শত্রু-লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে যাবেন, আর তৃতীয়টি হ'চ্ছে—তাঁ'রা সবাই যুদ্ধবন্দী হবেন। সব কিছু ব্যাখ্যা ক'রবার পর তিনি অফিসারদের উপরই ভার দিলেন—তাঁ'দের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রতে। অফিসারেরা জানালেন—বিষয়টা ভেবে দেখ্‌বার জন্য তাঁরা এক ঘণ্টা সময় চান। এক ঘণ্টা পরে তাঁরা আবার একত্র সমবেত হ'য়ে কর্ণেল সাইগলকে জানালেন—তাঁরা সবাই একমত হ'য়ে ঠিক ক'রেছেন তাঁরা যুদ্ধবন্দী হবেন। কর্ণেল সাইগল তখন মিত্রবাহিনীর কম্যাণ্ডারকে লিখে জানালেন যে, তিনি সাব্যস্ত ক'রেছেন তাঁর সৈন্যদলকে তিনি ব্রিটিশদের হাতে যুদ্ধবন্দীরূপে অর্পণ ক'রবেন। এর পর তিনি তাঁর অফিসারদের নিজের নিজের বাহিনীতে ফিরে গিয়ে সৈন্যদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি প্রহরী সৈন্যদের গ্রামের ভিতর ফিরে আস্‌তে হুকুম দিলেন।

বেলা প্রায় ১টার সময় খবর পাওয়া গেল কতকগুলি গুর্খাসৈন্য গ্রামের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। কর্ণেল সাইগল নিজের অধীনস্থ সৈন্য ও অফিসারদের স্থির ও শৃঙ্খলাবদ্ধ

হ'য়ে অপেক্ষা ক'রতে বল্‌লেন এবং তাঁদের আদেশ দিলেন—তা'রা যেন উত্তেজিত হ'য়ে ওদের উপর গুলিবর্ষণ না করে। এর পর তিনি গুর্খাদের কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রলেন। এরপর তা'দের সবাইকে ম্যাগউই (Magwe) কারানিবাসে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

৪নং রেজিমেণ্টের ডিভিশনাল হেড্‌কোয়ার্টার্সের পশ্চাদপসরণ

১৯৪৫ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ইন্দোওয়াক্কিতে (Indowakki) বিগ্রেড কম্যাণ্ডারদের শেষ নির্দ্দেশ দিয়ে আমি (ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার কর্ণেল শাহনওয়াজ খান) আমার দলবল নিয়ে ম্যাগউই-এর দিকে এগিয়ে চল্‌লাম। ম্যাগউই ওখান থেকে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে। পরদিন এইনো (Eino) নামক একটা গ্রামে গিয়ে আমরা বর্ম্মীদের একটা মন্দিরে অবস্থান ক'রলাম। সারা রাত্রি বালির উপর দিয়ে চ'লে সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তা' ছাড়া শত্রুদল চারিদিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আস্‌ছিল। প্রধান প্রধান সব রাস্তাই তা'দের দখলে, সুতরাং আমাদের সামনের শত্রু-সৈন্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্য জঙ্গল-পথে চলাই আমি সাব্যস্ত ক'রলাম। শত্রুর তৈলখনি-অঞ্চল আক্রমণের আয়োজনও অনেকদূর অগ্রসর হ'য়েছিল,—এ অবস্থায় আমাদের দল শত্রু-লাইনের ভিতর দিয়ে আদৌ ম্যাগউইতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ

ছিল। এইসব নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে চল্‌ল। এই সময় আমাদের রসদও সব ফুরিয়ে গিয়েছিল—পথে চ'লতে চ'লতে গ্রাম থেকে যা কেনা যেত তাই দিয়ে আমাদের কোন রকমে খাওয়া চ'লত।

১৮ই এপ্রিল রাত্রি ৪টার সময় এই দল শত্রুসৈন্যের চোখে ধুলো দিয়ে ম্যাগউইতে গিয়ে হাজির হয়। এইখানে আমাদের কর্ণেল এস্‌, এম্‌, হুসেনের সঙ্গে দেখা হয়। কর্ণেল হুসেন ১নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার। ম্যাগউই, মিনউ (Minwu) ও তোয়ানডুইঙ্গ্যি এলাকার রক্ষাভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার হিসাবে আমি যে সব সৈন্যদল নিয়ে এসেছিলাম, ম্যাগউই এলাকায় আসার পর তা'দের সব দলভাঙ্গা ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কর্ণেল হুসেন আমার কাছে ওখানকার যুদ্ধের অবস্থা সব বর্ণনা ক'রলেন। তিনি জানালেন,—কম্যাণ্ডার মেজর বি, এস্‌, রাওয়াতের নেতৃত্বে ১নং ব্যাটেলিয়ান তোয়ানডুইঙ্গ্যি রক্ষা ক'রে আস্‌ছিল—এখন তোয়ানডুইঙ্গ্যি শত্রুরা অধিকার ক'রে নিয়েছে। জায়গাটা পুনরধিকার ক'রবার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যরা একযোগে ভীষণভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে। আগেরদিন সন্ধ্যাকালে ম্যাগউই রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের কতকগুলি ট্যাঙ্ক এসে ম্যাগউই-এর প্রায় ১২ মাইল পূবে আমাদের কতকগুলি ঘাঁটি আক্রমণ ক'রেছিল—আমাদের সৈন্যরা ওদের উপর গুলিবর্ষণ করায় ওরা তোয়ানডুইঙ্গ্যির দিকে পশ্চাদপসরণ ক'রেছে।

কর্ণেল হুসেনের মুখে এই সব শুনে মনে হ'ল—অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌ছে এবং ম্যাগউই-এর উপর শত্রুপক্ষের একটা বড় রকমের আক্রমণ দু'একদিনের মধ্যেই আস্‌বে। ২নং ব্যাটেলিয়ানের কম্যাণ্ডার মেজর মানসিং ম্যাগউই রক্ষাভার নিয়েছিলেন,—তিন কোম্পানী সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আগের দিন সন্ধ্যায় আক্রান্ত বহির্ঘাটিগুলিকে তিনি শক্তিশালী ক'রে তুলবেন—এরূপ ব্যবস্থা করা হ'ল। রুগ্ন সৈন্য ও দামী জিনিসপত্র লেফ্‌ট, কর্ণেল রোডারিগ্‌সের কর্ত্তৃত্বে নদী-পারে মিম্বোতে (Mimbo) পাঠানো হ'ল।

এই স্থানে ব'লে রাখা প্রয়োজন—১নং রেজিমেণ্টটি আজাদ হিন্দ ফৌজের সব চেয়ে ভাল সৈন্যদের নিয়ে গড়া। এদের সামরিক শিক্ষা সব চেয়ে বেশী কিন্তু মালয় থেকে ব্রহ্মে যাবার পথে তিনটি কামান, অনেকগুলি মেশিন-গান প্রভৃতি সমস্ত ভারী সমরোপকরণ জাহাজডুবিতে নষ্ট হয়। এই অভাব পূরণের জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা এ পর্য্যন্ত ঐ সব জিনিসের নতুন সরবরাহ পাই নি। সুতরাং কেবলমাত্র রাইফেল এবং হাল্‌কা মেশিনগানের সাহায্যে মরুভূমির মত খোলা জায়গায় এদের শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছে। আর শুধু তাই নয়, ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী 'মাইন' বা কামান্ এদের ছিল না।

পরের দিন শত্রুদল আমাদের ঘাঁটি এলাকায় প্যারাসুটে সৈন্য নামাতে আরম্ভ করে, কিন্তু আমাদের সৈন্যরা লড়াই ক'রে তা'দের বিব্রত ক'রে তোলায় তারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য

হয়। ঐ দিনই পোপা থেকে আমাদের আরও কয়েকদল সৈন্য ম্যাগউইতে এসে হাজির হয়। অবিরত ৭ দিন ধ'রে তারা মার্চ্চ ক'রে এসেছে। শত্রু-বিমানের কর্ম্মতৎপরতার জন্য তারা কেবল রাত্রে পথ চল্‌ত। দিনের বেলায় তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে শত্রু-বিমানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক'রত। এই ৭ দিনের পথ চলায় ঘুম তা'দের এক রকম হয় নি বল্‌লেই হয়। সুতরাং তারা যে অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'য়ে ম্যাগউইতে এসে পৌঁছেছিল এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন এবং এই জন্যই বিশ্রাম ক'রে পুনঃসঙ্ঘবদ্ধ হ'বার জন্য তা'দের কিছু সময় দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল।

বেলা তিনটার সময় শত্রুপক্ষের কতকগুলি ট্যাঙ্ক ও লরি আমাদের বহির্ঘাঁটির লাইন ভেদ ক'রে ম্যাগউইতে হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ল। বহির্ঘাঁটির সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান ক'রতে একমাত্র পত্রবাহক লোক ছাড়া আমাদের অন্য গতি ছিল না। সুতরাং শত্রু-ট্যাঙ্কবাহিনীর আগমনের সংবাদ জানিয়ে আমাদের ঘাঁটির লোক আমাদের সাবধান ক'রে দিতেও পারে নি। ম্যাগউইতে আমাদের সৈন্যও অতি কম ছিল—ফলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধও তারা ক'রতে পারে নি। লেফ্‌ট, কর্ণেল জি, এস্‌, ধীলন এবং ৪নং রেজিমেণ্টের মেজর চন্দ্রভান কয়েকটি সৈন্যকে একত্র ক'রে নামমাত্র একটা আত্মরক্ষা-ব্যূহ সৃষ্টি ক'রে কোন রকমে শত্রুদের কয়েক ঘণ্টা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—সেই অবসরে

ম্যাগউই-এর অন্য সৈন্যেরা পরের ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ ক'রেছিল। শত্রুরা অবিরাম প্রতিরোধ-ব্যূহের সৈন্যদের উপর ভীষণভাবে কামানের গোলা ও বোমা বর্ষণ ক'রছিল —এ সব সত্ত্বেও অন্যান্য সৈন্যরা ম্যাগউই থেকে অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত তারা ঐ স্থান কিছুতেই ত্যাগ করে নি। আমাদের সৈন্যদের অনেককে ম্যাগউইতে বাধ্য হ'য়ে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে হয়—আমাদের দুর্ভাগ্য যে ১নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কর্ণেল এস্, এম্, হুসেনকেও ওরা আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। কর্ণেল জি, এস্, ধীলন এবং মেজর চন্দ্রভান তাঁ'দের কর্ত্তব্য শেষ ক'রে 'কানি'তে (Kani) ফিরে আসেন। ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার হিসাবে এইখানেই আমি ২নং ডিভিশানকে প্রোমে ফিরে যাবার আদেশ দিই। ১৯শে এপ্রিল রাত্রে ২নং ডিভিশানের অবশিষ্ট সৈন্যদল নৌকা-যোগে ইরাবতী পার হ'য়ে পশ্চিম তীরে উপস্থিত হয়। মিনবুতে কর্ণেল রোডারিগ্‌সকে সংবাদ পাঠানো হয়—তিনি যেন ১নং ইন্‌ফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের ৩নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে প্রোমে পশ্চাদপসরণ করেন। মান সিং ২নং ব্যাটেলিয়ান নিয়ে বহির্ঘাঁটিতে অবস্থান ক'রছিলেন— দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কাছে কোন সংবাদ পৌঁছে না। ফলে পরের দিন ম্যাগউইতে তাঁকে ব্রিটিশ সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে হয়।

ইরাবতীর পশ্চিম তীরে উপনীত হবার পর দেখা গেল— তোয়ানডুইঙ্গি থেকে শত্রুদল এসে ইতিমধ্যেই মিগ্যাউঙ্গি

(Migyaungye) ও মিনহ্লা (Minhla) অধিকার ক'রে বসেছে। সুতরাং আমাদের আরও পশ্চিমে সরে জঙ্গল-পথ ধরে প্রোমে যাবার চেষ্টা ক'রতে হ'ল। ২৮শে এপ্রিল তারিখে আমরা কামা-র (Kama) ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মিন্দে (Minde) নামক একটি গ্রামে গিয়ে হাজির হ'লাম। যে সব বর্ম্মী সৈন্যরা জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছিল—তা'দের সাহায্যে আমরা রাত্রে কামায় ইরাবতী পার হ'য়ে আবার পূর্ব্বতীরে উপস্থিত হ'লাম। এই সময় আল্লেনমায়িতে (Allenmaye) ভীষণ যুদ্ধ চ'লেছে এবং শত্রুদল অবিলম্বে প্রোম অধিকার ক'রবার চেষ্টা ক'রছে।

ক্যায়ুকপাডাং থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রে আমরা যখন প্রোমে আসি তখন যে সব বর্ম্মী সৈন্যরা জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে এই অঞ্চল—বিশেষ ক'রে ইরাবতীর পশ্চিম তীরে মিনবু (Minbu) থেকে প্রোম পর্য্যন্ত অধিকার ক'রেছিল—তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুর মত আচরণ ক'রেছিল। এই সব বিদ্রোহী সৈন্যরা প্রোমের পশ্চিমে ৪২টি গ্রামে নিজেদের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। এই এলাকায় জাপানী সৈন্য একরকম ছিল না বল্লেই হয়। যে অল্প কয়েকজন জাপানী সৈন্য ব্রিটিশ পরিবেষ্টনী থেকে মুক্ত হ'য়ে পালাতে চেষ্টা ক'রেছিল—বর্ম্মী গেরিলা সৈন্যরা তা'দের দলভ্রষ্ট ক'রে হত্যা করে। গ্রামবাসীরা বিদ্রোহী বর্ম্মী সৈন্যদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা ক'রছিল।

বিদ্রোহী বর্ম্মী সৈন্যরা নিজেদের নাম রেখেছিল জনগণের জাতীয় বাহিনী (People's National Army)—এরা যুদ্ধ ক'রছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। এই সব বিদ্রোহী সেনার কম্যাণ্ডার জেনারেল আউঙ স্যাঙের (Aung Sang) হেড্ কোয়ার্টার্স ছিল থায়েট্‌মেয়ো (Thayetmayo) অঞ্চলে। এই এলাকায় তারা একটি প্রবল স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট স্থাপন ক'রেছিল। প্রত্যেক গ্রামে তারা একজন অফিসারের অধীনে কয়েকজন ক'রে সৈন্য রেখে দিয়েছিল। এই সব অফিসারেরা অর্থাৎ নন্-কমিশন্ড অফিসারেরা সাধারণ গ্রামবাসীর পোষাকে অবস্থান ক'রতেন এবং গ্রামবাসীরা প্রাণ গেলেও এঁদের উপস্থিতি বা কোন রকম পরিকল্পনার কথা ঘুণাক্ষরে কোন বিদেশীর কাছে প্রকাশ ক'রত না। বস্তুতঃ গ্রামবাসীরাই এঁদের আহার, বাসস্থান প্রভৃতি সব কিছুর ব্যবস্থা ক'রত, তারাই এঁদের রক্ষা ক'রত। আর এঁরাই গ্রামের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ ক'রতেন। এঁদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন কিছু কেনা সম্ভব ছিল না, এমন কি একমাত্র যান গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত ভাড়া করা সম্ভব ছিল না। এই সব অফিসারেরা শাসন এবং গুপ্তচর-বৃত্তিতে বিশেষরূপে শিক্ষিত হ'য়েছিলেন। গ্রামবাসীদের সাহায্যে ঐ অঞ্চলে শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে সকল খবরই এঁরা সংগ্রহ ক'রতেন। শত্রুসৈন্যের আগমন সংবাদ জানানোর জন্য প্রত্যেক গ্রামে প্রহরী মোতায়েন করা হ'য়েছিল। ফাঁপা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী এক রকম্

ঢোলকের (Drum) সাহায্যে প্রত্যেক গ্রামে শত্রুর আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা ছিল। এই ঢোলকগুলি খুবই কার্য্যকরী হ'য়েছিল, বহুদূর থেকে এ গুলির শব্দ শোনা যেত। ঢোলকের শব্দ শোনা মাত্র গ্রামবাসী—ছেলে, বুড়ো, স্ত্রীলোক সবাই গ্রাম থেকে পালিয়ে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিত। এই সব আশ্রয়স্থানে গ্রামবাসীরা পূর্ব্বেই তা'দের খাদ্যশস্য জমা ক'রে রাখ্‌ত এবং গবাদি পশুও তারা জঙ্গলে লুকিয়ে রাখ্‌ত। ফলে জাপানী সৈন্যরা যখন গ্রামে আস্‌ত, তখন তারা দেখ্‌ত গ্রাম একেবারে শূন্য—কোন প্রকার রসদের নাম গন্ধও নাই। জাপানী সৈন্যরা প্রধানতঃ গ্রামেই থাক্‌ত। তা'দের পক্ষে এই অবস্থাটি গুরুতর বিপদের কারণ হ'য়েছিল।

বর্ম্মী গেরিলা সৈন্যরা এই গুপ্তচরদলের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রেই কাজ ক'রত। গেরিলা বাহিনী ৪০।৫০টি লোক্ নিয়ে গঠিত হ'ত এবং আধুনিক জাপানী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে তারা শত্রুর প্রতীক্ষায় থাক্‌ত। গুপ্তচরের মুখে জাপানী সৈন্যের আগমন সংবাদ পেলে—এরাই তা'দের ধ্বংস ক'রত। জাপানীরা এই বর্ম্মী গেরিলাদের রীতিমত ভয় ক'রে চল্‌ত। ধরা প'ড়লে তা'দের ভীষণ শাস্তি দিত। ব্রহ্মদেশে তখন কাপড়ের বড় অভাব। বর্ম্মী গেরিলারা তাই জাপানী সরবরাহ-কেন্দ্র, কাপড়ের ডিপো, মোটর বা ট্রেণে ঐরূপ কিছু মাল থাক্‌লে সে সব লুট ক'রে গ্রামবাসীদের বিলিয়ে দিত। এমনি ক'রে—তা' ছাড়া ভালরূপ শাসন-

শৃঙ্খলার দ্বারাও বটে—তারা গ্রামবাসীদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ ক'রেছিল।

১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে পোপা এবং ম্যাগউইতে থাক্‌বার সময় জাপানীরা বার বার আজাদ হিন্দ ফৌজকে বর্ম্মী গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে অনুরোধ ক'রেছিল কিন্তু আমরা তাতে রাজী হই নি—কারণ আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে শুধু ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ক'রবার জন্যে। আমরা ত জাপানী সৈন্য নয়—অথবা জাপানী সৈন্যদলের অধীনেও নয়, সুতরাং আমরা বর্ম্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রব কেন? তা' ছাড়া ওরাও ত ওদের নিজের দেশ স্বাধীন ক'রবার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়েছে। এই সব সংবাদ জেনারেল আউঙ স্যাঙের কানে গেলে তিনি তাঁর সৈন্যদলকে আদেশ দেন—তারা যেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে এবং তা'দের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ না করে।

এ কথা সবাই জানেন যে ১৯৪২ সালের পূর্ব্বে ব্রিটিশরা যখন ব্রহ্মদেশ শাসন ক'রছিল—তখন তারাই বর্ম্মী ও ভারতীয়দের ভিতরে বিশেষ তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি করে। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানীরা যখন ব্রহ্মদেশে অগ্রসর হ'তে থাকে, তখন বহু ভারতীয় ভয় পেয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে আস্‌তে চেষ্টা করে—বর্ম্মীরা তখন এইরূপ হাজার হাজার ভারতীয়কে নির্ব্বিবাদে হত্যা করে। শুনা যায়, এমনি ক'রে বর্ম্মীদের হাতে প্রায় ৫০,০০০ হাজার ভারতীয়ের প্রাণ যায়। ভারতীয়দের প্রতি বর্ম্মীদের এই বৈরভাব কি ক'রে প্রীতি-

সৌহার্দ্দ্যে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ল, তা' ভাবলে অবাক্ হ'তে হয় ; কিন্তু অবাক্ হবার কিছু নেই —নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বই এর একমাত্র কারণ। ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে নেতাজী বর্ম্মীদের সাথে বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলেন—বর্ম্মীরা তাই তাঁকে শুধু ভারতীয়দের নেতার চ'ক্ষে দেখ্ত না, তাঁকে বর্ম্মী এবং পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য জাতির নেতা ব'লেও গণ্য এবং মান্য ক'রত। ফলতঃ বর্ম্মী সেনার সাহায্য না পেলে ২নং ডিভিশানের মূল বাহিনীর প্রোমে এবং পরে পেগুতে পৌঁছনো সম্ভবপর হ'ত না।

১লা মে সকালে সৈন্যদলগুলি ইরাবতীর পূর্ব্বতীরে কামার ওপারে নিয়ে যাবার পর শেষ দলের সঙ্গে আমিও নদী পার হই। এই দলটিতে ছিলেন আমার ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্সের সমস্ত অফিসার, কর্ণেল রোডারিগ্স, মেজর রামস্বরূপ, মেজর মেহর দাস, মেজর এ, বি, সিং এবং কর্ণেল জি, এস্, ধীলন। কর্ণেল ধীলন তখন অ্যাপেণ্ডি-সাইটিস্ রোগে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। সকাল বেলায় আমরা প্রোমের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হই। এখানে পৌঁছে আমি সংবাদ পেলাম—প্রোম থেকে লোকজন, জিনিসপত্র সরিয়ে জাপানীরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমি আরও সংবাদ পাই যে, ব্রিটিশেরা তোয়াঙ্গু (Toungoo) অধিকার ক'রেছে এবং রেঙ্গুন থেকে জাপানীরা লোকজন ও মূল্যবান্ জিনিস-পত্র সরিয়েছে এবং ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের সবাইকে

নেতাজী ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে আদেশ দিয়েছেন। আমি অবশ্য এমন আদেশ মান্‌তে রাজী ছিলাম না—আমার দৃঢ়সঙ্কল্প—যুদ্ধ চালাতে থাকৃবো ও আমি নেতাজীর কাছে পৌঁছতে চেষ্টা ক'রব। লোক-মুখে শুন্‌লাম—নেতাজী তখন মৌলমিনে। আমি যেরূপ আশঙ্কা ক'রেছিলাম অবস্থা তার চেয়েও গুরুতর ব'লে মনে হ'ল। এখান থেকে মৌলমিন পর্য্যন্ত যাওয়া রুগ্ন ও আহতদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারা এত কষ্ট সইতে পার্‌বে না। সুতরাং আমি রুগ্ন ও আহতদের এক সঙ্গে ক'রে কালাবস্তি নামে একটা ভারতীয় গ্রামে কর্ণেল রোডারিগ্‌স ও মেজর রঙ্গনাথনের তত্ত্বাবধানে রেখে যাওয়া সাব্যস্ত ক'রলাম। এই দুই অফিসার ব্রিটিশদের কাছ থেকে দুর্ব্ব্যবহার পাবেন আশঙ্কা ক'রেও ইচ্ছা ক'রেই পিছনে থাকৃতে চাইলেন—এখানে থেকে তাঁরা আহত ও রোগীদের দেখাশুনা ক'রবেন। তাঁ'দের আমি হুকুম দিলাম—ব্রিটিশেরা প্রোমে এলেই তাদের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করেন।

অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে ১লা মে রাত্রে আমি প্রোম ত্যাগ করি। এই সময় শত্রুদল অবিরত সহরের উপর কামানের গোলাবর্ষণ ক'রছে—এই অবস্থায় রুগ্ন ও আহতদের এখানে রেখে যেতে সবার বুক একেবারে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। যাদের আমরা রেখে যাচ্ছিলাম তা'দের অধিকাংশেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও তারা ডিভিশানের সঙ্গেই যেতে চাইছিল। ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে

হবে—এ তারা সহ্য ক'রতে পার্‌ছিল না কিন্তু তবু উপরের আদেশ অনুসারে তা'দের এখানে রেখে যেতেই হ'ল—কারণ ইম্ফল থেকে পশ্চাদপসরণের পুনরভিনয় এখানে হয় এটা আমার ইচ্ছা ছিল না।

প্রোমের দক্ষিণে তখনও শত্রুরা প্রবেশ করে নি, সুতরাং প্রধান রেঙ্গুন-প্রোম সড়ক ধরেই আমরা চ'লতে লাগ্‌লাম। জাপানীরা তখন ত্বরিত গতিতে পশ্চাদপসরণ ক'রছে। যে যান-বাহন হাতের কাছে পাচ্ছে তাতে ক'রেই তারা নিজেদের লোকদের ওখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। যান-বাহন আমাদের কিছুই ছিল না ; সুতরাং আমরা শত্রুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য দিবারাত্র পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম। জাপানীরা তা'দের পূর্ব্বাভ্যাস মত আমাদের বিপদের মুখে ফেলে দ্রুত পালিয়ে যেতে লাগ্‌ল। অথচ আমাদের কাছে কোন বেতার-যন্ত্র না থাকায় চারিদিকের অবস্থা জান্‌বার জন্য আমাদের তা'দের উপরই নির্ভর ক'রতে হ'ত।

৫ই মে সকাল সাতটার সময় আমরা ওকপোর (Okpo) দুই মাইল দক্ষিণে একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। এখান থেকে জাপানী সৈন্যরা পূবে পেগু-য়োমাসে (Pegu-Yomas) চ'লে গেল। আমরা মার্চ্চ ক'রে লেৎপাদানে (Letpadan) যাওয়া সাব্যস্ত ক'রলাম।

৭ই মে প্রায় দুপুর রাত্রির সময় আমরা তাইকচি (Taikchi) নামক একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হ'লাম। এই জায়গাটা রেঙ্গুনের প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে। এখানে গিয়ে

আমরা জান্‌লাম ব্রিটিশ সৈন্যদল রেঙ্গুন অধিকার ক'রবার পর আমাদের ধরবার জন্য উত্তরে এগিয়ে আস্‌ছে। আমাদের চারিদিকেই শত্রুসৈন্য; আমরা আবার ফাঁদে পড়ে গেলাম।

আমি প্রধান সড়ক ছেড়ে পূবে পেগু-য়োমাসে যাওয়া সাব্যস্ত ক'রলাম—উদ্দেশ্য, এখান থেকে শত্রু লাইনের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে সিত্তাঙ (Sittang) নদী পার হ'য়ে আমরা মৌলমিন অথবা ব্যাঙ্ককে নিজেদের দলের সঙ্গে মিলিত হব।

প্রায় এক সপ্তাহ ধ'রে সোজা পেগু-য়োমাসের ঘন জঙ্গল পথে চ'লে ১২ই মে তারিখে পেগুর ২০ মাইল পশ্চিমে ওয়াটা (Wata) নামক একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। এখানে পৌঁছে জানলাম শত্রুদল প্রায় দিন পনের আগে পেগু অধিকার ক'রে নিয়েছে এবং ওয়া-তে (Waw) যুদ্ধ চ'লেছে।

সংবাদ পেলাম জার্ম্মানী বিনা সর্ত্তে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছে; অবিরত ভীষণ বোমাবর্ষণের ফলে জাপানের অবস্থাও অতিশয় সঙ্কটাপন্ন। ওদিনটা ঐ গ্রামেই থেকে পরবর্ত্তী গ্রামে টহলদার সৈন্য পাঠিয়ে আমি শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে খবর নেওয়া স্থির ক'রলাম। টহলদার সৈন্যরা পরদিন এসে সমস্ত সংবাদ দিলে। খবর শুনে বেশ বুঝ্‌লাম আমরা ফাঁদে প'ড়ে গেছি—ব্রিটিশদল চারিদিক থেকে আমাদের উপর চেপে আসছে।

শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ নয়—৫০,০০০ হাজারের মত জাপানী সৈন্যের দশাও ঐ, তারাও আমাদের মত ফাঁদে

প’ড়েছে। আমাদের উপর অবিরাম কামানের গোলা আর বোমা বর্ষণ হ’চ্ছিল। রসদ সব নিঃশেষ হ’য়ে গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা ভয়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছিল। খাদ্যাভাবে জাপানীরা সব কিছু খাচ্ছিল—শূকর, গরু, মোষ, কুকুর, বানর—সব। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটময়—চারিদিক্ আমরা অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম আমাদের সব আশা শেষ হ’য়ে গিয়েছে, এ অবস্থায় আর সৈন্যক্ষয় করা নিরর্থক। খাদ্যদ্রব্য সব নিঃশেষ হ’য়ে গেছে—ল’ড়বার মত গোলাগুলি বারুদও আর বিশেষ কিছু নেই—তা’ ছাড়া বর্ষাও সুরু হ’য়ে গেছে। ১৩ই মে সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ওয়াটা (Wata) গ্রাম ত্যাগ ক’রে আমরা আবার যাত্রা সুরু ক’রলাম—রাত্রিটা একটা ঘন জঙ্গলে কাটানো গেল। সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভীষণ অরণ্যে সূর্য্যাস্তকালে—ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার হিসাবে আমি আমার বীর সঙ্গীদের কাছে আমার শেষ বক্তৃতা দিই। আমার দলের এই সব লোকগুলি আমার বহু দুর্গমপথের, বহু দুঃখকষ্টের সাথী।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তারা যে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক’রেছে, যে বিপুল ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা নিয়ে তারা অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য ক’রেছে তার জন্য তা’দের অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম। আমি তা’দের বেশ ক’রে বুঝালাম—আণবিক বোমা আবিষ্কার ও জার্ম্মানীর পতনের ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হ’য়ে গেছে, প্রায় দু’বছর ধ’রে অক্লান্ত

যুদ্ধের ফল আমাদের পণ্ড হ'য়ে গেল; কিন্তু এতেই নিরুৎসাহ হলে চ'লবে না—এই পরাজয়ের ফলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আমাদের শেষ হ'য়ে গেল না—আমাদের রণনীতির শুধু পরিবর্ত্তন ক'রতে হবে। আমাদের কোন মিত্রশক্তি থাকুক্ বা না থাকুক্ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চ'লতে থাক্‌বে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হবে—ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে ভারতবর্ষে উপস্থিত হওয়া। যারা বেঁচে থাক্‌বে তারা ভারতবর্ষে গিয়ে আবার নতুন ক'রে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সুরু ক'রবে।

নিজের সম্বন্ধে আমি তা'দের বল্‌লাম—আমি আমার নিজের মনকে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে কিছুতেই মানাতে পাচ্ছি না—নিষ্ফল হ'লেও ওদের আক্রমণ ক'রে আমি আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দেব এই আমার সঙ্কল্প। আমি এই আত্মঘাতী আক্রমণে যোগ দিতে মাত্র ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক আমন্ত্রণ করি। আমার দলের ৩০০ জন সৈন্য সকলেই ও সমস্ত অফিসার আমার এই আহ্বানে সাড়া দেয়। আমি তখন তা'দের বুঝিয়ে বলি—রসদ কিন্‌বার মত টাকা-পয়সা আমাদের বেশী নেই, সুতরাং ৫০ জনের বেশী লোক নেওয়া সম্ভব নয়। কর্ণেল ধীলন তখন এই ৩০০ জনের ভিতর থেকে ৫০ জন লোক আমায় নির্ব্বাচন ক'রে দেন। অবশিষ্ট সৈন্যদলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি তা'দের ব্রিটিশদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ ক'রতে আদেশ দিই। মেজর জগীর সিং এবং মেজর এ, বি, সিং এই দলের সঙ্গে থাক্‌বেন—

আমি এই নির্দ্দেশ দিই। এত দুঃখের দিন আমার জীবনে আর কখনও আসে নি : নানা বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্টে যারা এতদিন আমার সঙ্গী ছিল, তা'দের আজ আমার ছেড়ে যেতে হচ্ছে। যে সব সাহসী যোদ্ধাদের বীর-হৃদয় শত্রুর প্রবল আক্রমণে একটুও কম্পিত হয় নি—এই সময় তা'দের আমি বালকের ন্যায় কাঁদ্‌তে দেখেছি। যারা আমার মৃত্যু-অভিযানে আস্‌তে চেয়েও আস্‌তে পায় নি—তা'দের অনেকে রাইফেলে গুলি ভ'রে 'জয় হিন্দ' ব'লে নিজের হাতে নিজেকে গুলি ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। ছয় জন লোক এমনি ক'রে আত্মহত্যা করে। এই সব দেখে আমি আবার তা'দের ডেকে অনেক বুঝালাম। তা'দের বল্‌লাম,—আর যদি একজনও এমনি ক'রে আত্মহত্যা করে তা'হলে আমি নিজেই আত্মহত্যা ক'রব। আমার এই কথা শুন্‌বার পর তারা আত্মহত্যায় বিরত হ'ল।

সেই রাত্রি আমরা সব একত্রে কাটালাম, পরদিন মেজর জগীর সিং ও মেজর এ, বি, সিং-এর নেতৃত্বে তা'দের ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পাঠালাম। ওরা রওনা হ'য়ে যাবার পর আমি আমার দলের ৫০টি লোক নিয়ে পেগু-য়োমা (Pegu-Yoma) পাহাড়ের অভ্যন্তরে যাত্রা ক'রলাম। আমার এই ছোট দলে কর্ণেল জি, এস্‌, ধীলন, মেজর মেহর দাস ও আরও কয়েকজন অফিসার ছিলেন। আমাদের পরিকল্পনা—ঐ পাহাড়ের অভ্যন্তরে থেকে আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে প্রাণ দেব। ১৪ই মে সন্ধ্যাকালে

আমরা লোগা নামে একটা ছোট গ্রামে এসে উপস্থিত হই এবং সেখানেই রাত্রিবাস করি। গ্রামে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বৃষ্টি সুরু হয়, সুতরাং বাধ্য হ'য়ে আমাদের গ্রামের ভিতরে আশ্রয় নিতে হয়। এই সব গ্রামে বহু ব্রিটিশ গুপ্তচর ছিল, সুতরাং যেখানেই আমরা যাই না কেন, আমাদের গতিবিধির সংবাদ তখনই ব্রিটিশদের কর্ণগোচর হচ্ছিল ; কিন্তু রসদের জন্য আমাদের গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর ক'রতে হচ্ছিল ব'লে গ্রাম ত্যাগ ক'রে আমরা জঙ্গলে যেতে পার্‌ছিলাম না।

এদিকে ব্রিটিশেরা সুসংবদ্ধ হ'য়ে আমাদের চেপে আক্রমণ ক'রবার আয়োজন ক'রছিল। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের কোন সহানুভূতি না পাওয়ায় শত্রুর অবস্থান সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ছিল—ফলে সাফল্যের সঙ্গে তা'দের আমরা আক্রমণ ক'রতে পারছিলাম না। কয়েকদিন ধরে এই রকম অবস্থা চ'লতে থাকে। এই সময় যাতে আমার নিজের মৃত্যু ঘটে আমি সেইরূপ চেষ্টা ক'রছিলাম, কারণ ব্রিটিশদের হাতে জীবিত বন্দী হ'বার ইচ্ছা আমার ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে শত্রুর যতটা বেশী পারি ক্ষতি ক'রে যাব, সে চেষ্টাও আমি ক'রছিলাম।

এমনি ক'রে ১৭ই মে একটি জ্যোৎস্না রাত্রে প্রায় ১১টার সময় আমরা সিৎপিনজিক্স (Sitpinzeix) নামে একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে হাজির হই। গ্রামের কয়েক শত

গজ দূরে আমার দলকে রেখে তিনজন সঙ্গী নিয়ে আমি গ্রামটা একটু ঘুরে দেখ্‌তে গেলাম : এই গ্রামে রাত কাটানো চল্‌বে কি না।

গ্রামে ঢুক্‌বার পথেই কে একজন হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তুম্ কোন্ হো ?" আমি উত্তরে বল্‌লাম—আমরা ভারতীয়। ওরা ফের জোর গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তুম্ কোন্ হো ?" আমিও "তুম্ কোন্ হো" ব'লে চীৎকার ক'রে তাদের জানালাম যে আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক। আমি মনে ক'রেছিলাম যাদের সঙ্গে কথা ব'লছি ওরাও আমাদের দলের লোক—ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে রাজী না হওয়ায় এখানে র'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের পরিচয় দেবার পরই শুন্‌লাম একজন ব্রিটিশ অফিসার জোর গলায় বল্‌ছে—'জল্‌দি গুলি চালাও'। এই আদেশ পাবার পরই প্রায় ১৫ গজ দূর থেকে আমাদের উপর ভীষণভাবে রাইফেল ও মেশিন গানের গুলি চালানো সুরু হ'ল। আমার ডাইনে, বাঁয়ে ও সাম্‌নে আমার যে তিনটি সঙ্গী ছিল তারা তখনই মারা গেল। একটা চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগে আমার ডায়েরী ছিল, ঐ ব্যাগটা গুলির আঘাতে আমার হাত থেকে ছিট্‌কে প'ড়ল। লাল কেল্লায় আমার সামরিক বিচারের সময় ডায়েরী সমেত ঐ ব্যাগটা ওরা হাজির করে। আমি যে কোন্ অলৌকিক শক্তির বলে অক্ষত দেহে থাক্‌লাম তা' ভাবলেও আশ্চর্য্য মনে হয়। তারপর আমি আমার দলে ফিরে আসি এবং তা'দের নিয়ে এসে এই শত্রুদের আক্রমণ

করি। ফলে শত্রুদল ঐ স্থান ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হয়।

আমাদের এগিয়ে যাবার পথ বন্ধ হ'য়ে গেছে দেখে কয়েক শত গজ পিছিয়ে এসে আমি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করি।

পরদিন সকালে ব্রিটিশ প্রধান গোলন্দাজবাহিনীর ঘাঁটি থেকে পাঁচ শত গজ দূরে এক জায়গায় নিজের দলকে নিয়ে যাই। এখান থেকে ওদের উপর শেষ আক্রমণ ক'রে আমরা মৃত্যু বরণ ক'রব ঠিক করি। কিন্তু সেখানে গিয়েই দেখি—চারিদিক আমাদের ব্রিটিশ সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে। এই দেখে আমি আমার দলের লোকদের নিয়ে একটা বৈঠক ক'রে বলি—আমাদের মৃত্যু বরণ করার তিনটি পথ খোলা র'য়েছে। প্রথম এবং সহজ উপায় হ'চ্ছে—গুলি ক'রে নিজেদের হাতে নিজেদের প্রাণ বিনাশ করা। কিন্তু এটা কাপুরুষের কাজ—সুতরাং আমি নিজে এ উপায় তেমন পছন্দ করি না। দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে—শত্রুদলের কামানগুলির উপর ঝাপিয়ে প'ড়ে হয় ওগুলি নষ্ট ক'রে দেওয়া, না হয় নিজেরা নিহত হওয়া। আমার মতে এমনি ক'রে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়াই হচ্ছে সৈনিকের আদর্শ এবং পরম কাম্য। আর তৃতীয় পন্থা হচ্ছে—শত্রুর কাছে ধরা দিয়ে ওদের হাতেই নিহত হওয়া। আমাদের জীবন্ত ধরতে পারলে ওরা আমাদের কি ক'রবে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আমি আমার দলের লোকদের

বুঝিয়ে বলি—এই শেষ পন্থার সুবিধা এই যে ওরা আমাদের ভারতবর্ষে নিয়ে সামরিক বিচার ক'রে শেষে মারবে। এতে অন্ততঃ একটু আশা করা যায় যে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদের গতিবিধির কথা সব আমরা দেশবাসীর কাছে ব'লে যেতে পারব—আর তা' ছাড়া আমাদের সমাধিও হবে হয়ত ভারতের মাটিতে।

এখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তা' নির্দ্ধারণ ক'রবার ভার দিলাম আমি আমার অফিসার ও সৈন্যদের উপর। কর্ণেল ধীলন তখন প্রথম পন্থা অর্থাৎ আত্মহত্যার পন্থা নাকচ ক'রে দিলেন। তিনি বল্‌লেন—দ্বিতীয় পন্থাটি মৃত্যুর পক্ষে খুব গৌরবজনক হ'লেও ঐখানেই তা' হলে ত সব শেষ হ'য়ে গেল, সুতরাং সেটাও গ্রহণ করা চলবে না। কর্ণেল ধীলন তৃতীয়টিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে মেনে নিলেন। কারণ তিনি বল্‌লেন—মরতেই যদি আমাদের হয় তবে ব্রিটিশরাই আমাদের গুলি ক'রে মারুক—এ জঘন্য কাজটি তারাই করুক, এতে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসীর মনে ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক ক'রবে—ফলে সুযোগ পেলে হয়ত তারা একদিন ব্রিটিশদের দুষ্কৃতির প্রতিশোধ নেবে। এই সব যুক্তি দেখিয়ে তিনি শেষ পদ্ধতি অবলম্বনই সমীচীন এইরূপ মত প্রকাশ ক'রলেন। দলের অধিকাংশ লোকই তাঁকে সমর্থন ক'রলে।

তাঁর যুক্তিমত চলায় শত্রুপক্ষের একটি ইণ্ডিয়ান ব্যাটেলিয়ানের সৈন্যরা আমাদের ধ'রে তা'দের ব্যাটেলিয়ান

হেড্ কোয়ার্টার্সে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সদয় ব্যবহারই আমরা পেলাম। এরপর সেখান থেকে আমাদের ব্রিগেড্ ডিভিশনাল হেড্ কোয়ার্টার্সে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেখান থেকে শেষে 'পেগু' জেলে।

আমি ব্রিটিশ মিলিটারী হেড্ কোয়ার্টার্সে থাক্‌বার সময়ে একবার কতকগুলি ভারতীয় ও ইংরেজ অফিসার এবং কতকগুলি সাধারণ সৈনিক আমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। এই সময় একজন উর্দ্ধতন ব্রিটিশ অফিসার আমার সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কথা বলেন। তিনি উদ্ধত স্বরে আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন; বলা বাহুল্য আমিও অনুরূপ উদ্ধত স্বরে তার জবাব দিই। আমাদের বাক্‌বিতণ্ডাটি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

ব্রি, অ, :—তোমরা কিসের জন্য যুদ্ধ ক'রছিলে?

উত্তর :—যুদ্ধ ক'রছিলাম আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য।

ব্রি, অ, :—তবে আত্মসমর্পণ ক'রলে কেন?

উত্তর :—এ প্রশ্নটি তোমার আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়—কারণটা তোমার বেশ ভালমতই জানা আছে: আত্মসমর্পণের কাজে ব্রিটিশদের জুড়ী মেলে না। ডানকার্ক ও সিঙ্গাপুরে তোমরা কি ক'রেছিলে?

আমার এই কথা শুনে অফিসারটি অত্যন্ত রেগে যান। অতঃপর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় ত কি ক'রবে?

উত্তর :—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি যুদ্ধ ক'রতে থাকব।

ব্রি, অ, :—জাপানীরা তোমায় কত বেতন দিচ্ছিল ?

উত্তর :—জাপানীরা আমায় কোন বেতন দিচ্ছিল না, বেতন দিচ্ছিলেন আমাদের নেতাজী। ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার হিসাবে বেতন পাচ্ছিলাম আমি মাসিক ২৫০৲, এই টাকার বাজার দর ছিল কয়েকটি মুরগীর দাম।

ব্রি, অ, :—তোমাদের নেতাজী টাকা পাচ্ছিলেন কোথায় ?

উত্তর :—অসামরিক ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় এই টাকা তাঁকে দান ক'রছিলেন।

এই কথা শুনে অফিসারটি রেগে গিয়ে তাঁর বুট দিয়ে মাটিতে একটা ঘা মেরে শব্দ ক'রে বলে ওঠেন,—"তোমাকে গুলি ক'রে মারা হবে"—এই ব'লে তিনি আমার সামনে থেকে চ'লে যান। আমাদের এই কথোপকথনের কাহিনী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। ওদের আগের ধারণা ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ বিশেষ। আমি বন্দী অবস্থায় থাকবার সময় ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যরা দলে দলে আমার কাছে এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল বৃত্তান্ত শুনতে চাইত। আমার কাছে সকল কথা শুনবার পর ওরা দুঃখ ক'রত—ব্রিটিশ প্রচারের ফলেই ওরা বিভ্রান্ত হ'য়েছে, নইলে আগে এ সব কথা জানলে ওরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান ক'রত।

পরদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কেন্দ্রে (Interrogation Centre) নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আমি কুড়ি দিন থাকি। এখানে আমি বেশ ভাল ব্যবহার পাই। এখানকার কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন একজন আইরিশম্যান্।

পেগু থেকে প্রহরীর অধীনে আমাকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—সেখান থেকে এরোপ্লেন-যোগে কলকাতায়। কলকাতায় এনে ব্রিটিশ মিলিটারী পুলিশের হাতে আমাকে দেওয়া হয়। তারপর প্রহরীস্বরূপ চারজন সশস্ত্র গুর্খা অফিসার ও সাধারণ সৈন্য সঙ্গে দিয়ে আমাকে দিল্লী পাঠানো হয়। এই দিল্লী যাওয়ার সময় ওরা যা সব করেছিল তা' ভাবলে হাসি পায়। পুলিশ-কারাগার থেকে যাত্রার প্রাক্কালে যে সব প্রহরী সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছিল তা'দের প্রধান অফিসারকে (Officer-in-Charge) ডেকে বিশেষ ভাবে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়—"যে লোককে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ সে কিন্তু বড় সাঙ্ঘাতিক লোক—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরম শত্রু এ। একটু অসাবধান হ'লেই এ তোমার টমীগান কেড়ে নিয়ে তোমাকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌বে; অথবা কামরা থেকে পালিয়ে যাবে। এ যদি কোন রকমে পালায় তবে তোমাকে গুলি ক'রে মারা হবে, কিংবা কারারুদ্ধ করা হবে। সুতরাং খুব হুঁসিয়ার, একটু সন্দেহের কারণ পেলেই একে গুলি ক'রবে।"

গুর্খা অফিসার কথাটি শুনবামাত্র তখনই 'অ্যাটেনশান' অবস্থায় দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—তাঁকে যা যা বলা হ'ল তিনি ঠিক

তাই ক'রবেন। এর পর আমাকে একটি বন্ধ মোটর ভ্যানে ক'রে ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেখানে আমাদের জন্য একটি ফাষ্ট ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করা ছিল—তাতে আমায় তুলে দেওয়া হ'ল। কামরার বাইরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—"সাঙ্ঘাতিক বন্দী যাচ্ছে, এতে অপরের প্রবেশ নিষেধ।" গুর্খা প্রহরীদলও তা'দের উপর যেমন আদেশ ছিল খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে রইল। ট্রেণ ছাড়্লেই আমি একটা 'বার্থে' শুয়ে পড়লাম। গুর্খা সুবেদার তার অধীনস্থ তিনটি লোককে আমার চারিদিকে পাহারায় বসিয়ে দিলে। তা'দের উপর হুকুম হ'ল—তারা তা'দের টমীগানে গুলি ভরে 'সেফটি ক্যাচ্' সামনে এগিয়ে রাখ্বে। আমার হাত বা পা যখনই একটু নড়ছিল অমনি ওরা চারটি বন্দুকের মুখ আমার উপর তুলে ধরছিল। ওরা যে রকম ভয় পাচ্ছিল তাতে কারো বন্দুক থেকে যে হঠাৎ গুলি ছুটে বেরোয় নি কেন—তাই আশ্চর্য্য!

প্রথম দিন এবং রাত্রি এই রকমই চল্‌ল, পরদিন সকাল থেকে দেখা গেল সুবেদার সাহেবের মনোভাব একটু বদ্‌লেছে—আমায় দেখে-শুনে বুঝেছে আমি এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক নই—একজন সাধারণ লোক মাত্র। এ পর্য্যন্ত তারা আমার সঙ্গে একটিও কথা বলে নি—এইবার সুবেদার আমার কাছে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন: আমি কে এবং আমার অপরাধই বা কি? আমি বল্‌লাম—আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসার—ব্রিটিশের পক্ষ হ'য়ে

মালয়ে যুদ্ধ ক'রতে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়া হ'লে তা'তে আমি যোগ দিই।

সুবেদার আমার কথা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—উচ্চ বেতনভোগী হ'য়েও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে আমি ব্রিটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে লড়্‌তে গেলাম কেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে—এই অফিসারের দল ছিন পাহাড়ে আমার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই ক'রেছে—আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে ইনি নিজের মনে একটা-কিছু-যা-হ'ক ধারণা ক'রে রেখেছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"এ কথা কি সত্যি যে যুদ্ধের সময় ভারতীয় আর গুর্খা সৈন্যদল সবার আগে থাকৃত আর টমীরা থাকৃত সবার পেছনে?" সুবেদার বল্‌লেন—"হাঁ, সত্যি।" এর পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তাঁ'র সৈন্যরা অর্থাৎ গুর্খারা আর ব্রিটিশ টমীরা একই বেতন পায় কি? তিনি জানালেন,—না, তা' পায় না—ব্রিটিশ টমী ভারতীয় অথবা গুর্খা সেপাই-এর অন্ততঃ চতুর্গুণ বেতন পায়। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে বল্‌লাম—শত্রুর গুলির মুখে এগিয়ে যাবার সময় গুর্খা আর ভারতীয়েরা থাকৃবে সবার আগে—আর বেতন পাবার সময় টমীরা পাবে বেশী—এ বেশ মজা মন্দ নয়!

আমার কথাটা শুন্‌বার পর গুর্খা অফিসার বেশ খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন—"সাহেব, এ সত্যিই

বড় অবিচার।" আমি তখন তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লাম—বেতন, খাদ্য, পেনসান, বাসস্থান, ভ্রমণের সুবিধা, ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি ব্রিটিশ অফিসারদের ব্যবহার—সব কিছুতেই ওদের এইরূপ সব অবিচার এবং এই অবিচার দূর ক'রবার জন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়েছে।

এই সব শুনে সুবেদার সাহেব আরও কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাব্‌লেন, তারপর বল্‌লেন—"আজাদ হিন্দ ফৌজ যদি এরই জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়ে থাকে, তবে তারা বেশ ভাল কাজই ক'রেছে।"

তিনি তখন জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমাদের 'কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্' কে ছিলেন। আমি তখন তাঁকে নেতাজীর একখানা ফোটো দেখালাম। তিনি ছবির দিকে বেশ কিছুক্ষণ পরম শ্রদ্ধাভরে চেয়ে থেকে বল্‌লেন—"তা'হলে দেখ্‌ছি ভারতীয় লোকও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ হ'তে পারেন।"

এরপর তিনি আমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বল্‌তে গিয়ে বল্‌লেন—"ব্রিটিশ আর ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বেতনের তারতম্য শুধু ব্রিটিশরাই ক'রছে; আমেরিকানরা বর্ম্মী-গুর্খাদের নিয়ে একটা ব্যাটেলিয়ান ক'রেছিল, তারা আমেরিকান সৈন্যদের সমান বেতনই পেত।"

আমার সঙ্গে এই সব কথাবার্ত্তার পর সুবেদারের মনের গতি ফিরে গেল, তিনি তাঁর সৈন্যদের বন্দুক থেকে গুলি বের ক'রে নিতে আদেশ দিলেন এবং আগের দিন তিনি আমার সঙ্গে যে রূঢ় ব্যবহার ক'রেছেন তার জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

ব্রিটিশেরা প্রচারকার্য্যের দ্বারা ভারতীয়দের—বিশেষ ক'রে ভারতীয় সৈন্যদের মন আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে কি ভাবে বিষাক্ত ক'রে তুলেছিল এবং এই মিথ্যা প্রকাশ হ'লে তা'দের সকল চেষ্টা কত শীঘ্র নিষ্ফল হয় তারই একটা উদাহরণ আমি এখানে বিবৃত ক'রলাম।

১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছবার পর আমাকে সোজা লাল কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় এক মাস ধ'রে এখানে আমাকে নানারূপ প্রশ্ন ক'রবার পর সামরিক বিচারালয়ে আমার বিচার হয়। এই বিচারের কাহিনী আমার দেশবাসী সবারই জানা আছে; সুতরাং সে সকলের পুনরাবৃত্তি আর আমি ক'রতে চাই না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অপর দু'টি ডিভিশানের কথা—বিশেষ ক'রে পিনমানায় অবস্থিত ১নং ডিভিশান যাহার অধিকাংশ লোক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিল তা'দেরই কথা এখানে কিছু ব'লতে চাই।

আমি এর আগেই ব'লেছি এই ডিভিশানের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে গড়া একটি রেজিমেণ্ট কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর নেতৃত্বাধীনে রাখা হয়। এই রেজিমেণ্টটি বিশেষ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রতে থাকে; অবশেষে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনী ইহাদের ধ'রে ফেলে এবং পশ্চাদপসরণের সমস্ত পথ রুদ্ধ ক'রে দেয়। তোয়াঙ্গু (Toungoo) ও পেগু যখন শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় তখন কর্ণেল ঠাকুর সিং পূর্ব্ব পার্ব্বত্য-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সিতাঙ পার হ'য়ে

থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) পাপুনে গিয়ে পৌঁছবেন স্থির করেন। সঙ্গে রসদ নেই, কোনও পথ-প্রদর্শক নেই বা কোন মানচিত্রও নেই। এই অবস্থায় প্রচণ্ড প্রচণ্ড পাহাড় অতিক্রম ক'রে এই যাত্রা একটি অসাধারণ কীর্ত্তি। পাপুন থেকে আমাদের সৈন্যদল মার্চ্চ ক'রে মৌলমিনে যায়, সেখান থেকে যায় ব্যাঙ্ককে।

সুভাষ ব্রিগেড এর আগেই কোহিমায় পৌঁছেছিল। এর অধিকাংশ সৈন্য সেই ব্রিগেড-ভুক্ত ছিল। এই সব সৈন্যরা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যাত্রা সুরু ক'রে ক্রমাগত চ'লতে থাকে। যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, রসদ ছিল অতি সামান্য, এই অবস্থায় ৩০০০ হাজার মাইলের উপর তারা পায়ে হেঁটে যায়। যে অসাধারণ মনোবল নিয়ে তারা এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে তা' শত্রুপক্ষের মনেও বিস্ময়ের উদ্রেক ক'রেছিল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এই দুর্গম পার্ব্বত্য অরণ্য-পথে যাবার সময় শত্রুপক্ষের গেরিলা দল প্রতিনিয়ত তা'দের বিপন্ন ক'রেছে। রসদের অভাবে দিনের পর দিন তা'দের জঙ্গলের ঘাস পাতা খেয়ে জীবনধারণ ক'রতে হ'য়েছে। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সৈন্যদল ব্যাঙ্ককে আস্‌বার পর তা'দের সকল আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়। ১নং ডিভিশানের অবশিষ্ট সৈন্যদল জেয়াওয়াদিতে (Zeyawadi) আত্মসমর্পণ করে।

নেতাজীর রেঙ্গুন ত্যাগ

১৯৪৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি তোয়াঙ্গু লাইনে জাপানী প্রতিরোধ অকস্মাৎ বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় শত্রুদল দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে থাকে। অতঃপর জাপানীরা নেতাজীর কাছে গিয়ে তাঁকে রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলে। নেতাজী প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হ'য়ে বল্লেন—তিনি এইখানে থেকে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রবেন।

অবশেষে উর্দ্ধতন অফিসারদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি ব্যাঙ্ককে ফিরে যেতে রাজী হ'ন। জাপানীরা নেতাজীকে একখানা এরোপ্লেন দেয় কিন্তু নেতাজী বিমানযোগে যেতে রাজী হ'ন না। রেঙ্গুনে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর অনেকগুলি মেয়ে ছিল। নেতাজী জান্‌তেন, তিনি বিমানযোগে গেলে ঐ সব মেয়েরা ওখানেই প'ড়ে থাক্‌বে। সেই জন্য তিনি জাপানীদের বল্‌লেন—ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের আগে না সরালে তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রবেন না। জাপানীরা নেতাজীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ঐ সব মেয়েদের রেঙ্গুন থেকে ওয়া (Waw) যাবার জন্যে তারা একখানা রেলওয়ে ট্রেণের ব্যবস্থা ক'রবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দিন অপরাহ্ণে ঐ ট্রেনখানার উপর শত্রুপক্ষের বোমা পড়ায় এঞ্জিনটি বিনষ্ট হ'য়ে যায়। ইত্যবসরে শত্রুদল অতি দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে পেগুর নিকটে এসে উপস্থিত হয়। পেগু যদি শত্রুর হাতে পড়ে তবে আমাদের কোন সৈন্য-

দলকেই শ্যামে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে না। সমস্ত জাপানীরা ২৩শে এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ করে কিন্তু ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের ওখান থেকে না সরানো পর্য্যন্ত নেতাজী কিছুতেই রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রতে রাজী হ'লেন না। তিনি ছোট-বড় সব কিছু নিজে দেখাশুনা ক'রে নিজেই কম্যাণ্ডারদের আদেশ দিতে লাগ্‌লেন।

ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর যে সব মেয়েরা ব্রহ্মের অধিবাসিনী, তা'দের তিনি নিজের নিজের বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রলেন। কেবল মালয় আর শ্যামের মেয়েদের তিনি নিজের সঙ্গে নিলেন। রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রবার আগে নেতাজী ব্রহ্মদেশের লোকেরা তাঁর এবং আজাদ হিন্দ সরকারের যে সাহায্য এবং সহযোগিতা ক'রেছে তারজন্য তা'দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে এক বাণী প্রচার ক'রলেন।

আর এক বাণী পাঠালেন ব্রহ্ম-বাসী ভারতীয়দের ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের কাছে—এই বাণীতে ওদের সদয় ব্যবহার ও বিপুল আত্মত্যাগের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। নেতাজী তাঁহার রেঙ্গুন ত্যাগের সময় যে কি অসীম করুণা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা' ভাব্‌লেও মুগ্ধ হ'তে হয়। এই সময়ে নেতাজী ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয় ও বর্ম্মী সুহৃদ্‌দের উদ্দেশ্যে যে বাণী দিয়েছিলেন তাহা এই—

"ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—আজ আমি ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ ক'রছি। স্বাধীনতা-সমরের প্রথম পর্ব্বে

আমাদের পরাজয় হ'য়েছে বটে কিন্তু আমি জানি এ শুধু প্রথম পর্ব্ব—আরও অনেক যুদ্ধ আমাদের বাকী আছে। সুতরাং প্রথম পর্ব্বে হারাতে আমাদের হতোদ্যম হবার কোন কারণ নেই।

ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসিগণ,—আপনারা যে ভাবে আপনাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য-সম্পাদন ক'রেছেন তা' দেখে বিশ্ববাসী মুগ্ধ হ'য়েছে। আপনারা মুক্তহস্তে আপনাদের ধন, জন ও সম্পত্তি দিয়েছেন। সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে সত্যই দুর্ল্ভ। কিন্তু আমাদের ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল, তাই ব্রহ্মযুদ্ধে সাময়িকভাবে আমাদের পরাজয় ঘ'টেছে।

আপনাদের আত্মত্যাগের কথা—বিশেষ ক'রে ব্রহ্মে যখন আমি আমার হেড্ কোয়ার্টার্স নিয়ে আসি তখন থেকে আপনারা যা দেখিয়েছেন সে কথা আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মনোবল কিছুতেই দমাতে পারে না। মাতৃভূমির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন জানাই—আপনারা উন্নত শিরে, অদম্য উৎসাহে সেই শুভদিনের অপেক্ষা করুন—যেদিন আপনারা পুনরায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রবার সুযোগ পাবেন।"

ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের নাম তার মধ্যে বিশেষ সম্মানের স্থান লাভ ক'রবে।

ব্রহ্মদেশ আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ কর্‌ছি না। এখান থেকে আপনাদের সঙ্গে সাময়িক পরাজয়ের দুঃখ সমভাবে ভোগ কর্‌বার ইচ্ছাই বরং আমার ছিল কিন্তু আমার মন্ত্রীমণ্ডলী এবং ঊর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারীদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভারত-স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাবার জন্যই আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ ক'রতে হচ্ছে।

আমি চিরকাল আশাবাদী—সুতরাং অচিরেই যে ভারত স্বাধীনতা লাভ ক'রবে—আমার এই অটুট বিশ্বাস বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি এবং আপনারাও ঐ আশা হৃদয়ে পোষণ করুন—এই আমার প্রার্থনা।

আমি সব সময়ই ব'লে এসেছি—রাত্রের গভীরতম অন্ধকারের পরেই ঊষার আলো দেখা দেয়। আমরা এখন গভীরতম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চ'লেছি, তাই প্রভাতেরও আর বিলম্ব নেই। **ভারত স্বাধীন হবেই।**

আমার বক্তব্যের উপসংহারে ব্রহ্ম সরকার এবং ব্রহ্মবাসীদের আর একবার আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পার্‌ছি না—ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এরা আমাকে প্রভূত সাহায্য ক'রেছেন। এমন একদিন আস্‌বে যেদিন স্বাধীন ভারত মুক্তহস্তে এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ ক'রবে।"

* * * *

"আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর অফিসার ও সৈন্যগণ!

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে যে ব্রহ্মদেশে আপনারা অতুলনীয় বীরত্বের সহিত সংগ্রাম ক'রেছেন এবং এখনও

ক'রছেন—সেই ব্রহ্মদেশ আমি বেদনার্ত্ত হৃদয়ে ছেড়ে যাচ্ছি। ইম্ফল এবং ব্রহ্মে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম পর্ব্বে আমরা হেরেছি কিন্তু এ শুধু প্রথম পর্ব্বই। আমাদের এখনও অনেক পর্ব্ব ল'ড়তে বাকি আছে। আমি আজন্ম আশাবাদী—সুতরাং কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজী নই। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ইম্ফলের সমতলভূমিতে, আরাকানের পর্ব্বতে ও জঙ্গলে এবং ব্রহ্মের তৈলখনি-অঞ্চলে ও অন্যান্য প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা যে বীরত্ব দেখিয়েছেন ইতিহাসে তা' চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে।

সঙ্গিগণ,—আজকার এই মহা-সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমি আপনাদিগকে আব একটি মাত্র আদেশ দিতে চাই এবং আমার সেই আদেশ এই—আপনাদের যখন সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার ক'রতে হচ্ছে তখন আপনারা বীরের ন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে মস্তক নত করুন। আপনাদের বিরাট আত্মত্যাগের ফলে যারা ভবিষ্যতে পরাধীন দাসরূপে নয়, স্বাধীন মানবরূপে এই ভারতে জন্মাবে তারা আপনাদের স্মৃতিকে পরম শ্রদ্ধা জানাবে এবং জগদ্বাসীর কাছে সগর্ব্বে ঘোষণা ক'রবে যে তা'দেরই পূর্ব্বপুরুষগণ মণিপুর, আসাম ও ব্রহ্মদেশে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রে পরাজয় স্বীকার ক'রেছিলেন বটে কিন্তু এই সাময়িক পরাজয়েতেই তাঁরা ভবিষ্যৎ সাফল্য ও গৌরবের ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় আমার অটল বিশ্বাস সম্পূর্ণ

অটুট র'য়েছে, আপনাদের হাতেই আমি ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা, জাতীয় সম্মান, ভারতীয় যোদ্ধার বীরত্বের খ্যাতি সব কিছু বহন ক'রবার ভার একান্ত ভরসায় নিশ্চিন্তে অর্পণ কর্‌ছি। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ভারতের মুক্তি ফৌজের অগ্রদূত আপনারা দেশের সম্মানের জন্য আপনাদের সব কিছু এমন কি নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রে এমন উচ্চ আদর্শ স্থাপন ক'রবেন—যে আদর্শ অন্যত্র যুদ্ধরত আপনাদের সঙ্গীদের সর্ব্বকালে অনুপ্রাণিত ক'রবে। নিজের ইচ্ছামত চ'লতে পেলে আমি এইখানে আপনাদের সঙ্গে বিপদের মধ্যে থেকে সাময়িক পরাজয়ের তিক্ত ফল আপনাদের সাথে সমভাবে ভোগ ক'রতাম—কিন্তু আমার মন্ত্রীমণ্ডলী ও উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম ত্যাগ ক'রে যেতে হ'চ্ছে। পূর্ব্ব-এশিয়া ও স্বদেশবাসী ভারতীয়দের মনোভাব আমি জানি এবং জানি ব'লেই আমি আপনাদের আশ্বাস দিয়ে বল্‌ছি—আপনাদের দুঃখ-কষ্ট ও আত্মত্যাগ কিছুই বৃথা যাবে না, তাঁরা সর্ব্বাবস্থাতেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাতে থাক্‌বেন। আমার সম্বন্ধে আমি শুধু এই কথা ব'লতে চাই—১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে ৩৮ কোটি দেশবাসীর মঙ্গল-কল্পে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রব ব'লে আমি যে শপথ গ্রহণ ক'রেছি তা' আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রব। উপসংহারে আপনাদের কাছে আমার এই

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারাও আমার মত আশাবাদী হ'ন—আমার মত বিশ্বাস করুন—গভীর অন্ধকারের পরেই দেখা দেয় উষার অরুণ আলো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই—এবং অচিরেই হবে।

ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ।

(স্বাঃ) সুভাষচন্দ্র বসু
সর্ব্বাধিনায়ক,
আজাদ হিন্দ ফৌজ।

তারিখ : ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫

২৪শে এপ্রিল রাত্রি দশটায় পনরখানি লরীতে ক'রে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়—আর ছ'খানা মোটর গাড়ীতে যান নেতাজীর হেড্ কোয়ার্টার্সের কর্ম্মচারিগণ। "জানবাজ"-এর (Janbaj) ৬০০ সৈনিককে মেজর পি, এস্, রাতুরির অধীনে মার্চ্চ ক'রে ব্যাঙ্ককে যেতে আদেশ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৫০০০ হাজার সৈন্য মেজর জেনারেল এ, ডি, লোগনাথনের অধীনে রেঙ্গুনেই রেখে দেওয়া হয়। রেঙ্গুনের অসামরিক ভারতীয়দের ধন-প্রাণ, সম্মান রক্ষা ক'রবার ভার এদের দেওয়া হয়। এরূপ ক'রবার প্রয়োজনও তখন খুব ছিল—কারণ বর্ম্মী সৈন্যদল তখন বিদ্রোহী এবং জাপানী সৈন্য ও পুলিশ তখন ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হ'য়েছে। রেঙ্গুনে তখন আইন-শৃঙ্খলা কিছুই ছিল না। এই রকম সময়ে বর্ম্মী ডাকাতেরা অসামরিক

ভারতীয় অধিবাসিদের ধন-সম্পত্তি লুঠ ও নারীধর্ষণ ইত্যাদি করে। এই সব নিবারণ ক'রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখ্বার জন্য আজাদ হিন্দের একদল শক্তিশালী সৈন্য নেতাজী রেঙ্গুনে রেখে যান। এই কর্ত্তব্যটি আমাদের দলের সৈন্যরা বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পালন ক'রেছে—বিশেষ ক'রে লেফ্‌ট, কর্ণেল জীবন সিং-এর অধীনস্থ বাহিনী যা ক'রেছে তার জন্য বর্ম্মী ও অসামরিক ভারতীয়েরা উভয়েই চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বে।

২৫শে এপ্রিল সকাল প্রায় ৬টার কাছাকাছি নেতাজীর দলবল রেঙ্গুন-মৌলমিন সড়কের উপর পেগুর উত্তরে ছোট্ট একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই নৈশ-যাত্রা নেতাজীর পক্ষে অত্যন্ত বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। জাপানীরা এর আগেই ওখান থেকে চ'লে গেছে—এদিকে সড়কের উপর বর্ম্মী গেরিলাদের উপদ্রবের অন্ত নেই, সুযোগ পেলেই তারা যানবাহনের উপর গুলি চালায়। সৌভাগ্যের বিষয় নেতাজীর দলের কোন বিঘ্ন হয় নি। এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদাই তাঁ'র অসাধারণ সৌভাগ্যের পরিচয় পেয়েছি। পরদিনই ব্রিটিশেরা পেগু অধিকার করে। আগেকার রাত্রে যদি তিনি ঐ স্থান অতিক্রম ক'রে না যেতেন তা' হ'লে হয় তিনি নিহত হ'তেন—না হয় হ'তেন বন্দী।

এই ঘটনাবহুল পথযাত্রার বাকী বিবরণ ঝাঁসির-রাণী ডিটাচ্‌মেণ্টের কম্যাণ্ডার লেফ্‌ট, কুমারী জানকী থিবার্স (Thevers) তাঁর রোজনামচায় বিশদ্‌ভাবে যা লিখেছেন তা' নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল—

২৫শে এপ্রিল: গত রাত্রে নেতাজী একটুও বিশ্রাম ক'রতে পারেন নি। কে কোন্ লরীতে যাবে তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা করেন—তা' ছাড়া কখন কি ভাবে লরীগুলি যাত্রা ক'রবে তার নির্দ্দেশ দেন। সমস্ত পথেই বার বার তিনি লরীগুলি গণনা ক'রে হিসাব ক'রে দেখেছেন।...আজ আবার খুব ভোরে উঠেই তিনি লরীগুলির কোন্টা কোথায় থাক্বে এবং সৈন্যদলগুলির কে কোথায় অবস্থান ক'রবে তার নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মী! সব কিছু খুঁটিনাটির হিসাব নিচ্ছেন তিনি। এই সব শেষ ক'রে তিনি এক পেয়ালা চা খেতে গেলেন।......না ঘুমিয়ে চোখ ছু'টি তাঁর লাল হ'য়ে উঠেছে কিন্তু তবু তাঁকে একটুও ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। এরপর নেতাজী সব দলকে খাবার পাঠালেন এবং নিজে গিয়ে যারা যেখানে ছিল সব স্থান পরিদর্শন ক'রে এলেন। নেতাজী আজ একেবারে বে-পরোয়া হ'য়ে উঠেছেন। আমাদের মাথার উপর শত্রুপক্ষের বহু জঙ্গীবিমান ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু নেতাজী সেগুলি দেখেও দেখ্ছেন না। আমি সব সময় নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্ছি—আমি তাঁর দেখাশুনা ক'রবই। ...আমরা এখন কর্ণেল মল্লিকের এলাকায় এসেছি—নেতাজী এখানে একটু বিশ্রাম ক'রবার জন্য বস্লেন, তারপর তিনি দাড়ি কামাতে সুরু ক'রলেন—হঠাৎ শত্রুপক্ষের তিনটি জঙ্গীবিমান এসে আমরা যেখানে ব'সেছিলাম সেখানকার গাছের উপর চক্র দিতে আরম্ভ ক'রলে। আমরা সবাই আত্মরক্ষার জন্য পরিখার ভিতর ঢুকলাম...নেতাজী দাড়ি

কামাচ্ছেন—তিনি কিছুতেই পরিখায় ঢুক্‌লেন না। সৌভাগ্যের বিষয় বিমানগুলি আমাদিগকে দেখ্‌তে পায় নি—তাই গুলি না ছুঁড়েই চ'লে গেল। এরপর নেতাজী মেয়েরা যেখানে বিশ্রাম ক'রছে সেই জায়গা পরিদর্শন করা স্থির ক'রলেন। আমরা খোলা মাঠে ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম—এমন সময় শত্রুপক্ষের ৬ খানা জঙ্গীবিমান দেখা দিল। আমি নেতাজীকে নীচু হ'য়ে আশ্রয় নিতে বল্‌লাম কিন্তু কি ক'রে হবে, সেখানে ত কোন পরিখা নেই। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম—শত্রু-বিমানের জন্য নয়, নেতাজীর নিরাপত্তার জন্যে। শত্রুবিমান আস্‌তে দেখে নেতাজী ব'সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান ক'রতে সুরু ক'রলেন।···বিমানগুলি আমাদের দেখ্‌তে না পেয়ে চ'লে গেল।···বারম্বার তিনি আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পেয়ে যান। এ কি ক'রে হয়? বুঝি না এ যাদু না মন্ত্রশক্তি! ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের নেতাজীর কোন বিপদ্ হ'তে পারে না। এখন বেলা প্রায় ৪টা। নেতাজী একটু ঘুমিয়ে উঠে একটা মানচিত্র নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখ্‌লেন। এরপর তিনি একজন ষ্টাফ্ অফিসারকে ডেকে একটি মোটর সাইকেল আরোহীকে জানবাজ (Janbaj) বাহিনীর কাছে পাঠাতে বল্‌লেন: তা'দের জানাতে হবে তারা যেন সড়ক ছেড়ে রেলওয়ে লাইন ধ'রে আসে—কারণ, ওখানে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক-বাহিনী এসে প'ড়বার আশঙ্কা আছে।···হুকুমটা তিনি ঠিক সময়েই দিয়েছিলেন—কারণ, কর্ণেল রাতুরির কাছে

আমি শুনেছি যে ঐ বাহিনীটি সড়ক ছেড়ে আস্‌বার কয়েক মিনিট পরেই ওখানে শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্ক-বাহিনী এসে পড়ে। ...আমাদের সৈন্যরা একটুর জন্য রক্ষা পেয়ে যায়।... এই বিপদের আশঙ্কার কথা নেতাজী কি আগেই মনে মনে জান্‌তে পেরেছিলেন?...সন্ধ্যা ৬টার কাছাকাছি আমরা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হুকুম পেলাম। নেতাজী কেবল এদিক ওদিক ছুট্‌ছেন...খুব জোরে বৃষ্টি হ'চ্ছে। নেতাজী সম্পূর্ণ ভিজে গেছেন।.. এইবার আমাদের লরী ও গাড়ীগুলি রাস্তায় ঠিকমত চ'লতে স্থুরু ক'রল। জাপানীদেরও শত শত লরী ওয়া-র (Waw) দিকে ছুট্‌ছে—বৃটিশ ট্যাঙ্কের হাতে পড়্‌বার আগেই তারা সিত্তাঙ নদী পার হ'তে চায়।... রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয়...নেতাজীর গাড়ী হ'ড়কে ৮ ফুট গভীর একটা গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে গেল—কিন্তু ভগবান্‌কে অশেষ ধন্যবাদ, তাঁর কোন আঘাত লাগে নি। গাড়ীটা এইখাঁনেই আমাদের রেখে যেতে হ'ল। অবশেষে রাত্রি প্রায় ২টার সময় আমরা ওয়ায় পৌঁছলাম।

২৬শে এপ্রিল : ওয়া নদীর উপর কোন সেতু নেই—খেয়া নৌকায় আমাদের নদী পার হ'তে হবে। খেয়াগুলি জাপানীরাই সব ব্যবহার ক'রছে—আমাদের জন্য মাত্র একটি খেয়া নৌকার ব্যবস্থা আছে।...নেতাজীর ষ্টাফের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাপানী জেনারেল ইসোডা (Isoda) এসে নেতাজীকেই প্রথমে নদী পার হ'তে বলেন—আর সবাই পরে পার হবে। নেতাজী বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"যা তা' বক্‌বেন

না, মেয়েরা সবাই নদী পার না হ'লে আমি ওপারে যাচ্ছি না।" কর্ণেল মল্লিক ও মেজর স্বামী নদীটি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ্‌লেন এক জায়গায় নদীর জল ৬ ফুট মাত্র গভীর···আমি সব মেয়েদের ঐখানে মার্চ্চ ক'রে গিয়ে সাঁত্‌রে নদী পার হ'তে আদেশ ক'রলাম। রাইফেল হাতে নিয়ে তারা সবাই তাই ক'রলে।···নেতাজী নিজে খেয়াতে লরী পার করাচ্ছেন ···মেয়েরা সবাই নদী পার হ'য়ে গেছে। নদী পার হবার সময় ওদের কেহ কেহ ডুবে যাচ্ছিল কিন্তু কর্ণেল মল্লিকের সুদীর্ঘ দেহকে ধন্যবাদ, তিনিই তা'দের রক্ষা ক'রেছেন। এখন প্রায় ভোর হ'য়েছে, নেতাজীর জন্য আমাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা হ'চ্ছে—তিনি এখনও নদীর অপর পারে র'য়েছেন। যে কোন মুহূর্ত্তে শত্রুবিমান এসে যেতে পারে।···এইবার নেতাজী শেষ খেয়ায় নদী পার হ'য়ে এলেন। সারা রাত্রি চেষ্টা ক'রে দু'খানি লরীকে তিনি নদীপার ক'রেছেন। অন্য লরীগুলিকে দিনের বেলায় নদীর ওপারেই ফেলে রাখ্‌তে হবে--কারণ দিনের আলোতে শত্রুবিমানের ভয়ে লরী ত ভাল, কোন লোককেও নদী পার করা সম্ভব নয়। লরীগুলি যাঁর হেফাজতে আছে তাঁকে নেতাজী যথোচিত নির্দ্দেশ দিয়ে এসেছেন।

২৬শে এপ্রিল : আমরা নেতাজীর জন্য একটু চা তৈরী ক'রেছি। তিনি এলে তাঁকে একটু বিশ্রাম ক'রে চা খেতে বল্‌লাম। কিন্তু নেতাজীর বিশ্রাম ক'রবার সময় কই—তাড়াতাড়ি তিনি চা-পান শেষ ক'রে লরীগুলি ঠিক মত

লুকিয়ে ডালপালা দিয়ে ঢেকে শত্রুদৃষ্টি এড়ানোর মত ক'রে রাখা হ'য়েছে কি না তাই দেখ্‌তে ছুট্‌লেন। আজও নেতাজী কোন্ বাহিনী কোথায় গিয়ে থাক্‌বে তার নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন। তাঁর ক্লান্তি নেই···ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের থাক্‌বার জন্য তিনি একটি ছোট গ্রাম নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন—এইখানেই তারা সারাদিন কাটাবে। গ্রামটি নদীর অতি নিকটে, সেইজন্য সেখানে থাকা খুব বিপজ্জনক ; শত্রু-বিমান এ গ্রাম খুঁজে দেখ্‌বেই।···কোন পরিখাও এখানে নেই···গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।·· যাই হ'ক—আমাদের ভাগ্যে যা থাকে ঘট্‌বে। একটু আশার কথা—গ্রামে অনেক গাছপালা আছে। আমরা ওর নীচে আশ্রয় নিতে পারি এবং শত্রু-বিমান যদি আমাদের না দেখ্‌তে পায় ত আমরা বেঁচে যাব। বেলা প্রায় ৩টার সময় ৬খানা ব্রিটিশ জঙ্গীবিমান এসে আমাদের মাথার উপর চক্র দিতে সুরু ক'রলে। আমরা সবাই গাছের গুড়ির আড়ালে আশ্রয় নিলাম। পাশেই কামানের গোলার ঘায়ে একটা ছোট গর্ত্ত হ'য়েছিল—জেনারেল চ্যাটার্জ্জি নেতাজীকে তার মাঝে আশ্রয় নিতে বল্‌লেন। নেতাজী এতে রেগে গিয়ে বল্‌লেন—"মেয়েরা লুকোবার জায়গা পাচ্ছে না, আর আমি গিয়ে এর মাঝে আশ্রয় নেব ?" নেতাজী সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেতে লাগ্‌লেন। ভীষণ বিপদের সময়ও নেতাজীর এই রকম ধীর-স্থির আচরণ দেখে আমরা উৎসাহ ও প্রেরণা পাই।···

শত্রু-বিমানগুলি আধ ঘণ্টা ধ'রে আমাদের এলাকার উপর আক্রমণ চালায়। আমাদের পাঁচখানা লরী পুড়ে নষ্ট হ'য়ে গেল। যানবাহন আমাদের অতি সামান্যই রইল।...আর কি ভয়ঙ্কর মেশিনগান চালিয়েছে ওরা আজ, আমাদের মাথার পাশ দিয়ে মেশিনগানের গুলি তীব্র শব্দে ছুটে গেছে। আত্মরক্ষার জন্য নেতাজী কোনরূপ আবরণের আড়ালে গেলেন না, তবু যে কি ক'রে আজ অক্ষত-দেহে রক্ষা পেলেন, এ একটা অলৌকিক ব্যাপার।

২৭শে এপ্রিল: দুপুর রাত্রির একটু পরেই আমাদের গাড়ীগুলি চল্‌তে সুরু ক'রলে। কিন্তু বৃষ্টিতে পথে কাদা হওয়ায় আমাদের গাড়ীর চাকা তা'তে আট্‌কে যাচ্ছিল—তাই আমরা আর বেশী পথ এগুতে পার্‌ছিলাম না। নেতাজী লরী ও গাড়ীগুলি কর্ণেল চোপড়ার তত্ত্বাবধানে রেখে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে সিত্তাঙ নদী পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ১০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে চল্‌লেন। শুনা গেল—শত্রুদল দ্রুতগতিতে আমাদের ধাওয়া ক'রছে। সিতাঙ নদী পার হ'তে পার্‌লে অবশ্য আমরা সাময়িকভাবে নিরাপদ মনে ক'রতে পারি। নদীর পূর্ব্বতীরে শক্তিশালী জাপানী সৈন্যদল আত্মরক্ষা-ব্যূহ রচনা ক'রছে। ভোর হবার ঠিক আগেই আমরা নদী পার হ'লাম। সিত্তাঙের খেয়াঘাটে আমাদের যানবাহনগুলিও খুব ভোরেই এসে গেছে। আজ আবার নেতাজীর হেড্‌ কোয়ার্টার্সের উপরে শত্রুদল বোমা ও মেশিনগান চালিয়েছে। লেফ্‌ট, নাজির আহম্মদ

নেতাজীর নিকটেই একটা পরিখায় ঢুক্‌তে যাবার সময় নিহত হ'য়েছেন।

খেয়ায় একটা লরী এবং নেতাজীর মোটরগাড়ী মাত্র পার করা গেছে, আর সবই ওপারে র'য়ে গেছে। জাপানীদেরও হাজার হাজার লরী ওপারে রইল। শত্রুবিমান-বাহিনী ওগুলি সব পুড়িয়ে দিচ্ছে।

এখন থেকে আমাদের কেবল পায়ে হেঁটে যেতে হবে। পথে প্রায় হাঁটু সমান কাদা—ভারী গাড়ীর চলাচলে সে কাদা অবিরত মথিত হচ্ছে।...আমার দলের মেয়েরা বাহাদুর—তারা প্রত্যেকেই যার যার রসদ, রাইফেল, গুলীবারুদ, হাতবোমা সব জিনিসই নিজেরাই বহন ক'রে নিয়ে চ'লেছে।...আমাদের পথ চলা শুধু ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে নয়,—পথে অসংখ্য শত্রু গেরিলা হানা দিচ্ছে—আমরা সব সময়ই তা'দের সঙ্গে লড়্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে চ'লেছি। প্রত্যেক মেয়েই প্রায় ১৭ সের মাল ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। নেতাজীও দলের আগে আগে নিজের মালপত্র নিজেই ব'য়ে নিয়ে চ'লেছেন। সমস্ত রাত্রি চ'লে সেই রাত্রে আমরা ১০ মাইল পথ অতিক্রম করি।

২৮শে এপ্রিল: আজ সকালে আমরা একটা গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে আজকের মত আশ্রয় নিয়েছি। জানবাজ দলও এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে।...এখন আমরা সংখ্যায় প্রায় ১০০০। সন্ধ্যাকালে আবার এখান থেকে যাত্রা ক'রে রাত্রে আমরা প্রায় ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করি।.. এ বড় কষ্টের পথ চলা—আমরা এক রকম নিশাচর হ'য়ে উঠেছি। আমাদের যত

পথ চলা আমরা রাত্রে করি এবং দিনের বেলায় বিশ্রাম করি। রাত্রে এই রকম কাজ করা আমাদের আগেই শেখানো হ'য়েছিল তাই রক্ষা—সেই শিক্ষাগুণে রাত্রে পথ চ'লতে আমাদের কোন অসুবিধা বোধ হ'চ্ছে না।

২৯শে এপ্রিল : আজ আমরা বিশ্রাম ক'রছি। আজ আর পথ চলা নেই ব'লে নেতাজীকে বল্‌লাম—"ভারী বুট জোড়া খুলে পা দু'টোকে আজ একটু বিশ্রাম দিন—আর মোজা জোড়া খুলে দিন—আমি একবার ধুয়ে দিই।" নেতাজী জুতো ও মোজা খুলে ফেল্‌তেই দেখি তাঁর সমস্ত পা ফোস্কায় ভরা। নেতাজীর গাড়ী আমাদের পিছু পিছু আস্‌ছিল কিন্তু তিনি হেঁটেই চ'লেছেন। আমরা তাঁকে গাড়ীতে যাবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি ক'রেছি, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা' শুন্‌লেন না। সন্ধ্যাকালে আবার আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল—নেতাজী পূর্ব্বের মত আমাদের দলের আগে আগে চ'লতে লাগলেন এবং তাঁর সারা পায়ে ফোস্কা থাকা সত্ত্বেও সে রাত্রে আমরা ১৫ মাইল পথ অতিক্রম ক'রলাম। নেতাজীর সঙ্গে যে জাপানী জেনারেল আস্‌ছিলেন তিনি নেতাজীকে মোটরে যেতে বল্‌লেন, কিন্তু নেতাজী তা'তে রাজী হ'লেন না। এরপর জাপানীরা নিজেদের গাড়ীতে চ'ড়ে মৌলমিনের দিকে ছুট্‌ল।...আজ রাত্রে আমাদের কয়েকটা নদী খেয়ায় পার হ'তে হ'য়েছে। জানবাজ দল আজ নদী পার হ'তে পারে নি—তারা এখনও অনেক দূরে—'বিলিনে'র অপর পারে র'য়েছে। নেতাজী

তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রবেন ঠিক ক'রলেন। সন্ধ্যাকালে লিয়েজং ডিপার্টমেণ্টের জেনারেল ইসোডা (Isoda) মৌলমিন থেকে কতকগুলি লরী নিয়ে এসে নেতাজীকে বল্‌লেন—"ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে আপনি এই মোটর লরী ক'রে যান—জানবাজ দল পায়ে হেঁটে যাবে।"

এই কথায় নেতাজী জাপানীটির উপর বিরক্ত হ'লেন। তাঁর মনে হচ্ছিল জাপানীরা তাঁকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা ক'রছে : তিনি যদি একবার সৈন্যদের পিছনে রেখে যান তা'হলে জাপানীদের কর্তৃত্বে চালিত খেয়ায় পরে তা'দের পার হওয়া অসম্ভব হবে। আমাদের সঙ্গে হাজার হাজার জাপানীরাও পশ্চাদপসরণ ক'রছিল, নেতাজী আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব'লেই নদী পারের সুযোগ আগে আমাদের দেওয়া হচ্ছিল।

জাপানী জেনারেল আবার এসে নেতাজীকে মোটরে যেতে অনুরোধ ক'রলেন।

নেতাজী এবার উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লেন—"আপনি কি আমাকে ব্রহ্মদেশের 'বাম' (Ba Maw) পেয়েছেন যে নিজের লোকজন ফেলে নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি ছুটে পালাব? আমি আপনাকে অনেকবার ব'লেছি আমাদের লোকজন আগে না গেলে আমি কিছুতেই যাব না।" এই কথা শুনে জাপানী জেনারেল সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। জাপানীদের হাঁটতে গেলে একেবারে গায়ে জ্বর আসে—অথচ নেতাজী হাঁটলে তা'দেরও হাঁটতে হয়।

আজ রাত্রে আমরা আরও ১৫ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ৩০শে এপ্রিল ভোরে মৌলমিনের কাছাকাছি ছোট একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হই।

১লা মে: পরদিন সকাল বেলা আমরা মৌলমিনে পৌঁছি। এই ছয় দিন পথ চল্‌বার সময় নেতাজী দৈনিক ছু'ঘণ্টার বেশী ঘুমুতে পান নি। রাত্রে আমরা পথ চলেছি, কিন্তু দিনের বেলায় এক নেতাজী ছাড়া আর সবাই আমরা বিশ্রাম ক'রেছি। তিনি সারাদিন আমাদের কিসে সুখ-সুবিধা হবে—তাই দেখে বেড়িয়েছেন।

মৌলমিন পৌঁছেও নেতাজীর বিশ্রাম নেই। তিনি কি এক দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কাজ ক'রে চ'লেছেন। তিনি আমাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত ক'রতে ব্যস্ত। ছ'দিন অর্দ্ধাহারের পর আমাদের জন্য খুব ভাল খাবারের ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কিন্তু পথশ্রমে আমরা এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম যে, এক রকম কিছুই খেতে পার্‌লাম না।

আজ ১লা।২রা মে রাত্রে নেতাজী সব মেয়েদেরই মৌলমিন থেকে ব্যাঙ্ককে যাবার ট্রেনের ব্যবস্থা ক'রেছেন। নেতাজী ঠিক ক'রেছেন—জেনারেল চ্যাটার্জ্জি ও কর্ণেল এস্, এ, মল্লিক আমাদের সঙ্গে যাবেন। জানবাজ দলটিকে স্থানান্তরিত ক'রার জন্য তিনি নিজে মৌলমিনে রইলেন। ট্রেনে যাবার সময় কয়েকখানা মাল-গাড়ীতে আমাদের ঠেসে বোঝাই করা হ'ল্। যাই হ'ক—কাদায় পায়ে হেঁটে চলার চেয়ে এ

ঢের ভাল হ'ল। আমাদের ট্রেন অনেক রাত্রে মৌলমিন ত্যাগ ক'রলে।

২রা মে : রাত্রি প্রায় একটার সময় আন্দাজ ২০ মাইল যাবার পর আমাদের গাড়ী হঠাৎ থেমে গেল। শুন্‌লাম—মার্কিন বোমারুবিমান নাকি এইখানকার একটা সেতু উড়িয়ে দিয়েছে। মনে হ'তে লাগ্‌ল—কি জঘন্য এরা : কেবল গোলা-বারুদের জোরেই এরা যুদ্ধ জয় ক'রছে। জেনারেল চ্যাটার্জ্জি জাপানীদের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে আরও সংবাদ সংগ্রহ ক'রতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এলেন—ওদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। ওরা আমাদের ভাষা বোঝে না—আমরাও ওদের ভাষা বুঝি না। আমাদের জাপানী দোভাষী নেতাজীর সঙ্গে মৌলমিনে র'য়ে গেছেন। বুঝ্‌লাম—পরের রেল ষ্টেশনে পৌঁছতে আমাদের ১৬ মাইল পথ হাঁটতে হবে। রাত্রি প্রায় ২টার সময় আমরা হাঁটা শুরু ক'রলাম। পথে কর্ণেল মল্লিক কোন রকমে তিনখানা গরুর গাড়ী ভাড়া ক'রলেন। তাঁর উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসা ক'রতে হয়। আমাদের মালপত্রগুলি গরুর গাড়ীর উপর চাপিয়ে আমরা বাঁচ্‌লাম। আমার কাঁধ একেবারে ব্যথা হ'য়ে গেছে, চামড়ার দলগুলি আমার কাঁধে কেটে বসে গেছে—বোঝা না থাক্‌লে আমরা যতদূর হোক্ না কেন হাঁটতে পারি। সারারাত পথ চলে ভোরে আমরা ষ্টেশনে পৌঁছলাম।

৩রা মে : সারাদিন আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছাকাছি

কাটালাম। ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমানগুলি যেন আকাশের সব যায়গাতেই আছে মনে হ'চ্ছে। এ ছোট ষ্টেশনটিকেও তারা রেহাই দেয় নি। কিন্তু জাপানীরাও কম হুঁসিয়ার নয়। ভোর হবার অনেক আগেই তারা মালগাড়ীগুলি (wagon) এঞ্জিন থেকে খুলে লাইনের এধারে ওধারে ছড়িয়ে রাখ্‌লে—দেখলে যাতে মনে হয়—শত্রুবিমান ট্রেনখানা ধ্বংস ক'রে দিয়ে গেছে।

রেলগাড়ীর তা'দের বিশেষ অভাব হ'য়ে প'ড়েছে—বিশেষ ক'রে রেলওয়ে এঞ্জিনের। মালয় ও শ্যামে তারা যত রেলওয়ে এঞ্জিন পেয়েছে এখানে এনে ফেলেছে। এঞ্জিনগুলি তারা খুব সাবধানভাবে লুকিয়ে রাখে।

জায়গায় জায়গায় তারা পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে তার মধ্যে এঞ্জিন লুকিয়ে রেখেছে। কোথাও বা রেলওয়ে লাইনের উপর বাঁশের ছাউনি ক'রে এঞ্জিন ঢেকে রেখেছে। এই রকম ছাউনি এক জায়গায় নয়, বহু জায়গায় আছে এবং এঞ্জিন অবিরত এক ছাউনি থেকে অন্য ছাউনিতে সরানো হ'চ্ছে। এই ছাউনিগুলি যাতে আকাশ থেকে অদৃশ্য থাকে তার খুব ভাল ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল, তবুও ব্রিটিশ বিমানগুলি তা'দের ধ'রে ফে'লে অনেক যায়গায় নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

৩রা মে সন্ধ্যাকালে আমরা আবার ট্রেনে উঠি এবং তিন দিন পর ব্যাঙ্ককে পৌঁছি ;—শত্রু-বোমারু-বিমানের আক্রমণে বহু স্থানে রেল-লাইন ও সেতু নষ্ট হওয়ায় অনেক জায়গায় আমাদের গাড়ী বদ্‌লাতে হয়। এই তিন দিনে নেতাজী

দুইবার এসে আমাদের দেখে যান— তিনি নিজে মোটরে ঘুরে জানবাজ দল ও আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা সংযোগ রেখেছেন। ৭ই মে সকালে আমরা ব্যাঙ্ককে গিয়ে পৌঁছি। নেতাজী আমাদের একদিন আগে এখানে এসে গেছেন। এখানে এসেই তিনি আমাদের আহার, বাসস্থান, জামা-কাপড়, দুধ, ফল ইত্যাদির সুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছেন। পরদিন জানবাজ দলও এসে গেল। দীর্ঘপথ তা'দের পায়ে হেঁটে আসতে হ'য়েছে। বস্তুতঃ ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম থেকে তারা এই ভাবে পথ চ'লে এসেছে। তা'দের অধিকাংশই সুভাষ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের লোক—কালাদন উপত্যকায় মেজর পি, এস্, রাতুরির নেতৃত্বাধীনে তারা যুদ্ধ ক'রেছে। এদের অধিকাংশই ম্যালেরিয়ায় ভুগে অতিশয় দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল আহারের গুণে আমরা আবার কার্য্যক্ষম হ'লাম।

২০শে মে : খবর পেলাম 'X' রেজিমেণ্টের এক হাজার সৈন্য কর্ণেল ঠাকুর সিং-এর নেতৃত্বে বড় বড় পাহাড় ও নিবিড়-জঙ্গল অতিক্রম ক'রে পাপুন ও মৌলমিনের পথে ব্যাঙ্ককে আসছে। আমরা এটা আশা করি নি—কারণ খবর পাওয়া গিয়েছিল 'X' রেজিমেণ্টকে শত্রু-ট্যাঙ্কবাহিনী পিনমানা এলাকায় ধ'রে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের সৈনিকেরা এমন অসাধ্য সাধন ক'রেছে যা সাধারণ সৈনিকের কাছে একেবারে অসম্ভব বলে মনে হবে। তা'দের আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। নেতাজী চার দিন

ধ'রে রোজ প্রায় বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে ভারতীয় স্বাধীনতাসঙ্ঘ ও তাঁহার ষ্টাফ্ অফিসারদের সহযোগিতায় ইহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রলেন।

২৭শে মে: 'X' রেজিমেণ্ট এসে গেছে। তা'দের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অর্দ্ধাহারে তা'দের শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। নেতাজীর কাছে পৌঁছতে তা'দের এক হাজার মাইলের ওপর পায়ে হেঁটে আস্‌তে হ'য়েছে। মার্চ্চের গোড়ায় পিনমানা ত্যাগ ক'রবার পর থেকে সমস্ত সময়টা তা'রা পথ চ'লেছে। নেতাজী তা'দের আহার ও পরিচ্ছদের সুন্দর বন্দোবস্ত ক'রেছেন। ব্রহ্মদেশ থেকে আগত বাহিনীগুলির মেয়ে, পুরুষ প্রত্যেকেই প্রতিদিন আধ সের দুধ ও টাট্‌কা ফল খাচ্ছে। সবারই স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

জুনের প্রথম দিকে নেতাজী ৩নং ডিভিশান পরিদর্শন ক'রতে ব্যাঙ্কক থেকে মালয় যাত্রা করেন। এই ডিভিশানটির নায়ক ছিলেন কর্ণেল জি, আর্, নাগর। শীঘ্রই গুজব শোনা গেল জাপানীরা আত্মসমর্পণের জন্য শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আরম্ভ ক'রেছে। ১১ই আগষ্ট সরকারী ভাবে "জাপানের আত্মসমর্পণের কথা জগতে ঘোষণা করা হ'ল।"

১৯৪৫ সালের জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত নেতাজী মালয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের বাহিনীগুলি পরিদর্শন ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। জুলাই মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা মালয় ও শ্যামে "নেতাজী-সপ্তাহ" পালন

করে। এই সপ্তাহে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কাহিনী চিরস্মরণীয় ক'রতে তাহার শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৪৫ সালের আগষ্টের শেষাশেষি এই মনোরম স্তম্ভটির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। মেজর জেনারেল এম্, জেড্, কিয়ানির ষ্টাফ্ অফিসার কর্ণেল সি, জে, ষ্ট্র্যাচী (C. J. Stracey) অহোরাত্র এর পিছনে খাটতেন এবং তাঁরই চেষ্টার ফলে ব্রিটিশেরা সিঙ্গাপুরে বোমা ফেল্‌বার আগেই এটা শেষ হয়। আজ সবাই জানে যে, যে ইংরাজ জগতে সভ্যতার রক্ষক ব'লে দাবী করে, আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে নিৰ্ম্মিত এই পবিত্র স্তম্ভটি তারাই ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস ক'রেছে। তা'দের আশঙ্কা ছিল এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখে ভারতীয় সৈন্যদের রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে সব বীরেরা অকাতরে নিজেদের জীবন দিয়েছে তা'দের স্মৃতিটা পর্য্যন্ত যাতে মানুষের মন থেকে বিলুপ্ত হয়—এই ছিল তা'দের অভিপ্রায়। ওরা বুঝ্‌তে পেরেছিল—এতদিন মিথ্যা প্রচারের দ্বারা নিজেদের অধীনস্থ ভারতীয় সৈন্যদের মনে যে ব্রিটিশানুগত্য তারা গ'ড়ে তুলেছে—ঐ স্মৃতিস্তম্ভ দেখ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তা' বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু ঐ সব শহীদদের স্মৃতি ভারতীয়দের মন থেকে অত সহজে মুছ্‌বার নয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকেরা যখন বন্দী হ'য়ে আটক ছিল তখন স্থানীয় অসামরিক অধিবাসীরা ঐ স্মৃতি-স্তম্ভের ভগ্নস্তূপে প্রতিদিন গিয়ে নূতন নূতন পুষ্পমাল্য দিয়ে

আস্‌ত। লোকে যাতে এ সব না ক'রতে পারে এইজন্য ব্রিটিশরা সেখানে প্রহরী মোতায়েন ক'রলে। কিন্তু তবু লোকের পুষ্পমাল্য দেওয়া বন্ধ হ'ল না। ভারতীয় প্রহরীদের মন এমন নির্ম্মম হ'তে পারে না যাতে লোকের এ সব কাজে তারা বাধা দিতে পারে। এর ফলে অনেক প্রহরীকে শাস্তি পেতে হ'য়েছে—অনেককে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ ক'রতেও হ'য়েছে। ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন মালয়ে যান তখন তিনিও আজাদ হিন্দ ফৌজের শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভটি যেখানে ছিল, সেই স্থানটিতে গিয়ে পুষ্পমাল্য দিয়ে এসেছেন। পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ লর্ড লুইস্ মাউণ্টব্যাটেন—শোনা যায় তিনিও নাকি এখানে পুষ্পমাল্য দিয়েছেন···ভণ্ডামির চূড়ান্ত নিদর্শন!

সিমলায় যখন বৈঠক চ'ল্‌ছিল নেতাজী তখন কয়েকবার লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁ'র নিজের মত বেতারযোগে ঘোষণা করেন।

১৯৪৫ সালের ১৮ই জুন তারিখে তিনি বেতারে বলেন—

"ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, ১৪ই জুন তারিখে লর্ড ওয়াভেল দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র থেকে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছেন,—তা' আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। ভারতবাসীর জন্য এই উপহারটি আনতেই লর্ড ওয়াভেল লণ্ডনে তীর্থযাত্রা ক'রেছিলেন।

"পূর্ব্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়েরা লর্ড ওয়াভেলের

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কিরূপ বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন— ভারতবাসী ভাইদের কাছে তা' আজ বলা আমার অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। আমরা প্রথমেই দেখ্‌তে পাই লর্ড ওয়াভেল নিজেই স্বীকার ক'রেছেন—ব্রিটিশদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সম্পূর্ণ সাহায্য লাভ করা। ব্রিটিশরা দীর্ঘকাল যুদ্ধ ক'রে আজ ক্লান্ত—যুদ্ধের অবসানে তা'দের বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন, এইজন্যই তা'দের যুদ্ধ ভারতীয়দের কাঁধে চাপিয়ে তারা যা'তে নিশ্চিন্তে বিজয়ের ফল উপভোগ ক'রতে পারে সেইজন্যই তাদের এই চেষ্টা। ব্রিটিশপক্ষীয় ভারতীয় সৈন্যরাও রণক্লান্ত, ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ-মার্কিনদের সাফল্যের পর তারাও বিশ্রাম চায়। সুতরাং ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য এখন তা'দের দেহের শোণিত ও ধনসম্পদ্ ঢেলে দেয়— ইহাই এখন ব্রিটিশদের একান্ত প্রয়োজন। ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারত ব্রহ্ম সীমান্তে যখন যুদ্ধ চ'ল্‌ছিল তখন তারা ভারতীয় সৈন্যদের ধাপ্পা দিয়ে বুঝিয়েছে—ভারতরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা তা'দের কর্ত্তব্য। ব্রিটিশরা এর পরে তা'দের আরও বুঝিয়েছে—ব্রহ্ম-অভিযান ভারত-রক্ষার সংগ্রামেরই একটি বিশেষ অঙ্গ।

"এখন ব্রহ্মসীমান্তের বাইরে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের জন্যও যখন ভারতের সাহায্য ইংরাজের প্রয়োজন তখন সেই সাহায্যলাভের জন্য তা'দের একটা নূতন কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজন হ'য়েছে। এইজন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট

ভারতীয়দের সামনে আজ এই নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত ক'রছে। প্রস্তাবটি মোটেই নূতন নয়—এটি প্রকৃতপক্ষে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সেই পুরাতন প্রস্তাব, মাত্র অল্প পরিবর্ত্তিত নূতন আকারে উপস্থাপিত হ'য়েছে।

"এ প্রস্তাবের উত্তরে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তা' নির্দ্ধারণ ক'রতে গিয়ে আমাদের সর্ব্বপ্রথম দেখা উচিত—ব্রিটেনের হ'য়ে জাপানের সঙ্গে ল'ড়ে আমাদের কি লাভ? নিজের সাম্রাজ্য-প্রসারের জন্য এই যুদ্ধে ইংরাজ যদি জোর ক'রে ভারতের ধনপ্রাণ নিযুক্ত করে সে এক জিনিস—আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা স্বেচ্ছায় যদি ইংরাজের যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে অন্য জিনিস। এই অবস্থায় ব্রিটেনের যুদ্ধে সহযোগিতা করার অর্থ হবে—ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের নৈতিক সংগ্রামে একেবারে পূর্ণচ্ছেদ টানা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতবাসীর পক্ষে এ হবে রাজনৈতিক আত্মহত্যা।

"যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রচারক এবং তা'দের ভারতীয় উত্তর-সাধকগণ ভারতীয়দের ধাপ্পা দিয়ে বোকা বানিয়ে বুঝাতে পার্‌ত—ভারতের নিরাপত্তা আজ বিপন্ন—জাপানীরা ভারতের বহির্দ্বারে এসে হানা দিচ্ছে; কিন্তু এখন পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধ-পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের ব্রিটেনের হ'য়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার আব কোনও কারণ থাক্‌তে পারে না। লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রবার অর্থ ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে স্বেচ্ছায়

ভারতের শোণিত ও অর্থের আহুতিদান; কিন্তু ইহাতে ভারতের কি লাভ? খুব জোর বড়লাটের কর্ম্মপরিষদে কয়েকটি চাকুরি জুটবে।

"আমরা যদি মনে করি এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে আমাদের স্বায়ত্তশাসন লাভ হবে তা হ'লেও আমাদের ভুল হবে—লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ সরকার অবশ্য আমাদের এই কথাই বিশ্বাস ক'রতে বলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভ ক'রবার ইচ্ছা ভারতবর্ষের আর নেই—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত ভারত আর তৃপ্ত হ'তে পার্‌ছে না। তবে যদি কোন ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন পেতে উদ্‌গ্রীব হন তাঁর পক্ষে বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করা অপেক্ষা জাতীয় আন্দোলন চালালেই তা' পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যে মুহূর্ত্তে আমরা ইহা গ্রহণ ক'রব তখনই ইংরেজ মনে ক'রবে—স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা অনেক কিছু কম দিয়েও আমাদের সঙ্গে মিটমাট হ'তে পারে। আমি এ কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি—এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে পূর্ণ স্বাধীনতা ত দূরের কথা—ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসন লাভের সম্ভাবনাও আমাদের থাক্‌বে না। এক কথায় বল্‌তে গেলে এ প্রস্তাব গ্রহণে লাভ আমাদের একটুও হবে না, অথচ লোকসান হবে অনেক বেশী—আর আমাদের দৌর্ব্বল্যের সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন হবে লাভবান্।

"স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এ প্রস্তাবে খুশি হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা দশ; কিন্তু ইংরাজরা ধূর্ত্ত

রাজনীতিবিদ্—এই প্রস্তাব উত্থাপন করার অতিউপযুক্ত সময় তারা নির্ব্বাচন ক'রেছে। তা'দের ধারণা—ব্রিটিশ-মার্কিণ বিজয়ে ভারতীয়েরা ভ'ড়কে গিয়ে ভাবছে—বর্ত্তমান যুদ্ধকালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা আর নেই—সুতরাং যা চাই তা' যখন পাওয়া যাবে না—তখন ব্রিটিশরা খুশি-মনে স্বেচ্ছায় যা দেয় ত'া নেওয়াই ভাল—যথালাভ। নিরাশাবাদী অথবা শ্রীরাজাগোপাল আচারিয়ার প্রমুখ নরমপন্থী রাজনীতিজ্ঞদের মনোভাব এইরূপ হ'তে পারে, কিন্তু আমি বল্‌ব এ ধারণা তাঁ'দের সম্পূর্ণ ভুল এবং অন্যায়—এ গ্রহণ ক'রলে স্বাধীনতার পথে ভারতীয়েরা আরও বহু বৎসর পিছিয়ে পড়বে।

"ইংরেজের এই প্রস্তাবের ভাল দিক্‌টা আমি সংক্ষেপে সমালোচনা ক'রব। একটু মনোযোগ দিয়ে বিচার ক'রলেই বুঝা যায়—১৯৪২ সালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ যে প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন বর্ত্তমান প্রস্তাব মূলতঃ তাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে বড়লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আরও তিনটি আসন আমাদের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে—আসন তিনটি হচ্ছে স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব এবং পররাষ্ট্র; কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য কার্য্যভার যাঁরা গ্রহণ ক'রবেন তাঁ'দের নিয়োগ ক'রবেন স্বয়ং বড়লাট এবং তাঁ'দের কাজের জন্য তাঁরা দায়ী থাকবেন বড়লাটেরই কাছে,—জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কাছে নয়। তা' ছাড়া এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন হ'চ্ছে সমর-সদস্যের (War Member), এ

আসনটি চিহ্নিত থাকবে একজন ইংরাজের জন্য—তিনি হ'লেন ভারতের প্রধান সেনাপতি। একদিকে যেমন বর্ত্তমান প্রস্তাবটি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের পুরাতন প্রস্তাবের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকার মাত্র, অন্য দিকে ইহাতে এমন কতকগুলি বিশেষ আপত্তিজনক বিষয় আছে—যার জন্য ইহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। বড়লাট তাঁর বক্তৃতার মধ্যে স্পষ্ট ক'রে বলেছেন—তিনি কংগ্রেসকে ভারতের অন্যান্য দলের মধ্যে একটি দল বলেই মনে করেন। এইরূপ চাল ইংরাজেরা চিরকালই দিয়ে এসেছে। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের হ'য়ে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেন তখন ইংরেজের মুখে এই রকম কথা শুনে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। এখন কংগ্রেস যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তা' হ'লে চিরকাল সে যা বার বার বলে এসেছে অর্থাৎ কংগ্রেস যে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি সে কথা অস্বীকার করা হবে—আর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বার বার যা বলেছে অর্থাৎ কংগ্রেস ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্যতম সেই কথাই মেনে নেওয়া হবে। আমি ত ভাবতেই পারি না—কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এ প্রস্তাব কি ক'রে গ্রহণ ক'রতে পারেন।

"লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের ভিতর আর একটি অনিষ্টকর জিনিস র'য়েছে। তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ব'লেছেন—তাঁ'র এই প্রস্তাব গৃহীত না হ'লে ১৯৪২ সালের

আন্দোলনকারীদের হাজতেই রাখা হবে। তা' ছাড়া তাঁ'র বক্তৃতার মধ্যে এমন কথা তিনি কোথাও বলেন নি যে, তাঁ'র এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'লে ১৯৩৯ এবং ১৯৪২ সালে যাঁ'দের রাজনৈতিক কারণে বন্দী করা হ'য়েছে তাঁ'দের মুক্তি দেওয়া হবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের এই চিরন্তন রীতি যে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে নির্ব্বিচারে মুক্তি দেওয়া হয়—ভারতবর্ষের বেলাই দেখ্‌ছি এর ব্যতিক্রম।

"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের বল্‌ছেন যুদ্ধস্থিতিকালীন শাসননীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা চ'লবে না, অথচ আমরা দেখ্‌ছি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এখন গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। এখানে এই পূর্ব্ব-এশিয়ায়ই দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। যুদ্ধের মধ্যেই অনেকগুলি নূতন নূতন স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে শাসনশক্তি জনসাধারণের হাতে অর্পিত হ'য়েছে। সুতরাং আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন—ব্রিটিশদের এই যুক্তি একেবারে ভুয়ো—ইহার উদ্দেশ্য, ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবীটা বিলম্বিত ও ব্যর্থ করা। ব্রিটিশরা যদি সত্যিই একটা দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট এখানে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চায় তবে অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা ক'রে তার শাসনভার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া তা'দের উচিত।

"ভারতবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—বহুকাল ধরে বহু কষ্ট আপনারা সহ্য ক'রেছেন, বহু রাজনৈতিক নির্য্যাতন ও ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্রের শোষণ-জনিত দুঃখ আপনাদের ভোগ

ক'রতে হ'য়েছে। আরও কিছুকাল আপনারা এই কষ্ট সহ্য করুন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ্য ও মনোবল সংহত ক'রে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে বাধা দিতে হবে এবং সর্ব্বপ্রধান কাজ হবে স্বাধীনতার প্রতীক আমাদের জাতীয় পতাকাকে উড্ডীয়মান রাখা। এমনি ক'রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যদি আমরা সংগ্রাম চালাই—স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনপ্রকার আপোষ না করি—তা'হলেই জগৎবাসীর মনোযোগ আমাদের স্বাধীনতার দাবীর দিকে আকৃষ্ট হ'তে বাধ্য। ইহাই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ। এর অন্যথা ক'রে ব্রিটিশের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে আমরা জনসমাজে হাস্যাস্পদ হব ও জগতের নৈতিক সহানুভূতি সম্পূর্ণ হারাব।

"আপনারা অনেকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারেন—ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি? এর উত্তর আমার অতি সহজ ও স্পষ্ট। প্রথমতঃ—ভারতের বাইরে থেকে প্রাণপণে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্য্যন্ত সশস্ত্র অভিযান চালাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ—ভারতবর্ষের বাইরে ভারতের বহু শুভাকাজ্ক্ষী আছেন, তাঁরা জগতের দরবারে এবং আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে আমাদের এই ন্যায্য দাবী পেশ ক'রবেন। সর্ব্বশেষে—আপনারা, আমার দেশের ভাই-বোনেরাও যথাসময়ে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌তে প্রস্তুত থাক্‌বেন—যে আগুন দাবাগ্নির মত দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে প'ড়বে। আমার মনে হয় ব্রিটিশ বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যরাও এতে যোগ দেবে।

"ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—উপসংহারে আমার বক্তব্য—আপনারা কিছুতেই নিরাশ হ'বেন না। আমি আবার বল্‌ছি—ভারতের মুক্তির জন্য দেশের বাহিরে ও ভিতরে যে শক্তি কাজ কর'ছে তা' অবিনাশী। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতবাসীকে স্বাধীনতালাভে বাধা দিতে পারে। বিপুল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে আমাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হ'তে হবে। বড়লাট আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রার্থনা ক'রেছেন। তাঁকে বলুন—আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা একমাত্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেওয়ার জন্য সঞ্চিত আছে।"

১৯৪৫ সালের ১৯শে জুন তারিখে নেতাজী বেতারে আর একটি বক্তৃতা করেন—

"ভারতবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব এবং সে সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি আমি কাল সাধারণভাবে বেতারে ব'লেছি—আজও ঐ সম্বন্ধে আপনাদের আরও কিছু বল্‌তে চাই।

"ব্রিটিশ এবং মার্কিন-সংবাদ-দাতৃসঙ্ঘের কৃপায় ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ব্যাপার কতটা অগ্রসর হ'চ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি প্রতিদিন পাচ্ছি। এই সব সংবাদের সাহায্যে ভারতের অভ্যন্তরে কি ঘ'টছে তার সঠিক ধারণা করা যায়। ওয়াভেলের প্রস্তাবটি গ্রহণ ক'রলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল কি হবে তাই আপনাদের সর্ব্বাগ্রে ভেবে দেখ্‌তে বলি। ভেবে দেখুন—এ গ্রহণ ক'রলে

ইংরাজের সাম্রাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ ৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধে পাঠাবার দায়িত্ব কংগ্রেস-নেতাদের নিতে হবে। তার অর্থ ভারতীয় সৈন্যকে ভারত-ব্রহ্ম-সীমান্তে পাঠানো নয়—পাঠাতে হবে তা'দের ব্রহ্ম ছাড়িয়ে এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ সবাইকেই যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে আমি জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যকল্পে সুদূর প্রাচ্যে ৫ লক্ষ ভারতীয়-প্রাণ বলি দিবার দায়িত্ব নিতে কি তাঁরা রাজী?

"ইংরাজ সরকার ব্রিটেন থেকে ভবিষ্যৎ সুদূর প্রাচ্যের সংগ্রাম চালাবার মত সৈন্য সংগ্রহ ক'রতে যে পারছেন না তার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ—পাঁচ বৎসর নয় মাস ধ'রে বহু রণক্ষেত্রে ইংরাজদের বহু লোক ক্ষয় হ'য়েছে। তাই ইংরেজরা এখন যুদ্ধের কথা ভাবতে ভয় পায়—ব্রিটিশ সৈন্যরা এখন দীর্ঘকালব্যাপী কোন যুদ্ধে নামতে নারাজ—বিশেষ ক'রে এই ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইউরোপের যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট সহ্য ক'রতে হবে। দ্বিতীয়তঃ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বর্ত্তমান এই যুদ্ধ ইংরাজের আর্থিক দুর্গতি ঘটিয়েছে অনেক বেশী। যুদ্ধের অফুরন্ত দাবী পূরণ ক'রতে ব্রিটেনের কলকারখানাগুলি সামরিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ প্রভৃতি উৎপাদনেই নিয়োজিত হ'য়েছে। আমেরিকার কলকারখানাগুলির অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। ইহার ফলে

এই যুদ্ধ চল্‌তে চল্‌তেই পৃথিবীর ব্যবসাক্ষেত্রগুলি একে একে ইংরাজের হাত থেকে আমেরিকার হাতে চ'লে যাচ্ছে। যদি এই হস্তান্তর দীর্ঘকাল ধ'রে চল্‌তে থাকে তবে মিত্রশক্তির যুদ্ধ-বিজয় সত্ত্বেও ইংরাজের বৈদেশিক বাণিজ্য নষ্ট হবে। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার হবে সর্ব্বনাশ। এই জন্যই ব্রিটেনের যারা এর আগে শিল্প-কারখানায় কাজ ক'রত তা'দের অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তি দিয়ে কারখানায় ফিরিয়ে এনে আবার শান্তিকালের উপযোগী শিল্পগুলি চালু করা ইংলণ্ডের নেতাগণ একান্ত প্রয়োজন বোধ ক'রছেন। ইংরাজের পক্ষে সুদূর প্রাচ্যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তি-সময়োপযোগী শিল্পের পুনরুজ্জীবন—এই দু'টি কাজ একই সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

"আমি জানি অন্য সময় হ'লে কংগ্রেসের কেউই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। ঐ প্রস্তাব মান্‌তে চাওয়া মানে জাতীয় কংগ্রেসের মূল নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ বিসর্জ্জন দেওয়া। কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা। মহাত্মা গান্ধী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে স্বাধীনতার উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। দ্বিতীয়তঃ—কংগ্রেসের আদর্শই হ'চ্ছে সাম্রাজ্যবাদী-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ না ক'রে তা'তে বরং বাধা দেওয়া। তৃতীয়তঃ—কংগ্রেস এখনও তিন বৎসর আগেকার সেই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব মান্‌তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবাসীর

জাতীয় ধ্বনি (Slogan) হ'চ্ছে—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। সুতরাং কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাস করেন এমন কোন কংগ্রেসসেবীই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দিকে ফিরে চাইতে পারেন না—মেনে নেওয়া ত দূরের কথা। এ সব সত্ত্বেও যে কংগ্রেসের বহু সভ্য ও নেতা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব বিবেচনা ক'রে দেখ্‌ছেন এর কারণ—ইউরোপ ও ব্রহ্মে ব্রিটিশ-মার্কিনের বিজয়লাভের পর ভারতবাসীর মনে একটা ব্যর্থতার ভাব এসেছে। এই সাময়িক নৈরাশ্য ও দুর্ব্বলতায় কোন কোন কংগ্রেসসেবী তাঁ'দের সুদীর্ঘকালের আদর্শ ও নীতি বিস্মৃত হ'য়ে ১৯৪২ সালের প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাবই আবার বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে বসেছেন।

"এ ক্ষেত্রে আমার স্বদেশবাসীদের আমি খোলাখুলি ভাবে শুধু এই কথাই বল্‌তে চাই যে,—এই নৈরাশ্য ও দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ অহেতুক। আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার দিক দিয়েই হ'ক বা বিশ্ব-সমরের দিক দিয়েই হ'ক অনাস্থা বা নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই। পূর্ব্ব-এশিয়ার যুদ্ধের শেষ ফল যা'ই হ'ক না কেন—এ যুদ্ধ হবে ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। বিশ্ববাসী সবাই জানে তথা-কথিত মিত্রশক্তির ভিতরে সত্যিকার মৈত্রী নেই। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ ক'রছে সোভিয়েট রুশিয়া সেই উদ্দেশ্যে ক'রছে না এবং ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েটের মধ্যে বিরোধিতা প্রতিদিনই বেড়ে চ'লেছে। সম্প্রতি দুই পক্ষই অবশ্য ইউরোপে পরস্পরের বিরোধ সাময়িকভাবে চাপা দেবার

চেষ্টা ক'রছেন, কিন্তু সে কেবল সুদূর প্রাচ্যে বিপর্য্যয়ের আশঙ্কায়। ইউরোপে জার্ম্মানীর পতনের পর সোভিয়েট রুশিয়া এশিয়ার ব্যাপার নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামাতে সুরু ক'রেছেন। তা' না হ'লে সোভিয়েট-পররাষ্ট্র-সচিব মলটভ স্যান ফ্রান্‌সিস্‌কোতে বল্‌তেন না—"ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'বার আর বড় বেশী দেরি নেই"।

"প্রাচ্যে যখন এই যুদ্ধ চ'লতে থাক্‌বে তখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে নিশ্চয়ই নূতন নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দেবে। এই সব পরিবর্ত্তনের কোন কোনগুলি আমাদের শত্রুপক্ষের স্বার্থের প্রতিকূল হবে, তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতালাভে নূতন সুযোগ দেবে। ইউরোপে মিত্রশক্তির বিজয় লাভ সত্ত্বেও সিরিয়া এবং লেবানন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে খাড়া ক'রে সিরিয়া ও লেবানন যা ক'রছে তা' দেখে ভারতবাসীরও শেখা উচিত—স্বাধীনতা লাভ ক'রতে তারাও আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে। আজ যেমন সিরিয়া ও লেবানন ব্রিটেন এবং আমেরিকাকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে, তেমনি অনতিবিলম্বে আরবের অপর রাজ্যগুলি অন্যান্য মিত্রশক্তিকে যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত ক'রবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা একথা জানেন এবং তাঁ'রা আরও জানেন *যে ভারতবর্ষও স্বাধীনতালাভের জন্য* তার মিত্রশক্তির

সাহায্য নেবে এবং এই মিত্রশক্তির কেহ কেহ হয়ত বর্ত্তমান সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মধ্যেই আছেন। এই যুদ্ধের সময় ভারত-সমস্যা নিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোচনা চলেছে। এখন হ'তে যখনই আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক বস্‌বে তখনই ভারতের প্রশ্ন নিশ্চয়ই সেখানে উঠ্‌বে—এই জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক আলোচনার বিষয়ীভূত হ'তে দিতে রাজী নন। তাঁ'দের উদ্দেশ্য —ইহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই ঘরোয়া বিষয় ক'রে রাখা। আমরা যেন একথা না ভুলি যে জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ যে মুহূর্ত্তে ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ করবেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পারিবারিক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন থেকে সোভিয়েট রুশিয়া বা অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোনও রকম সাহায্য করা সম্ভব হবে না।

আমাদের শত্রুপক্ষ সম্প্রতি যে সাময়িক জয়লাভ ক'রেছে, তা' সত্ত্বেও ভারতবর্ষ আজ তার স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতবাসীরা যা ক'রছেন তা' ছাড়াও দুইটি বিশিষ্ট শক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা ক'রছে। প্রথমতঃ—যাঁরা ভারতের শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে আসছেন; দ্বিতীয়তঃ—যাঁরা বিশ্বের রাজনৈতিক মহলে ভারত-স্বাধীনতার প্রশ্ন উপস্থাপিত ক'রছেন। যাঁরা এতদিন ভারতের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছেন তাঁরা ভবিষ্যতেও যুদ্ধ ক'রবেন। আজাদ হিন্দ

ফৌজ সম্বন্ধে আমি একথা ব'লতে পারি যে, এর সৈন্যরা কোন একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাবে। আর যাঁরা ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ক'রে তুলেছেন এবং বিশ্বের দরবারে ভারতের হ'য়ে স্বাধীনতার আবেদন ক'রছেন, তাঁরাও তাঁ'দের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হবেন না। ভারতের বাহিরের এই উদ্যম ভারতের অভ্যন্তরস্থ প্রতিরোধের সঙ্গে সম্মিলিত হ'য়ে অদম্য হ'য়ে উঠেছে। আপনারা ভারতবাসীরা ভারতের অভ্যন্তরে থেকে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রতে না পারেন তবে তার সঙ্গে কোনরূপ আপোষ না ক'রে—তার সাম্রাজ্যবাদী-সংগ্রামে সাহায্য না ক'রে—নৈতিক প্রতিরোধ চালাতে থাকুন।

"এই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির সভাপতি ও সভ্যগণ এবং লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসসেবী নরনারীর কাছে আমার একটি আবেদন আছে। আবেদনটি হচ্ছে—তাঁরা যেন এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি বিচারে ভুল না করেন। এতে একটুও ভুল হ'য়ে গেলেই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রেও ভুল পথে চলা হবে। ভারতবর্ষ আজও পরাজিত হয় নাই। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূল নহে, বরং বিশেষভাবে অনুকূল এবং ভবিষ্যতে আরও অনুকূল হবে। সুতরাং এই অবস্থায় আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষ ক'রতে যাব কেন? তিন বৎসর আগে যে প্রস্তাব আমরা একবার

প্রত্যাখ্যান ক'রেছি, তা' আবার গ্রহণ ক'রতে যাই কেন?

"আমি কংগ্রেসের একজন সাধারণ সভ্য। সারাজীবন আপ্রাণ কংগ্রেসের সেবা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রে এসেছি। এই অধিকারেই আমি আমার দেশবাসী ভাইবোনদের ব'লতে চাই—আমাদের মিত্রশক্তি যদি শেষ পর্য্যন্ত পরাজিতই হয় এবং ইঙ্গ-মার্কিন দল জয়লাভ করে তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনাদের নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। ভবিষ্যতে বিশ্বরাজনীতিতে যাই ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষের জয়লাভ সুনিশ্চিত। ভারতের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। এই সন্ধিক্ষণে আপনারা কোন ভুল পথে গিয়ে তার অনিষ্টসাধন ক'রবেন না। বহুদিন ধ'রে বহু কষ্ট আমরা সহ্য ক'রেছি, আরও কিছু কাল এ কষ্ট আমাদের সহ্য ক'রতে হ'বে। আমরা এই যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প থাকব। দেশবাসী ভাইবোনেরা, আপনারা কি বুঝছেন না—লর্ড ওয়াভেলের এত কিসের তাড়া? আপনারা কি ভেবে দেখেছেন—মিঃ জিন্না সিমলা বৈঠক স্থগিত রাখতে যে প্রস্তাব ক'রেছিলেন লর্ড ওয়াভেল তা' প্রত্যাখ্যান ক'রলেন কেন? আমরা যারা ভারতবর্ষের বাইরে আছি তা'দের কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজবোধ্য। আগামী ৫ই জুলাই তারিখ ব্রিটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন। ওখানকার রক্ষণশীল দল চায়—ভারতবর্ষ এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে একটা দলাদলির বিষয় হ'য়ে না দাঁড়ায়। এই জন্যই লর্ড ওয়াভেল সাধারণ নির্ব্বাচনের এক মাস আগে তাঁ'র প্রস্তাবটি আমাদের কাছে

উপস্থাপিত ক'রেছেন। এই নির্ব্বাচনের ফলাফল কি দাঁড়াবে সে কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু এ কথা সবাই জানে—শ্রমিক দল ভোটাধিক্য লাভ করুক বা না করুক—৫ই জুলাই তারিখের পর পার্লিয়ামেণ্টে তা'দের প্রভাব এখনকার চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে। রক্ষণশীল দলের আশঙ্কা—আগামী নির্ব্বাচনে যদি শ্রমিক দলের ক্ষমতা বেড়ে যায়, অথচ ভারতীয় সমস্যার ইতিমধ্যে মীমাংসা না হয় তবে শ্রমিক দল নিশ্চয়ই ঐ সমস্যা সমাধানের একবার চেষ্টা ক'রবে। আমি নিজে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে দর কষাকষি করা পছন্দ করি না। কিন্তু যতটা পাওয়া যায় নেওয়া যাক—এই যদি আপনাদের মনোভাব হয় এবং ভারত-স্বাধীনতা সম্পর্কে আপোষ ক'রতেও যদি আপনারা বদ্ধপরিকর হ'ন,—তবুও আমার অনুরোধ, ৫ই জুলাই-এর আগে আপনারা নিজেদের মনোভাব ওদের জান্‌তে দেবেন না। মিঃ জিন্না কি ভেবে সিমলা বৈঠক স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন আমি জানি না,—কিন্তু যদি এই হয় যে ৫ই জুলাই-এর আগে তিনি তাঁর শেষ চাল চা'লতে চান না—তা' হ'লে তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার আমি প্রশংসা করি। আমি এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রতে পারি যে ৫ই জুলাই-এর আগে একটা মীমাংসা ক'রবার জন্যে লর্ড ওয়াভেল আকাশ-পাতাল তোলপাড় ক'রবেন। তিনি সাফল্য লাভ ক'রলে রক্ষণশীল দলের গৌরব বেড়ে যাবে এবং আগামী নির্ব্বাচনে তা'দের অধিক ভোট লাভের সম্ভাবনা হবে। তা' ছাড়া ৫ই জুলাই-এর আগে লর্ড

ওয়াভেল যদি কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রতে পারেন এবং তার পর যদিও শ্রমিক দল ক্ষমতালাভ করে—তবুও রক্ষণশীলদল শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর ভারতবর্ষের প্রশ্ন পুনরুত্থাপনে বাধা দিতে পারবে।

"শ্রমিকদলের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার আমার উদ্দেশ্য নয়—বরং তার উল্টো। এ বিষয়ে আমার পরিকল্পনা সুস্পষ্ট—সে হচ্ছে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে আমাদের শেষ সৈনিকের শেষ রক্তবিন্দু দান পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালানো। বিপদসঙ্কুল ব'লে এ পন্থা যদি আপনাদের মনঃপূত না হয় এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যা-কিছু পাওয়া যায়, আদায় ক'রে নেওয়াই যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে আমি বল্‌ব—এ যা-কিছু লাভ ক'রবার সময়ও হচ্ছে ৫ই জুলাই-এর পর। ৫ই জুলাই-এর আগে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে যদি আপনাদের কোন আপোষ চুক্তি না হয় তা' হ'লে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে আপনাদের জন্যই শ্রমিক-নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের ভোট-সংখ্যা বেড়ে যাবে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার—ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব এবং ওয়াভেল প্রস্তাব দুটোর মূলেই র'য়েছে রক্ষণশীল মন্ত্রীদলের প্রভাব। এই দুই প্রস্তাবের বেলায়ই পার্লামেণ্টে শ্রমিকদল সংখ্যালঘু ছিলেন এবং এর দায়িত্ব কোনবারেই শ্রমিকদলের হাতে ছিল না, এর পরিকল্পনাও তাঁরা করেন নাই। লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তা' হ'লে ব্রিটেনের জনসাধারণ শ্রমিকদলকে ভারত-সমস্যার সমাধান ক'রতে আর একটা সুযোগ দেবে এ কথা নিশ্চিত।

সুতরাং কিছু আদায় ক'রে নেবার ইচ্ছা যদি আপনাদের থাকে তা' হ'লে লর্ড ওয়াভেলকে আমল দেবেন না—তাঁ'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। ইহা শ্রমিকদলকে বৃটেনের শাসনভার লাভ ক'রতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রবে। শ্রমিকদল নির্ব্বাচনে জয়লাভ ক'রবার পর ভারত-সমস্যার পুনরুত্থাপন ক'রে—ভারত সম্পর্কে রক্ষণশীলদলের ব্যর্থ চেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত ক'রে তুল্‌বার চেষ্টা ক'রবে। আমি এ কথা জোর ক'রে ব'লতে পারি - ৫ই জুলাই-এর পর অন্য কোন মন্ত্রিমণ্ডলী আসন পেলে বহুকাল আগে যে সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত ছিল অথচ হয় নি, সে সমস্যার সমাধান করা তা'রা নিজেদের কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রবে। সুতরাং কোন কিছু আদায় ক'রবার মতলব যদি আপনাদের থাকে, তবে রক্ষণশীলদল-নিযুক্ত ওয়াভেলের সঙ্গে আপোষ না ক'রে—শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে আপোষ করাই ভাল—ভারতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে তাই হবে অধিকতর অনুকূল।

"আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,—কাল এই রকম সময়ে আমি আপনাদের কাছে আবার কিছু বল্‌ব। আজ আমার বক্তব্য শেষ ক'রবার আগে আর একটি মাত্র কথা আমি আপনাদের কাছে বল্‌তে চাই। বড়লাটের কর্ম্মপরিষদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের সমান সংখ্যক আসন দেওয়ার জন্য আপনারা লর্ড ওয়াভেলের তীব্র নিন্দা ক'রছেন। কিন্তু আপনারা ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করুন না কেন যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আমি যতদূর সংবাদ

পেয়েছি এপর্য্যন্ত কোন ভারতীয় নেতাই তাহা করেন নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, হিন্দু মহাসভা তাঁ'দের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে এই জিনিসটাকে দেখেছেন। মুসলমানেরা কর্ম্মপরিষদে বেশী আসন পেলেন ব'লেই আমাদের আপত্তি তোলা উচিত হবে না—দেখ্‌তে হবে এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে যে সব মুসলমান আসেন তাঁরা কি প্রকৃতির লোক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আসফ আলি এবং রফি আহম্মদ কিদ্‌ওয়াইর মত মুসলমান যদি এই সব আসন লাভ করেন, তবে ভারতের ভবিষ্যৎ নিরাপদ এবং আমার নিজের বিশ্বাস—এই রকম দেশপ্রেমিকদিগকে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রবার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। স্বদেশপ্রেমিক মুসলমান ও স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দুর মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মুস্‌লিম লীগের মনোনীত মুসলমানদেরই এই আসনগুলি দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায়। বর্ণহিন্দুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি কংগ্রেসের লোকদেরই দেওয়া উচিত। বাকী আসনগুলিতে বড়লাট নিজের মনোনীত ব্যক্তিদেরই বসাবেন এবং তাঁ'রা তাঁ'র নির্দ্দেশ মতই চ'লবেন।

"সুতরাং দেখা যাচ্ছে মুস্‌লিম লীগ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ ক'রবেন—আর এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেসীদল হবেন চিরকাল সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। বড়লাট এতদিন যে রকম স্বেচ্ছাচারীভাবে ভারত-শাসন চালিয়েছেন —এই কৌশলে ভবিষ্যতেও তাই বজায় থাক্‌বে, অধিকন্তু সেই কাজে কংগ্রেস তাঁহাকে সাহায্য ক'রতে বাধ্য হবে।

"প্রশ্ন হ'তে পারে এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের মুস্‌লিম লীগ সভ্যগণ বড়লাটের সহযোগিতা ক'রবেন কি না? আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা নিশ্চয়ই তা' ক'রবেন—কারণ এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে বড়লাট তাঁ'দের কিছু সংখ্যাধিক্য দিতে রাজী হ'য়েছেন। এখন এই যুদ্ধ ব্যাপারেও যদি মুস্‌লিম লীগ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করে তা' হ'লে ভারতের জনবল ও ধনসম্পদের দ্বারা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-পরিচালনার কাজ সহজসাধ্য হবে।

"লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার ও মুস্‌লিম লীগের মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন চুক্তি আছে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বুদ্ধির দৌড়ে শেষ পর্য্যন্ত লর্ড ওয়াভেলকে মিঃ জিন্নার কাছে হার মান্‌তে হবে। এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে মুস্‌লিম লীগের দল ব্রিটেনের সমরনীতি মেনে নিয়ে—ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য ক'রবার পুরস্কার-স্বরূপ নিজেদের পাকিস্তান পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত ক'রবে। কংগ্রেসী দল এ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে চিরকালই তা'দের সংখ্যালঘিষ্ঠ হ'য়ে থাক্‌তে হবে, আর এই আপোষের ফলে কংগ্রেসকে ব্রিটেনের যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য ক'রতে বাধ্য হ'তে হবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একবার যদি এই কৌশলে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভ ক'রতে সক্ষম হয় তাহ'লে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত বিভাগেও কংগ্রেসকে রাজী করাতে চেষ্টা ক'রবে। এদিকে কংগ্রেস ক'রবে রাজনৈতিক আত্মহত্যা—অর্থাৎ এমন

একটা অবস্থায় এসে সে উপনীত হবে যাতে ভারতীয় সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবী আর তার থাক্‌বে না। সে হবে তখন ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি দল মাত্র।

"উপসংহারে আমি ব'ল্‌তে চাই—হিন্দুমহাসভার সভ্যদের পন্থা আমি অনুমোদন না ক'রলেও এ কথা আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি যে, তাঁ'রা সুস্পষ্টভাবে লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে ভারতের কল্যাণ সাধনের চেষ্টাই ক'রেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি আরও এগিয়ে ব'লতে চাই—এই সঙ্কট সময়ে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ দেশভক্ত ভারতবাসীর বিশেষ ক'রে প্রগতিপন্থী কংগ্রেসসেবীর কর্ত্তব্য হ'চ্ছে লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করা। নেতাদের জনসাধারণের মনের অনুকূলে কাজ করা কর্ত্তব্য এবং মহাত্মা গান্ধী এই কর্ত্তব্য চিরকাল পালন করেন। সিমলা বৈঠকে সরকারীভাবে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ক'রতে অস্বীকার ক'রে তিনি ঠিকই করেছেন, এবং ইহার দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য দেশবাসীর মতানুবর্ত্তিতা ও নিজের বিবেকবুদ্ধিমতে যে পন্থা অনুসরণ তিনি সঙ্গত মনে ক'রবেন তাহা গ্রহণে কোন অন্তরায় থাকবে না। আমার মতে জনসাধারণের বিশেষ ক'রে কংগ্রেসের ছোট-বড় সব সভ্যেরই অবিলম্বে লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাবে বাধা দেওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধী তা' হ'লে কংগ্রেসকে এই অবাঞ্ছিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রতে অবশ্যই

ব'ল্‌বেন। ভাই বোন সব—ভারতের ভাগ্য এখন সম্পূর্ণ আপনাদেরই হাতে; আপনারা সব উঠে প'ড়ে লাগুন—১৯৪২ সালে ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবের যে দশা হ'য়েছিল—লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবেরও আপনারা সেই দশা ক'রে তুলুন।"

১৯৪৫ সালের ২০শে জুনের বেতার বক্তৃতায় নেতাজী বলেন—

"ভারতবাসী ভাই বোন সব—আজ এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আমি আপনাদের কাছে থাক্‌লে আপনাদের যা ব'লতাম, বেতারে আমি আপনাদের তাই ব'লতে যাচ্ছি। কংগ্রেসসেবী হিসাবেই আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা ব'লছি। ১৯২১ সাল থেকে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বান্তঃকরণে আমি কংগ্রেসের সেবা ক'রে এসেছি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ সুরু হবার পর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কত কি ঘটেছে, তা' আপনাদের ভুল্‌বার কথা নয়। সেই সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে যুদ্ধের কাজে লাগাবার জন্য চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু কংগ্রেস যুদ্ধব্যাপারে সহযোগিতা ক'রতে রাজী হ'ন নি। তাঁ'দের রাজী না হওয়ার কারণ ছিল প্রধানতঃ দু'টি। প্রথমতঃ—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের জাতীয় দাবী পূরণ করেন নি; দ্বিতীয়তঃ—ব্রিটেনের যুদ্ধ হ'চ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের কোন স্বার্থ থাক্‌তে পারে না। সুতরাং এ সময় কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাক্‌তে পারে না। কংগ্রেস—ব্রিটেনের ১৯৩৯এর যুদ্ধে কোন সহযোগিতা

ক'রবেন না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন। প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীই অবশ্য জানেন—মন্ত্রিগণ এই সময়ে নিজেদের আসনে অধিষ্ঠিত থাক্‌লে অন্যান্য অনেক ব্যাপারে দেশের অনেক কিছু মঙ্গল সাধন ক'রতে পার্‌তেন। কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগের পর কংগ্রেস আবার ধীরে ধীরে স্বাধীনতা-আন্দোলন সুরু ক'রে দিল। এই আন্দোলন চরম অবস্থায় পৌঁছে ১৯৪২ সালে—যখন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবাসীরা এক নূতন 'ধ্বনি'(Slogan) প্রচলন করে—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

"এখন ১৯৪৫ সালে আবার আমাদের কাছে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব উপস্থিত হ'য়েছে। এই প্রস্তাবে বলা হ'য়েছে—সুদূর প্রাচ্যের আগামী যুদ্ধে কংগ্রেস যদি সর্ব্বান্তঃকরণে বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তা' হ'লে তাকে এখনই দেওয়া হবে দু'টি জিনিস, আর তার সঙ্গে দেওয়া হবে ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার। এখনই যে দু'টি জিনিস দেওয়া হবে তার প্রথমটি হ'চ্ছে বড়লাটের কর্ম্মপরিষদে (Executive Council) কয়েকটি চাকুরি, আর দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

"ভারতবর্ষ থেকে যে সব খবর আসছে তা' শুনে মনে হয় কোন কোন কংগ্রেসসেবী লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন ক'রছেন। এর অর্থ কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী যদি প্রত্যেক

প্রদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বড়লাটের কর্ম্মপরিষদে যদি কংগ্রেসসেবীদের কয়েকটি চাকুরি মেলে, তবে তাঁ'রা স্বায়ত্ত-শাসন দানের অঙ্গীকার পেলেই খুশি। মনে রাখ্‌বেন অঙ্গীকার স্বায়ত্তশাসন দানের—স্বাধীনতার নয়। এই সব প্রলোভন তাঁরা অবশ্য বহুদিন আগে থেকে কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত ক'রেছেন। প্রথম কথা—বৃটেন আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দিতে চেয়েছে বহুদিন থেকে। দ্বিতীয় কথা—১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের আটটি মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আমাদেরই ইচ্ছায় ঐগুলি পদত্যাগ করে। তৃতীয় কথা—বড়লাটের কর্ম্মপরিষদের চাকুরিও কিছু নূতন প্রলোভন নয়, যে সব কংগ্রেসসেবীরা আত্মবিক্রয় ক'রতে রাজী, তা'দের জন্য ঐ সব চাকুরি ত বরাবরই খোলা ছিল।

"ওয়াভেলের প্রস্তাবে অবশ্য দুইটি বিষয়ে নূতনত্ব আছে। প্রথমতঃ—বড়লাটের কর্ম্মপরিষদের চাকুরির সংখ্যা কিছু বাড়ানো হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ—স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে কংগ্রেস সুদূর প্রাচ্যের আগামী যুদ্ধে সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা ক'রবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী যখন পদত্যাগ করেন তখন তাঁদের এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেবার প্রশ্নই ছিল না। তাঁ'রা ইচ্ছা ক'রলে ১৯৩৯ সালের পরেও এইসব প্রস্তাব—ব্রিটেনের যুদ্ধে সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা ক'রবার প্রতিশ্রুতি না দিয়েই—গ্রহণ ক'রতে পার্‌তেন।

"যাঁরা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছুক, তাঁদের কাছে আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করি—তাহার দ্বারা এই বিষয়টি অনেকটা সহজবোধ্য হবে। প্রশ্নগুলি এই—(১) আমাদের স্বাধীনতালাভের কথার কি হ'ল? লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মধ্যে ত সে বিষয়ে কোন উল্লেখই নাই। (২) পূর্ণ স্বরাজের অর্থ কি শুধু ভারতীয়দের দ্বারা বড়লাটের পরিষদ্ গঠন,—না ব্রিটিশ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ? (৩) কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলী ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ ক'রলেন কেন? (৪) আমাদের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনির কি হ'ল? (৫) বড়লাটের কর্ম্মপরিষদে চাকুরি গ্রহণের জন্য কংগ্রেসসেবী শ্রীআনি ও ডাঃ খারের কার্য্যের আমরা তীব্র নিন্দা করেছিলাম কেন?

"৺বিঠলভাই প্যাটেলই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের যথার্থ বর্ণনা ক'রে গেছেন। তিনি ব'লে গেছেন—এ হচ্ছে বড়লাটের স্বরাজ, এমন কি এ স্বরাজ কর্ম্মপরিষদেরও নয়। পররাষ্ট্রবিভাগ একজন ভারতীয়ের হাতে দেওয়ার কথা আমার মনে হয় একটা ফাঁকি, কারণ ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের, উপজাতির এবং সীমান্তের ব্যাপার ইত্যাদি সবই থাকবে এই সদস্যের এলাকার বাইরে। এই নূতন কর্ম্মপরিষদ্দে অবশ্য সম্মিলিত দায়িত্ব বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কর্ত্তৃত্বের কোন কথাই নেই, এবং বড়লাটেরও অবশ্য যা খুশি তাই ক'রবার ক্ষমতা অব্যাহতই থাকবে, তবুও প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখবার জন্যে এমন একটি

রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা হবে যাতে নূতন কর্ম্ম-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দল বড়লাট তাঁর পক্ষে পাবেন— সকল অবস্থাতেই এই দলটি তাঁর পক্ষ সমর্থন ক'রবে।

"আমার স্বদেশবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,—বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় ভারতের ভাগ্য আপনাদেরই হাতে। এখনই সারা দেশময় আপনারা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করুন। তা' হ'লে কোন নেতা আর বৃটিশের সঙ্গে অন্যায় সর্ত্তে আপোষ ক'রতে সাহস ক'রবেন না।—জয় হিন্দ্।"

১৯৪৫ সালের ২১শে জুন তারিখে নেতাজী বেতার বক্তৃতায় বলেন—

"ভারতবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—গত তিন দিন ধরে আমি আপনাদের কাছে জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার কথা বিস্তারিত ভাবে বলে আস্‌ছি,—ভারতীয় সমস্যা এখন আন্তর্জ্জাতিক পটভূমিতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে কথাও বিশদভাবে আমি ভেবে দেখেছি।

"আমার দৃঢ়বিশ্বাস ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে ভারতীয় জনমত বিশেষ ক'রে ভারতীয় কংগ্রেস বিপ্লবের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং কংগ্রেসের একটি সাধারণ অধিবেশন যদি এখন করা হয়, অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির একটি সভা করা হয়—তা হ'লে ঐ সভায় লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে প্রত্যাখ্যাত হবে। ব্রিটিশ সরকার এবং লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় পরিস্থিতি বেশ

ভাল ক'রেই জানেন, তাঁ'রা জানেন—তাঁদের এই প্রস্তাবটি যদি কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটিতে বিচারের জন্য পেশ করা হয়, তা' হ'লে এটা গৃহীত হ'বার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি ক'রেছেন—যাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্যেরাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটির বিচার ক'রবেন। এরূপ একটি মহা-গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কংগ্রেসের হ'য়ে ওয়ার্কিং-কমিটির কোন শেষ সিদ্ধান্ত করা কংগ্রেসের মূল নীতি-বিরুদ্ধ।

"আমি একথা মেনে নিতে রাজী আছি যে যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটিতে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি থাক্‌তেন অথবা বিবেচ্য বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী হ'ত তা' হ'লে আইনতঃ না হ'লেও ন্যায়তঃ ওয়ার্কিং-কমিটির ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আস্‌বার অধিকার ছিল। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন,—ভারতীয় কংগ্রেসে প্রতিপত্তিশালী বামপন্থীদলের প্রতিনিধি এই ওয়ার্কিং-কমিটিতে কেহই নেই। এ কথাও কেহই ব'লতে পার্‌বেন না যে দেশে এমন কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হ'য়েছে যাতে ওয়ার্কিং-কমিটির—নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের না জানিয়েই একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য কৌশলে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি বা কংগ্রেসের সাধারণ

অধিবেশনে পেশ না ক'রে,—ওয়ার্কিং কমিটির হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁ'দের কৌশলটা বোঝা শক্ত নয় কিন্তু বুঝ্‌তে পারি না ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা জেনে শুনে এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন কেন? কংগ্রেসের আইন অনুসারে—ওয়ার্কিং-কমিটি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মাত্র,—নূতন মত প্রবর্ত্তন বা নূতন আইন প্রণয়ন ক'রবার ক্ষমতা তা'দের নাই,—আমি ব'লতে চাই কংগ্রেস এবং ভারতের ভাগ্য আগামী বহু বৎসরের জন্য নিয়ন্ত্রিত ক'রবে, এমন একটা মহা-গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেবল মাত্র নিজের দায়িত্বে ক'রতে যাওয়া ওয়ার্কিং-কমিটির পক্ষে সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ ও অন্যায়। এখনও আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে বিনীত প্রার্থনা ক'রছি—কংগ্রেসকে না জানিয়ে তিনি যেন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হ'ন। আমার এরূপ আবেদনের কারণ—ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে আমরা এ যাবৎ যতটা এগিয়ে এসেছি তা' থেকে পেছিয়ে যাব,—তা' ছাড়া কংগ্রেসের মূলগত নীতি ও পূর্ব্বগৃহীত প্রস্তাবও অমান্য করা হবে এবং কংগ্রেসের দীর্ঘকালের বহু আত্মত্যাগ ও চেষ্টার ফলেও ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

"ভারতের অভ্যন্তরে ভারতবাসীরা যদি ব্রিটিশকে বাধা দানে বিরত না হয়—তা' হ'লে এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা-লাভ অনিবার্য্য। ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ, পূর্ব্ব-এশিয়ায় সশস্ত্র অভিযান এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী নীতি অবলম্বন—এই তিনের সম্মিলিত শক্তিতে এই

যুদ্ধের অবসানে ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ ক'রবে। কিন্তু আমাদের এই মুক্তি লাভ ক'রতে হ'লে ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশশক্তিকে বাধাদান হ'চ্ছে অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব-এশিয়ায় যে সশস্ত্র অভিযান চ'ল্ছে সেটি চালানো সম্বন্ধে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আমি আরও আশ্বাস দিতে পারি—ভারতের অভ্যন্তরে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে সর্ব্বদা বাধা দেওয়া হয় তা' হ'লে ভারত-সমস্যা আন্তর্জ্জাতিক-সমস্যা হ'য়েই থাক্‌বে এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিজ্ঞদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য আমরা পাব। বর্ত্তমানে ভারতের আভ্যন্তরীণ অশান্তিতে ব্রিটিশদের উদ্বেগের কারণ হ'চ্ছে মাত্র দু'টি। ভারতের অভ্যন্তরে নৈতিক বাধাদান যদি সমান ভাবে চলে—ভারত-সমস্যা তা' হ'লে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা হ'য়েই থাক্‌বে। তা' ছাড়া ভারতীয়েরা যদি ব্রিটিশ বিরোধী হ'য়েই থাকে তা' হ'লে সুদূর প্রাচ্যের আগামী যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে ধনজন-সম্পদ্ পাওয়া তা'দের অসম্ভব হবে। ব্রিটিশেরা জানে যে ভারতবর্ষ থেকে লোকবল ও দ্রব্যসম্ভারের যথেষ্ট সাহায্য না পেলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধে জয়লাভ তা'দের অসম্ভব। তাই লর্ড ওয়াভেল এক ঢিলে দুই পাখী মার্‌তে এই প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ক'রেছেন। প্রথমতঃ—এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে ভারতীয়দের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে—ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তারা সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা ক'রবে। দ্বিতীয়তঃ—ভারতীয় সমস্যা

তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই পারিবারিক সমস্যায় পরিণত হবে। তখন সোভিয়েট-রুশিয়া এবং অন্যান্য দেশের কাছ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা এখন আছে, তাও আর থাক্‌বে না।

"কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যেরা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার আগে সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অন্ততঃ পাঁচলক্ষ ভাবতীয় প্রাণ বলি দিতে যেন প্রস্তুত থাকেন। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে কংগ্রেস কতটা কি হারাবে তার বর্ণনা আমি দিয়েছি। এখন ওয়ার্কিং-কমিটি যদি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন—তবে তাঁ'দের কতটা লাভ হবে সে হিসাবটাও তাঁরা যেন আগে ক'রে নেন, তা' হ'লেই বুঝা যাবে এই লাভের দ্বারা ক্ষতির যথেষ্ট পূবণ হবে কি না। খতিয়ে দেখ্‌লে যদি বুঝা যায়—লাভ যা হবে ক্ষতির তুলনায় তা' এক রকম কিছুই নয় তবে ১৯৪২ সালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের প্রস্তাব আমরা যেমন প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলাম তেমনই এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই হবে আমাদের কর্ত্তব্য। কংগ্রেসসেবীদের কেহ কেহ হয়ত ভাব্‌তে পারেন—তাঁ'রা এখন যা ক'রবেন ভাব্‌ছেন ভবিষ্যতে হয়ত তাই আমাদের ক'রতে হবে। এ ধারণা তাঁ'দের সম্পূর্ণ ভুল। আমার এক বক্তৃতায় আমি আগে ব'লেছি—বর্ত্তমান যুদ্ধকালে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ ক'রতে নাও পারে তা' হ'লেও বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতালাভের আর একটা সুযোগ আমরা পাব।

"যুদ্ধ-বিরতির পর থেকে সম্পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সময়টা পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা অস্থির অবস্থা চল্‌বে। এই চঞ্চলতার সময়ে বিজয়ী শক্তিকেও বহু অসুবিধার মধ্যে পড়্‌তে হয়—কারণ তার চাই তখন বিশ্রাম। এই জন্যই তুরস্ক ও আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লব—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্যর্থ হ'লেও যুদ্ধের অবসানে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ ক'রেছিল।

"আজ যে সংবাদ আমি পেয়েছি তা'তে জান্‌লাম কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ব'লেছেন—এবারকার আলোচনা যদি আমাদের ব্যর্থ হয় তবে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা আর কোন নূতন আন্দোলন আরম্ভ ক'রব না। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত হ'তে পার্‌ছি না। যুদ্ধ চল্‌বার সময় দেশের অভ্যন্তরে আমাদের নূতন ক'রে আন্দোলন সুরু না ক'রবার কি কারণ থাক্‌তে পারে? তবে এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, যুদ্ধ শেষ হবার পরও যদি দেশের পরাধীনতা না ঘোচে, তবে ভারতীয়েরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপুল আয়োজনে আর একবার ল'ড়বার সুযোগ পাবে এবং আমি নিঃসন্দেহে এ কথা ব'লতে পারি যে, যুদ্ধের শেষে সেই অভিযানে বর্ত্তমান ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যদলের অনেকেই কর্ম্মচ্যুত হ'য়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ল'ড়বে।

"বড়লাটের কর্ম্মপরিষদে প্রধান আসনটি অধিকার ক'রে

বসবেন সমর-সদস্য (War member) অর্থাৎ একজন ব্রিটিশ জঙ্গীলাট। ইনি যে দাবী ক'রবেন, বড়লাট তাতেই রাজী হবেন। সুতরাং বড়লাটের অধীনে ইনিই হবেন সর্ব্বেসর্ব্বা। বড়লাট এবং জঙ্গীলাট যতদিন একমত থাকবেন, ততদিন সকল বিভাগই এঁদেব নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে। কর্ম্মপরিষদের অপর সদস্যগণ কোন আপত্তি ক'রতে পারবেন না, কারণ আইনতঃ বা ন্যায়তঃ তাঁরা বড়লাটের মতে সায় দিতে বাধ্য, তা' ছাড়া তাঁ'দের যুদ্ধ ব্যাপারে সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা ক'রবার শপথ আগেই দিতে হবে,—সেই জন্য তাঁরা নৈতিক দিক্ দিয়েও ওদের মতে মত দিতে বাধ্য। পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কাজের ভার অবশ্য একজন ভারতীয়ের উপরই থাকবে, কিন্তু এ কেবল প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ পররাষ্ট্রের কাজকর্ম্ম এঁর এলাকা থেকে বাইরে রাখা হবে। এই বিভাগের সদস্যটি হবেন অনেকটা বড়লাটের পরিষদের ভারতরক্ষা সদস্যদের মত—যাঁর কাজ হচ্ছে মাত্র সেনা-ভোজনাগারের (Army Canteens)এর তত্ত্বাবধান।

"লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাবটি গ্রহণ ক'রলে আমাদের কি ক্ষতি হবে তা' আমি আগেই বলেছি। কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কিছুদিন সহযোগিতা ক'রলে আমরা আরও কি কি হারাব সেই কথাই আমি এখন ব'লতে যাচ্ছি। প্রথমতঃ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুক্তিলাভের মনোভাব (Freedom mentality) বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। তা' ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ

ক'রবার ফলে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-প্রিয় নরনারীর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হব। রুশিয়ার মত আরও যে যে শক্তি আমাদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত—তাঁরা আর আমাদের পক্ষ সমর্থন ক'রবেন না।

বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণে অন্যান্য আপত্তির কথা ছেড়ে দিলেও এর মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব জড়িত আছে শুধু তার জন্যই এ প্রস্তাব জাতীয়তাবাদী দলের কারো গ্রহণ করা উচিত নয়। কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান —ইহার মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকই র'য়েছেন। তাঁরা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রেও ইহার জাতীয়তার ভাব রক্ষা ক'রে আস্‌ছেন। এরূপ অবস্থায় এখন যদি তা'কে জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার আখ্যা গ্রহণ ক'রতে হয়—তবে তার কার্য্যকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এতদিন কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিনিধির আসন অধিকার ক'রে এসেছে—এ আসন পরিত্যাগ ক'রে সে যদি ভারতীয় অন্যান্য রাজনীতিক দলের মত একটি দল মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তার কোন মর্য্যাদাই থাক্‌বে না।

"উপসংহারে কাল যা ব'লেছি তাই আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অর্থাৎ এই সঙ্কটকালে ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনাদের—এই দায়িত্ব বিশেষতঃ ভারতীয় জনগণের ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির।

সুতরাং আমার অনুরোধ এই মারাত্মক ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপনারা তীব্র প্রতিবাদ সুরু ক'রে দিন—যাতে ১৯৪৫ সালের ৫ই জুলাই-এর আগে এই প্রস্তাবটি একেবারে বাতিল হ'য়ে যায়।"

১৯৪৫ সালের ২২শে জুন তারিখে নেতাজী বেতারে আবার বলেন—

"ভারতবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,—ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত সর্ব্বশেষ সংবাদে আমরা জানতে পেরেছি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গত রাত্রে সাব্যস্ত ক'রেছেন—লর্ড ওয়াভেলের সিমলা বৈঠকে যোগদান ক'রবার আমন্ত্রণ তাঁরা গ্রহণ ক'রবেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান মনোভাবের সঙ্গে যাঁ'রা পরিচিত তাঁ'রা এ শুনে কিছুমাত্র বিস্মিত হ'ন নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ভারতের এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদদাতা জানিয়েছেন—বড়লাটের প্রস্তাবটি বিবেচনা ক'রে দেখতে গিয়ে কংগ্রেসের নেতারা এখন তিন দলে বিভক্ত হ'য়ে গেছেন। প্রথম দলের নেতৃত্ব ক'রছেন মহাত্মা গান্ধী এবং সর্দ্দার বল্লভভাই। বড়লাটের ঘোষণায় 'বর্ণ হিন্দু'—এই কথাটা থাকায় এঁরা ভীষণ আপত্তি ক'রছেন। দ্বিতীয় দলের নেতা হচ্ছেন পণ্ডিত নেহরু এবং মৌলানা আজাদ। এঁরা ভারতবাসীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হবে তা'তে সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে বল্‌ছেন—আপাততঃ প্রস্তাবটি অন্তর্ব্বর্ত্তী পন্থারূপে গ্রহণ ক'রে দেখা যাক ইহার দ্বারা কি লাভ হয়—

অবশ্য এতে যদি ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী মিটাবার এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে তবেই এটা অন্তর্ব্বর্ত্তী পন্থারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তৃতীয় দলের নেতা শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি এবং শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বল্‌ছেন—সিমলা বৈঠকে বিবেচ্য সর্ত্তগুলি এমন ব্যাপক এবং যথেচ্ছব্যাখ্যা-যোগ্য যে কংগ্রেসের এতে কোন কিছু ভয় পাবার নেই। তাঁরা বল্‌ছেন—কংগ্রেস এ প্রস্তাবকে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না ক'রে যথাবৎ গ্রহণ করুক—তারপর পরীক্ষা ক'রে দেখুক এর ফল কেমন হয়। এতে কংগ্রেসের বৈঠকের কাজে সহায়তা ক'রবার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথাই প্রকাশ পাবে।

"এ্যাসোসিয়েটেড্‌ প্রেসের সংবাদদাতার রাজনৈতিক সমালোচনা নির্ভুল কি না,—এতদূরে থেকে তা' আমার পক্ষে বুঝা কঠিন, কিন্তু নির্ভুল হলেও আমি আশ্চর্য্যান্বিত হ'ব না। বস্তুতঃ গত কাল বর্ত্তমান ওয়ার্কিং-কমিটির চরিত্রের আমি যা বিশ্লেষণ করেছি, তার সঙ্গে ঐ সংবাদদাতার সমালোচনা একেবারে মিলে যায়। মনে হয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির কোন সদস্যই এই ব্যাপারে রেডিক্যাল ডিমোক্র্যাটিক্ পার্টির মত সমর্থন করেন নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির যুক্তি হয়ত এই যে—সিমলা বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রতে রাজী হলেও তাঁরা এ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। কিন্তু এ যুক্তি টেকে না, কারণ এই প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ যে কি সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এ বৈঠকে

যিনিই যোগ দেবেন তাঁকেই পূর্ব্বএশিয়ার যুদ্ধে সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতার সর্ত্তও গ্রহণ ক'রতে হবে, এবং ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ ক'রবার সময় কংগ্রেস যুদ্ধে যোগদান সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন ক'রবেন বলে স্থির ক'রেছিলেন সে নীতি তাঁ'কে ত্যাগ ক'রতে হবে। তা' ছাড়া যাঁরা এই বৈঠকে যোগদান ক'রছেন তাঁ'দের বড় লাটের কর্ম্মপরিষদের বর্ত্তমান নিয়ম কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সব মেনে নিতে হবে—ফলে বড়লাটের পরামর্শদাতা হিসাবেই তাঁরা কাজ ক'রবেন—দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে নয়। এ সম্বন্ধে বড়লাটের মনোভাব কিছু প্রচ্ছন্ন নয়, তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—তিনি নিজেই তাঁর কর্ম্মপরিষদের সদস্য নিযুক্ত ক'রবেন। সুতরাং কর্ম্মপরিষদের সদস্যগণ তাঁ'দের কাজের জন্য তাঁহার কাছে দায়ী থাকবেন—আইন সভার (Legislature) কাছে নয়। তা' ছাড়া কর্ম্মপরিষদে গরিষ্ঠ-শাসন বা সম্মিলিত দায়িত্ব ব'লে কিছু থাক্‌বে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যাঁরাই এ বৈঠকে যোগদান ক'রবেন তাঁ'দেরই স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ ক'রতে হবে। শুধু তাই নয়—আইন সভার প্রতি দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবীও তাঁ'দের পরিত্যাগ ক'রতে হবে। ১৯৩৫এর শাসনবিধির অনুবর্ত্তিতায় কর্ম্মপরিষদের সদস্যদের আসন ভারতীয়দেরই দেওয়া হবে—শুধু ইহাতেই তাঁ'দের সন্তুষ্ট হ'তে হবে। এ সব সত্ত্বেও যদি সিমলা বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয় তবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল-নীতি ও পন্থা

উভয়ই বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। কংগ্রেসই একদিন যে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল—যার জন্যে আমাদের বহু দেশবাসী এখনও কারা-যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে—তাও ত্যাগ করা হবে। বড়ই দুঃখের কথা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রবার আগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির কেহই করেন নাই—অথচ তাঁ'দের অনেকেই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

"আমি আমার কা'লকার বক্তৃতায় ব'লেছি যে ওয়ার্কিং-কমিটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি মাত্র। এত কোটি লোকের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের বা কংগ্রেসের মূল নীতি ও আদর্শে প্রতিকূল পন্থা নির্দ্দেশের অধিকার তাঁ'দের দেওয়া হয় নি। কংগ্রেসের সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি ওয়ার্কিং-কমিটিতে নেই,—বর্ত্তমানের এ সমস্যা সম্বন্ধে সকলের মতের ঐক্যও নেই,—সুতরাং এ অবস্থায় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি এবং সমগ্র কংগ্রেসের মত না নিয়ে ওয়ার্কিং-কমিটির নিজের খেয়ালে কোন কিছু ক'রতে যাওয়া শুধু বে-আইনী নয়—গুরুতর অন্যায়। কেবল নিজের দায়িত্বে ওয়ার্কিং-কমিটির সিমলা বৈঠকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না,—বিশেষতঃ সমগ্র প্রস্তাবটিই যখন কংগ্রেসের মূল নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী।

"আমি এখনও, এই শেষ মুহূর্ত্তে মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং-কমিটিকে অনুনয় ক'রছি,—তাঁরা যেন একটু স্থির

চিত্তে ভেবে দেখেন—নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাত দিয়ে তাঁ'রা কত বড় দায়িত্বের বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছেন। ওয়ার্কিং-কমিটি এমন কাজ কেন ক'রতে যাচ্ছেন আমি কিছুতেই বুঝ্‌ছি না। লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জানেন যে ইঙ্গ-মার্কিনের সামরিক সাফল্যে ভারতীয়েরা আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—তারা বুঝ্‌তে পেরেছে এই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির জয় নিশ্চিত। লর্ড ওযাভেল ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের এই সাময়িক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে চান,—লোহা গরম থাক্‌তেই পিটিয়ে গ'ড়তে চান তাঁরা। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন—দু' চার মাস পরেই হ'য়ত জগদ্বাসী বুঝে ফেল্‌বে জার্ম্মানীর পতন হ'লেও সুদূর প্রাচ্যে জাপানকে পরাজিত করা সহজ হবে না। দ্বিতীয়তঃ—লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের নেতাদের ধাপ্পা দিয়ে অন্ততঃ ৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য এবং বহু পরিমাণ সামরিক উপকরণ ব্রিটেনের যুদ্ধে সুদূর প্রাচ্যে পাঠানোর মতলব আঁটছেন। তৃতীয়তঃ—লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫ই জুলাই তারিখের আগেই ভারতের সঙ্গে একটা রফা ক'রতে চান। ঐ তারিখে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন সুরু হ'চ্ছে। লর্ড ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কেন এত ব্যস্ত তার এই তিনটি কারণ। তাই ব'লে কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি তা'দের ফাঁদে পা দেবে কেন? এই সম্পর্কে আমি

আবার ব'লতে চাই—৫ই জুলাই-এর আগে ভারতের সঙ্গে একটা রফা ক'রতে লর্ড ওয়াভেল কেন এত ব্যস্ত।

"আপনারা জানবেন—ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল ভারতীয় সমস্যা যাতে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে না যায় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবে। আর লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব যদি আমরা প্রত্যাখ্যান করি, যেটা ঘ'টবে ব'লে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—ব্রিটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনের পর যে দলই ভোটাধিক্যে জয়লাভ করুক না কেন তা'দের ভারতের সঙ্গে নতুন একটা বোঝাপড়া ক'রতে হ'বে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন সুদূর প্রাচ্যের সুদীর্ঘ মহা-সংগ্রামের কথা ভাব্‌ছে—তাই ভারতের সহযোগিতা তা'র একান্ত দরকার।

"আমার নিজের মত—ব্রিটিশের কাছ থেকে কোন কিছু সুবিধা আদয় ক'রে নেবার প্রয়োজন আমাদের নেই,—আমরা চাই ওরা ভারত ত্যাগ করে। কিন্তু যখন ভারতের অভ্যন্তরে এমন অনেক ভারতবাসী আছেন যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোষের জন্য আগ্রহান্বিত তখন আমি তাঁ'দের বলি—কখন এবং কি ভাবে সেই আপোষ ক'রবেন তাঁ'দের বিশেষ ক'রে ভেবে দেখা উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তা'দের কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রতে হ'লে তার উপযুক্ত সময় হ'চ্ছে ৫ই জুলাই-এর পর। যদিও ব্রিটিশ শ্রমিকদল ভারতের স্বাধীনতা মেনে নেবে এ সম্ভাবনা খুবই কম, তবুও তা'দের নিকট থেকেই অনেক বেশী সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব মেনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে

আপোষ সমর্থন করা যেত মাত্র দু'টি অবস্থায়। প্রথমতঃ—স্বাধীনতা লাভের আশা যদি আমাদের একেবারে না থাকত। দ্বিতীয়তঃ—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিটমাট ক'রবার এই যদি আমাদের শেষ সুযোগ হ'ত। প্রথমটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সাম্প্রতিক সাফল্য সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নষ্ট হয় নি,—বরং বেড়েছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বক্তব্য—৫ই জুলাই-এর পর ব্রিটেনে যে দলই মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করুক না কেন—তা'দের ভারতবাসীকে আপোষ মীমাংসার একটা নতুন সুযোগ অবশ্যই দিতে হ'বে।

"আমার মনে হয়—তিনটি ঘটনার যোগাযোগে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ নিশ্চিত স্বাধীনতালাভ ক'রবে। প্রথম—ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাধা দেওয়া; দ্বিতীয়—ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান; তৃতীয়—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ। ভারতের অভ্যন্তরে নৈতিক বাধাদানই যথেষ্ট। যে ভাবেই হ'ক ভারতবর্ষকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা ক'রে রাখতেই হবে, এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির সাহায্যে বৈদেশিক বিভিন্ন শক্তিকে ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে সহানুভূতি-সম্পন্ন ক'রতে হ'বে। যে সব জাতি আজ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, তা'দের নৈতিক ও সমরোপকরণের সাহায্য আমাদের নিতেই হ'বে। সশস্ত্র অভিযানের সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বল্‌তে চাই,—ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি আমাদের পরাজয় ঘটলেও

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান দল যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'বে না। আমাদের একটি সৈন্যও বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত আমরা লড়াই চালা'ব। আমরা যারা পূর্ব্ব-এশিয়ায় আছি—ভারতের অভ্যন্তরবাসীদের অপেক্ষা তাদের যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বুঝ্‌বার সুযোগ অনেক বেশী। যাঁরা ভারতে আছেন তাঁরা ব্রিটিশের প্রচারকার্য্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়ে ইঙ্গ-মার্কিনের শক্তি প্রকৃত যা' তা'র চেয়ে অনেক বেশী ব'লে ধারণা ক'রছেন। আমাদের দেশবাসী যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারেন তবে আমাদের কাছে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জেনে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তন ক'রবেন।

"যে সব কংগ্রেসসেবীরা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করার কথা ভাবছেন তাঁ'দের ভবিষ্যতের অবস্থাটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। একটু ভেবে দেখলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন—এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলে এমন দিন শীগ্‌গিরই আসবে যখন পূর্ব্ব-এশিয়ায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে কামানের মুখে উৎসর্গ ক'রতে হ'বে। এই বলির জন্য যেন তাঁ'রা প্রস্তুত থাকেন। তা' ছাড়া তাঁ'দেরই দেশবাসী আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে লড়বার জন্যও যেন তাঁ'রা প্রস্তুত থাকেন,—কারণ আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশদের যেখানে পাবে, সেখানেই তা'দের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে। এই সব কংগ্রেসসেবীরা যদি দেশবাসী আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে লড়তে লজ্জাবোধ নাও করেন, তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন চিরস্থায়ী ক'রবার কাজে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে কামানের

মুখে প্রাণ হারাতে পাঠাতে যেন প্রস্তুত না হন। এই যুদ্ধের অবসানে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে যাদের সন্দেহ আছে তা'দের আমি এই বল্‌তে চাই—স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ক'রবার এমন সুযোগ ভারতবর্ষ আর পাবে না।

* * * * *

১৯৪৫ সালের ২৩শে জুন তারিখে সিঙ্গাপুরে সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের রেডিও থেকে নেতাজী ঘোষণা করেন—

"ভারতবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,—গত কাল আমি আপনাদের কাছে বলেছি যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি কংগ্রেসের একটি অংশ মাত্র এবং তা'র অধিকারও সীমাবদ্ধ, এরূপ অবস্থায় তা'র নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন ক'রে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় এবং বে-আইনী। শুধু তাই নয়—আমি ব'লব এটা যুক্তি ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। বাইরের কেহ ইহা দেখলে ওয়ার্কিং-কমিটির এত ব্যস্ততা অশোভন ব'লে মনে ক'রবেন। বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং-কমিটির তুলনায় মিঃ জিন্না অনেক বিজ্ঞতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ ক'রছেন। আমি সংবাদ পেয়েছি—তিনি ঘোষণা করেছেন ২৪শে তারিখে তিনি লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা ক'রবেন এর আগে তিনি মুস্‌লিম লীগের প্রতিনিধিদের সিমলা বৈঠকে যোগদান ক'রতে পরামর্শ দিতে পারেন না। মিঃ জিন্নার অভিসন্ধি যাই হো'ক না, লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব

উপস্থাপিত হওয়া মাত্র তখনই তা' গ্রহণ ক'রতে তিনি হন্তদন্ত হ'য়ে ছোটেন নি। তিনি লর্ড ওয়াভেলকে এই বৈঠক স্থগিত রাখতে অনুরোধ ক'রে আরও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

"আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বল্‌ছি—মহাত্মা গান্ধী যদি বিশেষ সাবধান না হ'ন তা' হ'লে হয়ত লর্ড ওয়াভেল ও মিঃ জিন্না কৌশল ক'রে এমন অবস্থার সৃষ্টি ক'রবেন যা'তে কংগ্রেস কর্ম্মপরিষদে বর্ণহিন্দুর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলির জন্যই মাত্র প্রতিনিধি মনোনীত ক'রতে পা'রবেন। কথাটা অন্যভাবে বল্‌তে গেলে এই দাঁড়ায়—মহাত্মা গান্ধী হয়ত ওঁদের ফাঁদে প'ড়ে ব্যস্ততায় স্বীকার ক'রতে বাধ্য হবেন 'কংগ্রেস' আর 'বর্ণহিন্দুর' কথা একই। অর্থ এ হ'লে হবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক মৃত্যু,—এরপর আর তা'র মাথা তুলে দাঁড়াবার সম্ভাবনা থাকবে না।

"এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় যদি সিমলা বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা জঙ্গীলাটের আসন ব্যতীত অন্য সমস্ত আসনের জন্য নামের তালিকা দাখিল করেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাই কি ক'রবেন? আমি শুনে খুসি হ'লাম কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির সদস্যগণ এমনি একটা কিছু ক'ববার চিন্তা ক'রছেন। কিন্তু চিন্তা ক'রলেই শুধু চ'লবে না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের বড়লাটকে জোর ক'রে বলতে হবে—তিনি যেন কর্ম্মপরিষদের আসনগুলি ধর্ম্মমত বা সাম্প্রদায়িক হিসাবে বণ্টন না ক'রে রাজনৈতিক বা জাতীয় নীতিতে করেন। আমাদের সম্মুখে বিপদ কোথায় তা' ভুল্‌লে

চলবে না। আমার চিরকালের বিশ্বাস—শান্তি বৈঠকের মত রাজনৈতিক গোলটেবিল বৈঠকেও অবিরাম সংগ্রামশীল দলগুলিরই শুধু বসবার অধিকার আছে। ভবিষ্যতে আরও বহু উন্নততর পরিবর্ত্তনের আশ্বাস প্রদানে ব্রিটিশেরা বর্ত্তমানে যে সূচনা-স্বরূপ কর্ম্মপরিষদের আসনগুলি ভারতীয়দের দিতে রাজী হয়েছেন এর মূলে রয়েছে কংগ্রেসের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ —মিঃ জিন্না বা মুস্‌লিম লীগের এতে কোনও কৃতিত্ব নাই। কংগ্রেস তার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে এ যাবৎকাল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ না চালালে কিছুই পাওয়ার আশা ছিল না।

"আমরা এখানে—পূর্ব্ব-এশিয়ায়—৪ঠা জুলাই উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। সকলেই জানেন—৪ঠা জুলাই হ'চ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের দিন। পূর্ব্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ এই দিনেই প্রেরণা লাভ ক'রে রাজনৈতিক জীবনের এক নূতন অধ্যায় সুরু ক'রেছিল। পূর্ব্বএশিয়ায় যেখানেই ভারতীয় আছেন—সেখানেই ৪ঠা জুলাই দিবস পালন করা হবে এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছ থেকেই ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা এখানে হবে। পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়দের আহ্বান ক'রে আমরা ঐ দিনে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁ'দের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মত গ্রহণ ক'রব, এবং তাঁ'রা যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন তা' হ'লে কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ

ক'রলেও আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বাবস্থায় সশস্ত্র অভিযান চালানোর সঙ্কল্প নতুন ক'রে গ্রহণ ক'রব।

"পূর্ব্ব-এশিয়ায় আমাদের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ। প্রথমটি হচ্ছে—১৯৪৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা যে সশস্ত্র অভিযান সুরু করেছি তা' চালিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়—ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনের সৃষ্টি করা এবং তথাকথিত সম্মিলিত জাতি সমূহের—বিশেষ ক'রে সোভিয়েট রুশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন জাতির আভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করা। আমাদের পূর্ব্ব-এশিয়ার সংগ্রামে মালয়ই হবে আমাদের প্রধান কেন্দ্র। ব্রিটিশদের যতদিন মালয় থেকে দূরে রাখা যায়—ততদিন আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিনা বাধায় চলবে। সেইজন্যই ব্রিটিশরা যদি মালয়ে আসতে চেষ্টা করে—আমরা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে বাধা দেব।

"ভবিষ্যতে যখন ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে—সেই ইতিহাসে মালয়বাসী ভারতীয়দের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মালয় প্রবাসী ভারতীয়েরা ধন, জন ও দ্রব্যসম্ভার দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এজন্য ভারতবাসী চিরদিন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। বিশেষ ক'রে এই মালয়ই আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের জন্মস্থান। মালয়ের বহু তরুণ ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে এবং এই মালয় থেকেই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মেয়ে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মালয়-প্রবাসী ভারতীয়েরা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা' তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতে নিশ্চয়ই চেষ্টা ক'রবেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমগ্র-সংহতির আহ্বান প্রথম মালয় থেকেই আসে।

"আজ আমি আপনাদের কাছে আরও লোক, আরও অর্থ ও আরও যুদ্ধ-সামগ্রীর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ব্রহ্মে আমাদের সাম্প্রতিক পরাজয়ের ফলে আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আপনারা অতীতে যা করেছেন সেই কথা ভাবলেই আমার মনে হয়—ভবিষ্যতে আপনারা আরও বেশী করবেন। আমরা যা ক'রছি তা' যে খুবই ন্যায়সঙ্গত—আপনাদের যেন শুধু এই বিশ্বাস অটুট থাকে। যতদিন আপনাদের এই বিশ্বাস থাকবে ততদিন আপনারা আমাদের সাফল্যেও বিশ্বাস ক'রবেন, এবং বিশ্বাস ক'রবেন এই যুদ্ধের শেষে আমরা জয়লাভ ক'রবই। —"জয় হিন্দ"।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন তারিখে সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী বেতার বক্তৃতায় বলেন,—

ভারতবাসী আজ এক রাজনৈতিক সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তের সম্মুখীন হয়েছে,—এখন একটু ভুল ক'রলে স্বাধীনতার পথে তা'দের অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে। এই অবস্থায় আমার যে কি উদ্বেগে দিন কাটছে তা' আপনাদের বলে বুঝাতে পারব না! একদিকে দেখছি স্বাধীনতা আমাদের প্রায়

আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে,—অন্যদিকে দেখছি একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপে তা' বহুদূরে পিছিয়ে যেতে পারে।

"ভারতের অভ্যন্তরস্থ আমার দেশবাসিগণ যদি অস্ত্র ধারণ ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে না পারেন—বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনও যদি না ক'রতে পারেন—তবে অন্ততঃ কোনরকম মিটমাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁ'রা যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নৈতিক বাধা দেন। আমরা অস্ত্র সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার দাবী প্রচার ক'রতে থাকব এবং যতদিন আমরা এইরূপ ক'রব ততদিন ভারত সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যাই হ'য়ে থাকবে। অবশ্য আপনারা ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ ক'রে আমাদিগকে জগতের সম্মুখে অপদস্থ না করেন।"

"আমি জানতে পেরেছি—ভারতের অনেক নেতা—তাঁ'দের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষে আমি বাধা দেওয়ায় আমার উপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি এবং কংগ্রেসের ভুলগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াতেও তাঁ'রা আমার উপর বিরক্ত। তাঁ'রা আরও বিরক্ত হ'য়েছেন—কারণ আমি ব'লেছি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি কংগ্রেস বা দেশের জনমতের প্রতিনিধি নন। এই সব সাম্রাজ্যবাদী নেতারা আমি জাপানীদের সাহায্য নিয়েছি ব'লে আমাকে নিন্দা ক'রছেন। জাপানের সাহায্য নেওয়ার জন্য আমি লজ্জিত নয়। জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা

ক'রবার সর্ত্ত হচ্ছে তারা ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন ক'রবে। সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট বা স্বাধীন ভারত তারা এর মধ্যেই মেনে নিয়েছে; কিন্তু যাঁ'রা এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হ'য়ে তার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহযোগিতা ক'রতে আগ্রহান্বিত তাঁ'রা ত ব্রিটেনের ভারতীয় বড়লাটের অধিনস্থ হ'য়ে কাজ ক'রতে প্রস্তুত। ব্রিটেন ভারত সরকারকে 'স্বাধীন ভারত সরকার' ব'লে মেনে নিলে নেতারা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতেন তা' হ'লে সে ভিন্ন কথা হ'ত। তা' ছাড়া জাপান আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, যে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের ফৌজ গঠন ক'রে আমাদের একমাত্র শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে আমরা সক্ষম হ'য়েছি। এই ফৌজের—অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক শিক্ষাদান হয় ভারতীয় সামরিক শিক্ষকেরই অধীনে ভারীয় ভাষাতেই। এই ফৌজ ভারতীয় জাতীয় পতাকাই বহন ক'রে বেড়ায় এবং ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতই তা'দের জাতীয় সঙ্গীত। এই ফৌজের নায়কেরা সবই ভারতীয় এবং এদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সামরিক বিদ্যালয়গুলির সামরিক শিক্ষাদানও ভারতীয় সামরিক শিক্ষক দ্বারাই হ'য়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে এই ফৌজ ভারতীয় কম্যাণ্ডারদের অধীনে থেকেই যুদ্ধ করে এবং এই সব কম্যাণ্ডারদের অনেকে এখন জেনারেল পদে উন্নীত হ'য়েছেন। এই ফৌজকে নাকি 'পুত্তলি-বাহিনী' (Puppet Army) আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে।

এদের পুত্তলি-বাহিনী না ব'লে ব্রিটিশ বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যদলকে 'পুত্তলি-বাহিনী' বলা সাজে—কারণ তারা ব্রিটিশ অফিসারদের অধীনে থেকে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ক'রছে। ২৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্রিটিশবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সম্মান 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্' লাভের উপযুক্ত —ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য ? আজ পর্য্যন্ত একজন ভারতবাসীও জেনারেল পদে উন্নীত হ'বার উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই।

"ভাই সব,—আমি ত আগেই ব'লেছি, জাপানের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না। আমি একথা সবার সাম্‌নে ব'লবার সাহস রাখি যে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে নতজানু হ'য়ে সাহায্য-ভিক্ষা ক'রতে পারে—তবে আমরা সাহায্য চাইব তাতে দোষ কি ? আমরা ত পরাধীন অস্ত্রহীন অসহায় জাতি—আমরা আমাদের মিত্র-শক্তির কাছে সাহায্য চাইব তাতে হীনতা কি ? আজ আমরা জাপানের সাহায্য নিচ্ছি, সম্ভব হ'লে কাল অপর শক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিতেও দ্বিধা ক'রব না—যদি না তা' ভারতের স্বার্থের প্রতিকূলে হয়। কোনরূপ বৈদেশিক সাহায্য না নিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হ'ত তা' হ'লে আমার চেয়ে বেশী সুখী বোধ হয় আর কেউ হ'ত না। আধুনিক ইতিহাসে আমি ত এমন একটা দৃষ্টান্তও পাই না—যেখানে কোন পরাধীন জাতি অপর শক্তির সাহায্য বিনা নিজের দেশকে স্বাধীন ক'রতে পেরেছে।"

আত্মসমর্পণ

আগষ্ট মাসে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করা সাব্যস্ত ক'রলে নেতাজী সিঙ্গাপুরের জাপানী জেনারেলকে জানান, তাঁ'রা যেন আজাদ হিন্দ ফৌজ কি ক'রবে না ক'রবে সে সম্বন্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ না হন—কারণ আজাদ হিন্দ ফৌজ একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন ফৌজ। জাপানী কম্যাণ্ডার জেনারেল ইটাগাকি (Itagaki) উত্তরে বলেন —এ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেবার ক্ষমতা তাঁ'র নাই, কারণ তাঁকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কম্যাণ্ডার মার্শাল কাউণ্ট তেরায়ূচির নির্দ্দেশ মত চ'লতে হবে। এই কথা শুনে নেতাজী ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্লেনযোগে সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্কক যাত্রা করেন এবং ঐ দিনই সন্ধ্যাকালে তথায় উপস্থিত হ'ন। মালয়ের আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব ক'রতে মেজর জেনারেল কিয়ানিকে তিনি সিঙ্গাপুরে রেখে যান।

১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে তিনি প্রত্যেক শিবিরে গিয়ে প্রত্যেক বাহিনীর কাছে বিদায় নিতে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলেন। সকলের শেষে তিনি এস্, এস্, গ্রুপের কাছে উপস্থিত হ'ন, সেখানে তিনি সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা দেন। এরপর তিনি যে সব অফিসার ও সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য গৌরব ও পুরস্কার লাভ ক'রেছিলেন তাহার ঘোষণা করেন। পরে তিনি সকল অফিসারের সঙ্গে করমর্দ্দন

করেন। সমবেত সৈন্যবৃন্দের কণ্ঠে তখন বজ্রনির্ঘোষে ঘন ঘন —'চলো দিল্লী', 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ', 'নেতাজী জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি উত্থিত হ'তে লাগ্‌ল। নেতাজীর দুই চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। সৈন্যদের কাছ থেকে এমন ক'রে হৃদয়ের পূজা আর কে পেয়েছে?

রাত্রে তিনি সব ঊর্দ্ধতন অফিসারদের নিজের বাংলোতে ভোজে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। এই সময় তিনি নির্দ্দেশ দেন—তাঁর যদি কোন বিপদ্ ঘটে তখন তাঁরা কি ক'রবেন। পরদিন সকালে কয়েকটি বিশেষ মনোনীত ষ্টাফ্ অফিসার সঙ্গে নিয়ে তিনি সাইগন যাত্রা করেন। সেখানে ফিল্ড্ মার্শাল কাউন্ট তেরায়ুচির সঙ্গে দেখা ক'রে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণের সব কিছু ঠিক ক'রবেন। দেখা হ'লে কাউন্ট তেরায়ুচি বল্‌লেন—তিনি এ সম্বন্ধে কিছু ব'লতে পারেন না, এ বিষয়ে নির্দ্দেশ আস্‌বে টোকিও থেকে। তার পর দিনই নেতাজী কর্ণেল হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে এরোপ্লেনে সাইগন ত্যাগ করেন। কর্ণেল হবিবুর রহমান বলেন—টোকিও যাবার পথে ফরমোসা বিমান ঘাঁটি থেকে তাঁ'দের বিমান যাত্রা ক'রলে হঠাৎ তাতে কিসের একটা আঘাত লাগে—আঘাতটা বেশ গুরুতর। কর্ণেল হবিবুরের ধারণা একটা শকুনি এসে একটা পাখার (Propeller) উপর পড়েছিল। মাটি থেকে তখন তাঁ'রা প্রায় ৩০০ ফুট উপরে ছিলেন। এই আঘাতে বিমানটি বিমান-ঘাঁটির কাছেই একটা

পাহাড়ের গায়ে প'ড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা'তে আগুন ধ'রে যায়। হবিবুর রহমান তখনই বিমান থেকে লাফিয়ে নেমে জ্বলন্ত বিমানের ভিতর থেকে নেতাজীকে টেনে বের করেন। কর্ণেল হবিবুর নিজেও গুরুতররূপে আহত হ'য়েছিলেন—তাঁর দু'টি হাত ও মুখে এখনও পোড়ার দাগ আছে। তাঁ'র প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়, নেতাজীর মাথার দুই জায়গায় ভীষণ আঘাত লেগেছিল, আঘাতটা বেশ গুরুতর হ'লেও আধ ঘণ্টা তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল, এরপর তিনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। তখন তাঁ'দের দুইজনকেই একই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্ণেল হবিবুরের প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ—এর ছয় ঘণ্টা পরে নেতাজীর মৃত্যু হয়। এরপর কর্ণেল হবিবুর তাঁর দেহ সিঙ্গাপুরে নিয়ে আস্‌বার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিমান চলাচলের অসুবিধা থাকায় তা' সম্ভব হয় না। এরপর নেতাজীর সৎকার করা হয়। কর্ণেল হবিবুর রহমান বলেন—নেতাজীর সৎকারের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি নেতাজীর দেহ-ভস্ম টোকিও-র এক বাড়ীতে যত্নের সঙ্গে তুলে রেখে এসেছেন। এরপর ব্রিটিশ সৈন্যদল সিঙ্গাপুর এবং ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হ'লে মেজর জেনারেল এম্, জেড, কিয়ানি এবং মেজর জেনারেল ভোঁসলার অধীনস্থ ওখানকার আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বাধীন দেশের সৈন্যদলের মত ব্রিটিশদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের যে উজ্জ্বল অধ্যায়টি নেতাজী

সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক আরম্ভ হ'য়েছিল, এই ভাবে তার করুণ উপসংহার হয়।

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

ভারতবর্ষে এসে একটা জিনিস আমরা সকলেই লক্ষ্য ক'রলাম। আমরা দেখ্‌লাম এখানে যাঁরা আছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের যথার্থ স্বরূপ এবং কার্য্যকলাপ তাঁরা এক রকম কিছুই জানেন না। ব্রিটিশ প্রচারের ফলেই এটা সম্ভব হ'য়েছে। সাইগন, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর এবং রেঙ্গুন এই চারটি বেতার-কেন্দ্র থেকে আমরা খবর পাঠিয়েছি কিন্তু ব্রিটিশ প্রচারকের দল আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। আমরা এসে দেখলাম, এখানকার অধিবাসীরা মনে করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের হাতের পুত্তলি-বাহিনী মাত্র ছিল।

ব্রিটিশ সামরিক বিচারে ভাগ্যে কি আছে সে চিন্তার চেয়ে এই ব্যাপারেই আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারেরা মনোকষ্ট ভোগ ক'রতে লাগ্‌লেন বেশী। দেশের কোন কোন নেতা আমাদের সম্বন্ধে ব'ল্‌লেন—'ভ্রান্তপথে চালিত ভারতীয় সৈনিক'। এই সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কারাগার থেকে মুক্ত হ'য়ে দেশবাসীর কাছে সকল তথ্য বিবৃত ক'রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করেন —আজাদ হিন্দ ফৌজ এর জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

৺ভুলাভাই দেশাই আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য যা

ক'রেছেন সে কথা আমরা জীবনে ভুলব না। আসামী অবস্থায় সাইগল, ধীলন এবং আমার সঙ্গে প্রথম যেদিন তাঁর দেখা হয় সেদিনের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ব'ল্লেন—"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের পক্ষ সমর্থন ক'রতে এসেছি বটে, কিন্তু আপনাদের রক্ষা করার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হ'চ্ছে—নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করা। আপনাদের প্রাণ যদি আমি সম্মানের সঙ্গে বাঁচাতে পারি ত বাঁচাব—নইলে আপনাদের নেতাজীর এবং যে প্রতিষ্ঠানের লোক আপনারা, তার সম্মান রক্ষা ক'রবার জন্য আপনাদের সকলের প্রাণ দেওয়াই ভাল।" ইহা তিনি আমাদেরই প্রাণের কথা ব'ললেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক অফিসার এবং সৈনিকেরা ঠিক এইটিই চায়।

এই সময় মিঃ ভুলাভাই দেশাই-এর শারীরিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। ডাক্তার তাঁকে সতর্ক ক'রবার জন্য বলেছিলেন—"মিঃ দেশাই, বড় বেশী পরিশ্রম ক'রছেন আপনি। এত খাট্‌লে আপনি মারা প'ড়বেন।" ভুলাভাই উত্তর দিলেন—"ভাবনা কি ডাক্তার? আমার প্রাণ যদি যায় যা'ক, এই তিনটি তরুণ প্রাণ ত বাঁচ্‌বে।" কি অদম্য তেজ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে আমাদের মোকদ্দমা চালিয়ে তিনি জয়লাভ ক'রলেন—এইটিই তাঁ'র জীবনের শেষ মহা-বিজয়। আমরা মুক্তি পেলাম। এতে তাঁ'র মত এত আনন্দ বুঝি ভারতের আর কারো হয় নি।

১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে বোম্বাই-এ আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই,—তিনি তখন মৃত্যু-শয্যায়। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েন। তিনি ব'ল্‌লেন—"আমার ম'রতে আর ক্ষোভ নেই, তোমাদের জীবন্ত ফিরে পেয়েছি। তোমাদের কাছে আমার শেষ কথা এই—যে সংগ্রাম ক'রতে গিয়ে তোমরা এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রেছ, সে সংগ্রাম তোমরা কিছুতে পরিত্যাগ ক'রো না। আমি জানি শেষ পর্য্যন্ত নেতাজী নিশ্চিত জয়লাভ ক'রবেন এবং ভারত স্বাধীন হবে। জয় হিন্দ"—এই ব'লেই তিনি চক্ষু মুদ্রিত ক'রলেন।

———

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

১। মেজর জেনারেল জে, কে, ভোঁসলা

ইনি প্রথমে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর ৫ম 'মারহাট্টা লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রী'তে কাজ ক'রতেন। স্যাণ্ডহার্ষ্টের (Sandhurst) রয়াল মিলিটারী কলেজ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সামরিক বিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট (graduate) হ'ন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি ১৮শ 'রয়াল গাড়োয়াল রাইফেলস্'-এব ৫ম ব্যাটেলিয়ানের নেতৃত্ব ক'রছিলেন। তখন ইনি লেফ্‌ট, কর্ণেলের পদে অধিষ্ঠিত। ইহার দেশপ্রীতির তুলনা নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজে প্রথমে যাঁ'রা যোগদান করেন—ইনি তাঁ'দেরই একজন।

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যে বাহিনীর নেতৃত্ব করেন, তাহাতে ছিল ৩টি ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়ান, ১টি হেভীগান ব্যাটেলিয়ান, ১টি সাজোয়া-গাড়ী বাহিনী এবং আরও কয়েকটি গোলন্দাজ দল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন তখনও ইনি ব'লেছেন—আজাদ হিন্দ দল ভাঙ্গা উচিত হবে না, ভারতের বাহিরের ভারতীয়দের মাতৃভূমির সেবা ক'রবার এ এক অপূর্ব্ব সুযোগ।

আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত হ'লে কর্ম্মনৈপুণ্যের জন্য এঁকে 'মিলিটারী বুরো'র ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৩

সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ঐ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত ইনি আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ণধার ছিলেন—তা'র পর নেতাজী এসে তা'র সর্ব্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল ভোঁসলার কর্ত্তৃত্বে যতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল, ততদিন বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি তা'র পরিচালনা করেন।

এঁর সংগঠন-শক্তি অদ্ভুত, সমরকৌশলও প্রশংসনীয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আগমনের পর মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টারের পদ উঠিয়ে দেওয়া হয়, জেনারেল ভোঁসলা তখন প্রধান সহকারী (Chief of Staff) পদে নিযুক্ত হ'ন। এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় পদ-মর্য্যাদায় নেতাজীর পরেই হ'লেন তিনি।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে নেতাজী যখন ব্রহ্মদেশে যান তখন মালয়ের কাজ পরিচালনার ভার দিয়ে যান তিনি জেনারেল ভোঁসলার উপর। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজী যখন বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করেন, তখন তিনি জেনারেল ভোঁসলার উপর ব্যাঙ্ককে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান হেড্‌কোয়ার্টার্সের ভার দিয়ে যান। এইখানেই ব্রিটিশ সৈন্যরা তাঁ'কে বন্দী করে।

সাময়িক আজাদ্ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন, তা' ছাড়া সমর-পরিষদের সদস্যও ছিলেন।

জেনারেল ভোঁসলা মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবাজীর বংশধর এবং বরোদার গাইকোয়াড়ের আত্মীয়।

২। মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জি

মেজর জেনারেল চ্যাটার্জ্জি একজন পুরানো আই, এম্, এস্, অফিসার। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় এঁর সরকারী চাকুরির ২৬ বৎসর পূর্ণ হয়।

মালয়ে যাবার আগে তিনি বাঙলার 'পাবলিক্ হেল্‌থে'র ডিরেক্টার ছিলেন।

সিঙ্গাপুরের পতনের সময় সেখানে আই, এম্, এস্, অফিসারের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি যুদ্ধবন্দীদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপার দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি জেনারেল মোহন সিং-এর অন্যতম পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ ক'রতেন।

স্বাধীনতা আন্দলনের আরম্ভ থেকে তিনি তা'তে যোগ দিয়ে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ ক'রতে থাকেন। তিনি বহু সভার আয়োজন ক'রে সৈন্যদলের কাছে প্রচার-মূলক বক্তৃতা দিয়ে বহু-সংখ্যক অফিসার ও সৈন্যদের আজাদ হিন্দ ফৌজ-ভুক্ত করেন।

মিঃ রাসবিহারী বোসের তিনি বিশেষ অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কটকালে জেনারেল মোহন সিং যখন তা' ভেঙ্গে দিতে চান, তখন তিনি তা'র বিরুদ্ধে ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের পর তাঁকে মিঃ রাসবিহারী

বোসের অধীনে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের সেক্রেটারী করা হয়।

নেতাজী আসবার পর তাঁর উপর প্রচার (Publicity & Propaganda) বিভাগের ই, ও সি, শাখার ভার দেওয়া হয়।

১৯৪৪ সালের যুদ্ধের সময় তাঁ'কে ভারতের পরাধীনতা-মুক্ত এলাকার গবর্ণর নির্ব্বাচিত করা হয়—মণিপুর এলাকায় তাঁ'রই গবর্ণর হ'বার কথা ছিল।

১৯৪৪ সালের জুন মাসে তিনি যুদ্ধরত সৈন্যদল এবং তা'দের দ্বারা পরাধীনতামুক্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন ক'রতে যান—এই সময় শক্র-কামানের গোলার আঘাতে তিনি সামান্য আহত হ'ন।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি রেঙ্গুনে ফিরে এসে নেতাজীর সঙ্গে টোকিও যান। সেখান থেকে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁ'রা ফিরে আসেন।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে তিনি সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত হ'ন।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজী যখন শেষ বার টোকিও যাত্রা করেন তখন তাঁর দলে তিনিও ছিলেন। কিন্তু বিমানের অভাবের জন্য দলের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তাঁকেও নেতাজী সাইগনে রেখে যান। পরে সেইখানেই ব্রিটিশ সৈন্যদলের হাতে এঁ'রা সবাই বন্দী হ'ন।

আজাদ হিন্দ ফৌজে তিনিই ছিলেন নেতাজীর একজন

শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত অফিসার এবং সবার চেয়ে অভিজ্ঞ। তিনি অত্যন্ত স্বদেশ-প্রেমিক ও একজন অক্লান্ত-কর্ম্মী। সংগঠন ব্যাপারে তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য আছে। তাঁর অধীনে কাজ করা এক আনন্দের বিষয়। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স এখন প্রায় ৫৫—তাঁ'র দেশ কলিকাতায়।

৩। মেজর জেনারেল এম্, জেড্, কিয়ানি

ইনি প্রথমে ১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ১ম ব্যাটলিয়ানে কাজ ক'রতেন। ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫ সালে ইনি 'কমিশান' প্রাপ্ত হ'ন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময়ই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তরবারি (Sword of Honour) ও স্বর্ণপদক (Gold Medal) পুরস্কার লাভ করেন।

মালয় অভিযানে 'তৃতীয় ইণ্ডিয়া কোর'-এর কম্যাণ্ডার জেনারেল হীথ-এর (Gen. Heathe) 'ষ্টাফ্ অফিসার' রূপে কাজ ক'রতেন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় তিনি তাঁ'র ব্যাটেলিয়ানের দ্বিতীয় অধিনায়ক ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনায়ই তিনি তাতে যোগ দেন। জেনারেল মোহন সিং যখন প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন তখন জেনারেল ষ্টাফের অধিনায়ক-স্বরূপে এই ফৌজ সংগঠন প্রধানতঃ জেনারেল কিয়ানিরই কীর্ত্তি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কটকালে জেনারেল মোহন সিং যখন তা' ভেঙ্গে দিতে চান তখন তিনিও তা'তে মত দেন,

কিন্তু পরে যখন নিশ্চিত ক'রে বুঝ্‌লেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এর অধিনায়কত্ব ক'রতে আস্‌ছেন তখন তিনি এতে থাকাই সাব্যস্ত করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের পর ইনি মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টার জেনারেল ভোঁসলার 'আর্মি কম্যাণ্ডার' পদে নিযুক্ত হ'ন।

নেতাজীর আগমনের পর ইনি ১নং ডিভিশানের নেতৃত্ব নিয়ে ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ ক'রতে যান। ৩টি ব্রিগেড তাঁর অধীনে ছিল, যথা—

১নং গেরিলা ব্রিগেড (সুভাষ ব্রিগেড)—নায়ক, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান।

২নং গেরিলা ব্রিগেড (গান্ধী ব্রিগেড)—নায়ক, কর্ণেল আই, জে, কিয়ানি।

৩নং গেরিলা ব্রিগেড (আজাদ ব্রিগেড)—নায়ক, কর্ণেল গুলজারা সিং।

১৯৪৪ সালে এই ডিভিশান আরাকান, হাকা-ফালম, তামু-পালেল এবং কোহিমা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে।

১৯৪৪ সালের অক্টোবরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবৃত্ত হ'বার পর মেজর জেনারেল কিয়ানি সমর-পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হ'য়ে ঐ বৎসরই নেতাজীর সঙ্গে টোকিও-য় যান।

আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণের সময় তিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্যদলের নেতৃত্ব ক'রছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুদক্ষতম কম্যাণ্ডার, কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বেশী নাম ছিল ষ্টাফ্ অফিসার হিসাবে।

তাঁর বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৫৬ বৎসর। রাওয়ালপিণ্ডির এক বিখ্যাত বংশে তাঁর জন্ম।

৪। মেজর জেনারেল এ, ডি, লোগনাথন

ইনি একজন আই, এম্, এস্, অফিসার। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় এঁর সরকারী চাকুরির ২৫ বৎসর পূর্ণ হ'য়েছিল। এই সময় ইনি লেফ্‌ট, কর্ণেলের পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৯নং ভারতীয় হাসপাতালের কর্ত্তৃত্ব ক'রছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের পর যে সব অফিসার প্রথমেই ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেন—ইনি তাঁদেরই একজন। আন্দোলনে যোগ দেবার পর ইনি বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে প্রচার-কার্য্য চালিয়ে বহু লোককে দলভুক্ত করেন। জেনারেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীনে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজে ইনি মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টার ছিলেন। ব্যাঙ্কক বৈঠকে যে সব ভারতীয় প্রতিনিধিরা যোগদান করেন ইনি ছিলেন তাঁদের একজন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কটকালে জেনারেল মোহন সিং যখন তা' ভেঙ্গে দিতে চান তখন ইনি তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কটকালে যে পরিচালক-সমিতি গঠিত হয় ইনি তা'র সদস্য হ'য়ে অফিসারদের ভিতরে

যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেন তারই ফলে পরে রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠনে সমর্থ হ'ন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন সামরিক পদে লোক নিযুক্ত ক'রবার জন্য মিঃ রাসবিহারী বসু যে এক্‌জিকিউটিভ কমিটি গঠিত করেন, ইনি তা'রও সদস্য ছিলেন।

মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টার, জেনারেল ভোঁসলার নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজে ইনি চীফ এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটাররূপে কাজ ক'রেছেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাক্‌বার সময় ইনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ শাসন-শৃঙ্খলার জন্য দায়ী ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আস্‌বার পর যখন সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তখন এঁকে তার একজন সচিব করা হয়। ১৯৪৪ সালে এঁকে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপের হাই কমিশনার ক'রে পাঠান হয়। এই দু'টি দ্বীপ-পুঞ্জকে ভারতের অংশ-বিশেষ বিবেচনা ক'রে জাপানীরা সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের হাতে দেয়। এদের নূতন নামকরণ হয়—'শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ'। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ইনি সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন।

১৯৪৫-এর প্রথমে ইনি নেতাজীকে এঁর কাজের রিপোর্ট দেবার জন্য রেঙ্গুনে আসেন।

ব্রহ্মদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণের সময় ইনি স্বেচ্ছায় সেখানে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এঁর বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৫৬। আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল অফিসারই এঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং 'চাচা' নামে সম্বোধন করেন।

নিজের মাতৃভূমিকে ইনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও ইনি একজন অক্লান্তকর্ম্মী। তাঁ'র মধুর ব্যবহারের জন্য তাঁ'র অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁ'কে বিশেষ ভালবাসে।

৫। মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ

এই অফিসারটি কপুরথলা ইন্‌ফ্যান্ট্রি সৈন্যদলভুক্ত ছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি মেজর পদে অধিষ্ঠিত থেকে ঐ ষ্টেট্ সৈন্যদলের (State Forces) নেতৃত্ব ক'রছিলেন। প্রথমে জাপানীদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে ইনি সন্দিহান ছিলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনেও আস্থা ছিল না কিন্তু পরে সে মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় ইনি ১৯৪১ সালের মে মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। এঁর ধারণা হয়—এই দলে যোগ দিয়ে ইনি নিজের সৈন্যদের অনেক উপকার ক'রতে পার্‌বেন, তা' ছাড়া জাপানীরাও তা'দের নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে নিয়োগ ক'রতে পার্‌বে না। ব্যাঙ্কক বৈঠকে ইনিও একজন সদস্য ছিলেন। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজে ইনিই নেহরু ব্রিগেড গঠন ক'রে তা'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মোহন সিং যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে দেবার মনস্থ করেন—তখন ইনি তাঁ'কে বিশেষভাবে সমর্থন করেন।

জেনারেল মোহন সিংকে বন্দী ক'রবার পর জেনারেল ইয়াকুরো এবং মিঃ রাসবিহারী বসু এঁকে ডেকে পাঠিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ করেন কিন্তু ইনি তাতে অসম্মত হন। পরে তাঁ'কে যখন আশ্বাস দেওয়া হয় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এসে এই ফৌজের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ ক'রবেন তখন তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে থাকা সাব্যস্ত করেন। মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টার, জেনারেল ভোঁসলার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত হ'লে তিনি নেহরু ব্রিগেডের নেতৃত্বই ক'রতে থাকেন। নেতাজীর আগমনের পর সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হ'লে তিনি তা'র একজন সচিব নিযুক্ত হ'ন।

১৯৪৪ সালের মে মাসে তিনি তাঁ'র ব্রিগেড নিয়ে ব্রহ্মদেশে আসেন কিন্তু নবগঠিত ২নং ডিভিশানের নেতৃত্ব ক'রবার জন্য শীঘ্রই তাঁ'কে মালয়ে যেতে হয়। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের প্রথম দিকে ২নং ডিভিশানের অগ্রণী দল নিয়ে তিনি রেঙ্গুনে ফিরে আসেন।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি সমর-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ঐ সালের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নেতাজীর টোকিও অবস্থান কালে তিনি তাঁ'র জায়গায় সর্ব্বাধিনায়কত্বের কাজ করেন।

১৯৪৫ সালের প্রথমদিকে ২নং ডিভিশানের প্রধান অংশ যখন রেঙ্গুনে সমবেত হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আয়োজন ক'রছিল তখন তুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বোমার আঘাতে

গুরুতর আহত হ'য়ে হাসপাতালে যান—ফলে আমাকে (মেজর জেনারেল শাহনওয়াজকে) ২নং ডিভিশানের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রতে হয়। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সুস্থ হ'য়ে ফিরে আস্‌বার পর তাঁকে ১নং ডিভিশানের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। ১নং ডিভিশান তখন জিয়াওয়াদিতে (Zeyawadi) অবস্থান ক'রছিল। এই ডিভিশানের অধিকাংশ সৈন্য ১৯৪৪ সালে ইম্ফল এলাকায় যুদ্ধ ক'রে এসেছে। তা'দের রুগ্ন শরীর, অস্ত্রশস্ত্র সমরোপকরণ অতি সামান্য, সুতরাং জিয়াওয়াদি এসে ব্রিটিশদের সাজোয়া বাহিনীর সামনে তারা দাঁড়াতে পার্‌ল না। মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে জিয়াওয়াদিতে সমগ্র ডিভিশান সমেত আত্মসমর্পণ ক'রতে হয়।

মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ নেতাজীর অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। নেতাজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত ছিলেন। বড় বড় সৈন্য-ব্যূহ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—তা' ছাড়া নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের শিক্ষাদান ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি বক্তাও ছিলেন ভাল—বক্তৃতা দ্বারা তিনি বৃহৎ বৃহৎ জনতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ক'রতে পার্‌তেন।

কপুরথলার এক সম্ভ্রান্ত রাজপুতবংশে তাঁর জন্ম, বয়স বর্ত্তমানে চল্লিশের কাছাকাছি—দেহ সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ।

৬। মেজর জেনারেল জি, আর্, নাগর

ইনি আর্, আই, এ, এস্, সি,-র অফিসার। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি লেফ্‌ট, কর্ণেল ছিলেন। আত্মসমর্পণের পর এঁকে বিদদরি যুদ্ধ-বন্দী শিবিরের কর্ত্তৃত্বভার দেওয়া হয়। এই শিবিরে তখন প্রায় ১৫০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে বেতার-কেন্দ্রের ভার দিয়ে এঁকে সাইগনে পাঠানো হয়। এঁর বেতার-ঘোষণা এবং মন্তব্য যুদ্ধের সময় ভারতবাসী অনেকেই শুনেছেন। বেতার-ঘোষণায় মেজর মির্জ্জা নামে পরিচিত। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ইনি সাইগন থেকে ফিরে আসেন। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি ৩নং ডিভিশান গঠিত হ'লে ইনি তার কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ এর অভিযানে মালয়ের পশ্চিম উপকূলে অলর্‌্যাষ্টর (Alorastar), সেরামবাগ এবং ইপো (Ipoh) এলাকা রক্ষা ক'রবার ভার এঁর উপর অর্পিত হয়। ঐখানে ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনী এলে সিঙ্গাপুরের আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কের আদেশে ইনি নিজের ডিভিশানের সৈন্যদের নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

ইনি একজন সুবক্তা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসাহী কর্ম্মী।

৭। মেজর জেনারেল আল্লাগাপ্পন

ইনি একজন আই, এম্, এস্, অফিসার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি লেফ্‌ট, কর্ণেল পদে অধিষ্ঠিত

থেকে ২৭শ আই, জি, এইচ,-এর নেতৃত্ব ক'রছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনীর একজন শ্রেষ্ঠ সার্জ্জেন হিসাবে এঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণের পর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের প্রারম্ভেই ইনি স্বেচ্ছায় তা'তে যোগদান করেন। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের পর তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘে কাজ ক'রতে যান। ১৯৪২ সালের মে মাস থেকে ১৯৪৩ সালের জুলাই পর্য্যন্ত ঐ কাজ করেন। এরপর নেতাজী এঁকে আজাদ হিন্দ ফৌজে এনে উহার জ্ঞান ও কৃষ্টি-বিভাগের (Enlightenment and Culture department) ভার দেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য সৈন্যদলের সঙ্গে ইনি সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক, বয়স বর্ত্তমানে ৪৫-এর কাছাকাছি, ইনি সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী।

৮। কর্ণেল এ, কিউ, গিলানি

কর্ণেল গিলানি বাহাওয়ালপুব ষ্টেট্ ইন্‌ফ্যান্ট্রির ১ম ব্যাটেলিয়ানের অফিসার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় তিনি লেফ্‌ট, কর্ণেল ছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ব্যাপারে তিনি জেনারেল মোহন সিং-এর যথেষ্ট সাহায্য করেন। সাধারণতঃ তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা ব'লে বিবেচিত হ'তেন।

তিনি প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যাঙ্কক্ বৈঠকে যান এবং

মিঃ রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে কর্ম্মপরিষদের (Council of Action) সদস্য হ'ন। আজাদ হিন্দের সঙ্কটকালে তিনি পরিষদের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে পেনাঙে যান। সেখানে গিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশকারী আজাদ হিন্দের প্রচারকদের শিক্ষা দেওয়ার একটি বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে তাঁ'কে আবার সিঙ্গাপুরে এনে তাঁর উপর ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের নূতন সৈনিক সংগ্রহ ও শিক্ষাদান বিভাগের (Recruiting and Training Department) ভার অর্পণ করা হয়।

ব্রিটিশ সৈন্যদল সিঙ্গাপুর পুনরধিকার ক'রবার সময় তাঁকে বন্দী করে।

কর্ণেল গিলানির জন্ম বাহাওয়ালপুর রাজ্যের বিখ্যাত গিলানি সৈয়দ বংশে, বর্ত্তমান বয়স প্রায় চল্লিশ। হিন্দুস্থানীতে তিনি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারেন।

৯। কর্ণেল এন্, এস্, ভগত

ইনি 'ভারতীয় স্থাপত্য' (Indian Engineers) বিভাগের লোক। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি 'ফিল্ড্ কোম্পানী অব্ বম্বে স্যাপার্স্ এ্যাণ্ড মাইনার্স্'-এর নেতৃত্ব ক'রছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপানীরা স্বকার্য্য-সাধনে ব্যবহার ক'রতে পারে আশঙ্কায় ইনি ওর গঠন-ব্যাপারে অত্যন্ত বাধা দেন। এই বিষয়ে ইনি কোন প্রকার

আপোষের পক্ষপাতী ন'ন বুঝে এঁকে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে সিঙ্গাপুর থেকে বোর্ণিওয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্কক বৈঠক থেকে প্রতিনিধিরা ফিরে এলে এঁকে আবার ১৯৪২এর সেপ্টেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে ডেকে পাঠান হয়। পরে যখন বুঝ্‌লেন, তিনি যোগদান করুন আর নাই করুন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হবেই—তখন তিনি ঐ ফৌজে যোগদান করা সাব্যস্ত করেন। কারণ তাঁ'র বিশ্বাস ছিল তিনি এতে ঢুক্‌লে জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিজেদের কাজে লাগাতে গেলে বাধা দিতে পার্‌বেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কটকালে জেনারেল মোহন সিং-কে নিজের দাবীতে দৃঢ় থাক্‌তে এবং প্রয়োজন হ'লে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙ্গে দিতে যাঁ'রা পরামর্শ দিয়েছিলেন কর্ণেল ভগত তাঁদের একজন অগ্রণী।

জেনারেল মোহন সিং-কে বন্দী করা হ'লে কর্ণেল ভগত আজাদ হিন্দ ফৌজ ত্যাগ করেন এবং নেতাজী না আসা পর্য্যন্ত বহু উচ্চপদের প্রলোভন দেখানো সত্বেও তিনি ফৌজে পুনরায় যোগ দিতে অস্বীকার করেন।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিনি আবার আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। এরপর থেকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ফৌজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নেতাজীর সর্ব্বাধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার্স পুনর্গঠিত হ'লে তিনি এর প্রধান পরিচালকের (Chief Administrator) পদে নিযুক্ত হন। সাময়িক আজাদ

হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাঁকে ইহার একজন সচিব করা হয়।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে ২নং ডিভিশান গঠিত হ'লে তাঁ'কে তা'র কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁ'র কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে জেনারেল ভোঁসলার সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় ২নং ডিভিশানের নেতৃত্বপদ থেকে তাঁ'কে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং তাঁ'র জায়গায় নিযুক্ত হন কর্ণেল আজিজ আহম্মদ।

২নং ডিভিশান থেকে সরিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখ্‌বার জন্য তাঁ'কে শান রাজ্যের তোয়াঙ্গি্য নামে একটা পার্ব্বত্য স্থানে রাখা হয়।

১৯৪৫ সালের প্রথমে কর্ণেল ভগতকে জিয়াওয়াদিতে স্থানান্তরিত করা হয়, পরে সেখানে ব্রিটিশ সৈন্যদল উপস্থিত হ'লে তিনি তা'দের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

কর্ণেল ভগত যতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলেন ততদিন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তা'র জন্য খাট্‌তেন। বস্তুতঃ আজাদ হিন্দ ফৌজে সুদক্ষ ও জনপ্রিয় অফিসার যতগুলি ছিলেন তার মধ্যে তিনি একজন।

তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, জাপানীদের তিনি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। রাজনৈতিক-মতে তিনি ছিলেন একান্ত জাতীয়তাবাদী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ

তাঁ'কে আমার এবং আমার তুইজন সহকর্ম্মী কর্ণেল পি, কে, সাইগল ও জি, এস্, ধীলনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য এবং নেতাজীর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে বলেন,—কিন্তু কর্ণেল ভগত তাতে রাজী হন নি,—ফলে তাঁ'কে ভারতীয় সৈন্যদলের 'কমিশান' ত্যাগ ক'রবার আদেশ দেওয়া হয়।

১০। কর্ণেল ইশান কাদির

কর্ণেল ইশান কাদির ৫।২ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অফিসার। মালয় যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি তাঁ'র ব্যাটেলিয়ানের য়্যাড্জুট্যাণ্ট ছিলেন।

১৯৩৫ সালে তিনি ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় থেকে 'কমিশান' প্রাপ্ত হ'ন—সিঙ্গাপুরের পতনের সময় তাঁর সামরিক চাকুরির ৮ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল। তিনি এই সময় ক্যাপ্টেনপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ক্যাপ্টেন মোহন সিং তাঁ'কে কুয়েলা লামপুর এলাকায় বন্দী ক'রে সাইগনের একটি বেতার-কেন্দ্রের ভার দিয়ে সেখানে পাঠান।

সাইগন থেকে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে বেতারে যে বক্তৃতা দেওয়া হ'ত, তার কথা হয় ত ভারতবাসীদের আজও মনে আছে। এ সকল বক্তৃতাই হ'ত কর্ণেল ইশান কাদিরের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে।

জেনারেল মোহন সিং ও জাপানীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে মোহন সিং যাতে আজাদ হিন্দ'ফৌজ না

ভেঙ্গে দেন তারই চেষ্টা ক'রতে তিনি সাইগন থেকে চ'লে আসেন।

দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ মিলিটারী বুরোর ডিরেক্টার, জেনারেল ভোঁসলার নেতৃত্বাধীনে থাক্‌বার সময়—অসামরিক স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষাদানের ভার তাঁ'কে দেওয়া হয়।

সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের একজন সচিব নিযুক্ত হন। নেতাজী গবর্ণমেণ্টের হেড্‌কোয়ার্টার্স সিঙ্গাপুর থেকে যখন রেঙ্গুনে নিয়ে যান ইনিও সেই সময়ে রেঙ্গুনে যান।

রেঙ্গুনে তিনি অসামরিক লোকদের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ দল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। এই দলের লোকদের অধীনতামুক্ত অঞ্চলের শাসনকার্য্য পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ণেল ইশান কাদির এই দলটি নিয়ে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে মেমিও-য় (Maymyo) যান।

মণিপুর অভিযান ব্যর্থ হ'লে তিনি ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে রেঙ্গুনে ফিরে আসেন। তিনি সমর-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে পেগু-তে ব্রিটিশ সৈন্যদলের হাতে তিনি বন্দী হ'ন।

ভারতের রাজনৈতিকসমস্যা সম্বন্ধে কর্ণেল ইশান কাদিরের যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তা' ছাড়া কোন কিছু সংগঠন ও পরিকল্পনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

লাহোরের স্যার আবদুল কাদির এঁর পিতা। এঁর বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৩৩ বৎসর।

১১। কর্ণেল এস্, এম্, হুসেন

ইনি ৪।১৯শ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্টের অফিসার—সিঙ্গাপুরের পতনের সময় ইনি ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজে ইনি জেনারেল ভোঁসলার ষ্টাফ্ অফিসার ছিলেন। এই সময় জেনারেল ভোঁসলা 'হিন্দ ফিল্ড ফোর্স'-এর নেতৃত্ব ক'রছিলেন।

দ্বিতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন হ'লে এঁকে ১ম ইন্ফ্যাণ্ট্রি রেজিমেণ্টের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে রেজিমেণ্টের অগ্রগামী দল নিয়ে ইনি রেঙ্গুনে উপস্থিত হ'ন, কিন্তু ভারী অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় এঁর বাহিনী ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীর আগে রেঙ্গুন ছেড়ে এগুতে পারে নি। ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে ইনি রণাঙ্গনে উপস্থিত হ'য়ে ব্রহ্মের তৈলখনি-অঞ্চলের সংলগ্ন ম্যাগুই-তোয়ানডুইঙ্গ্যি এলাকার রক্ষাভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাগুই-তে ইনি ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

কর্ণেল হুসেন সাময়িক আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী-পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

লায়ালপুরের এক বিখ্যাত সৈয়দ বংশে এঁর জন্ম, বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৩৩ বৎসর।

১২। কর্ণেল হবিবুর রহমান

কর্ণেল হবিবুর রহমান ১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অফিসার। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁ'র ব্যাটেলিয়ান যখন জিত্রায় যুদ্ধ ক'রতে যায় তখন তিনি তা'র য়্যাড্‌জুট্যাণ্ট ছিলেন।

১৯৩৬ সালে ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয় থেকে তিনি 'কমিশান' প্রাপ্ত হ'ন এবং জাপানীদের নিকট আত্মসমর্পণের সময় তিনি ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কুয়েলা লামপুর এলাকায় তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী হ'ন। জাপানীদের তিনি কখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতেন না। তাঁ'র মতে ভারতের স্বাধীনতালাভের একমাত্র পন্থা হ'চ্ছে পূর্ব্ব-এশিয়ায় শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে ভারতে যারাই প্রভুত্ব ক'রতে চেষ্টা করে তা'দের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

ব্যাঙ্কক বৈঠকে যে সব প্রতিনিধি যান কর্ণেল হবিবুর তাঁদের মধ্যে ছিলেন। প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড্‌কোয়ার্টার্সের তিনি য়্যাড্‌জুট্যাণ্ট জেনারেল ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হ'লে তিনি অফিসার্স ট্রেণিং স্কুলের কম্যাণ্ডাণ্ট হ'ন; এই পদে কাজ ক'রে তিনি বিশেষ নাম ক'রেছিলেন। মাত্র তিনমাস সময়ে তিনি সামরিক শিক্ষার্থীদের জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত ও প্রয়োজনীয়

সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে তুলেছিলেন। এই সব সামরিক শিক্ষার্থী এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কেউ বা 'প্লেটুনের' কেউ বা 'কোম্পানী'র ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁ'রা প্রত্যেক স্থানে এমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন যে শত্রুপক্ষের মুখেও তাঁদের প্রশংসার কথা শোনা গেছে। কর্ণেল হবিবুর তাঁর শিক্ষার্থীদের মন্ত্র শিখিয়েছিলেন—"জিনা হৈ ত মরণা শিখো" (বাঁচ্‌তে হ'লে ম'রতে শেখো)। তাঁর ছাত্রেরা নিজেদের জীবনে এই মন্ত্রেরই সাধন ক'রেছিলেন।

১৯৪৪ সালের মে মাসে নেতাজী তাঁকে 'এসিষ্ট্যাণ্ট চীফ অব্‌ ষ্টাফ্‌' পদে নিযুক্ত ক'রে রেঙ্গুনে তাঁর (নেতাজীর) হেড্‌কোয়ার্টার্সে উপস্থিত হ'তে আদেশ করেন। নেতাজী তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন—সুতরাং কোন বিশ্বস্ত সুদক্ষ অফিসার এসে রেঙ্গুনে সামরিক কার্য্যাবলীর ভার গ্রহণ করেন—এই তাঁ'র ইচ্ছা।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে কর্ণেল হবিবুর রহমান নেতাজীর সঙ্গে টোকিও-য় যান এবং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁ'র সঙ্গেই রেঙ্গুনে ফিরে আসেন।

১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে তাঁ'কে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়: সেখানে গিয়ে তিনি জেনারেল ভোঁসলার কাছ থেকে সেখানকার সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বভার গ্রহণ ক'রবেন—কারণ জেনারেল ভোঁসলার তখন রেঙ্গুনে আসা প্রয়োজন হয়।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজীর শেষ এবং বিপদ-

সঙ্কুল টোকিও যাত্রায় আজাদ হিন্দ ফৌজের একমাত্র তিনিই তাঁর সঙ্গী ছিলেন। নেতাজীর সঙ্গে তিনি একই বিমানে ছিলেন। এই বিমানখানি ফরমোসায় বিমান-ঘাঁটি থেকে উঠ্‌বার সময় প'ড়ে গিয়ে পুড়ে যায়।

এই যাত্রায় একমাত্র সঙ্গী ছিলেন ব'লে কর্ণেল হবিবুর দেশবাসীর কাছে নেতাজীর শেষ বাণী বহন ক'রবার গৌরব লাভ ক'রেছিলেন। তিনি কর্ণেল হবিবুরকে ব'লে গেছেন—"আমার দেশবাসীদের ব'লো—সুভাষ তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্য ল'ড়েছে।"

নেতাজী যে সব অফিসারদের সব চেয়ে বেশী বিশ্বাস ক'রতেন কর্ণেল হবিবুর তাঁ'দেরই একজন। ধীর, স্থির তাঁ'র স্বভাব—অথচ পর্ব্বতের মত দৃঢ়। নেতাজীর প্রতি তিনি এবং ভারত-স্বাধীনতা-আন্দোলনের নিঃস্বার্থ কর্ম্মী।

মিরপুর জেলার এক বিখ্যাত মুসলমান রাজপুত বংশে তাঁর জন্ম—বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৩০ বৎসর।

১৩। কর্ণেল এস্, এ, মালিক (সর্দ্দার-ই-জং)

কর্ণেল মালিক বাহাওয়ালপুর ষ্টেট্ ফোর্সে'র অফিসার ছিলেন। সিঙ্গাপুরের পতনের সময় তিনি ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সূচনা থেকেই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে তার সমর্থন করেন। তিনি প্রতিনিধি হ'য়ে ব্যাঙ্কক বৈঠকে যোগদান করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন হবার পরই তাঁ'কে গুপ্তচর-দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুরে এই দলটিকে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে শিক্ষা দান ও পরিচালনা করেন।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি সিঙ্গাপুর থেকে ব্রহ্মদেশে যান। মণিপুর অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব দল যুদ্ধ ক'রতে যায় তার মধ্যে কর্ণেল মালিকের দলটিও ছিল। ভারতীয় অফিসারদের ভিতর তিনিই প্রথম ১৯৪৪ সালে বিষাণপুর এলাকায় ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

এই সময়ে যুদ্ধে সৈন্যপরিচালনা ছাড়াও পরাধীনতামুক্ত অঞ্চলগুলির শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারও ছিল তাঁ'র উপর।

যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত তাঁ'র দল চালনা করায় তিনি বিশেষ সম্মানসূচক 'সর্দ্দার-ই-জং' পদক লাভ করেন।

নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে রেঙ্গুনে ফিরে আসেন। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁ'কে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। মান্দালয়ে অবস্থানকালে তাঁ'র সৈন্যদলকে ব্রিটিশ সৈন্যদল ঘিরে ফেলে কিন্তু তিনি সুকৌশলে এ বেষ্টনী ভেদ ক'রে রেঙ্গুনে ফির্‌তে সমর্থ হন।

১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে নেতাজী যে দলটি নিয়ে রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্ককে যাত্রা করেন সেই দলে তিনিও ছিলেন। ব্যাঙ্ককে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিকাংশের

সঙ্গে তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। কর্ণেল মালিক ডানপিঠে স্ফূর্ত্তিবাজ অফিসার ছিলেন, তিনি হাসি মুখে বিপদের মুখে ছুটে যেতেন। তিনি একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক ও নেতাজীর একজন পরম অনুরাগী ভক্ত।

ঝাঁসির-রাণী বাহিনী

সিঙ্গাপুরে আস্‌বার কিছুদিন পরেই নেতাজীর ইচ্ছা হয় তিনি ভারতীয় নারীদের নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তুল্‌বেন—এর নাম হবে ঝাঁসির-রাণী বাহিনী। ভারতবর্ষে থাকা সময়ে দেশের কাজ ক'রে তিনি এই বুঝেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় নারীদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক—এই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁ'র নারীবাহিনী গঠনের ইচ্ছার উদ্ভব। তাঁ'র ইচ্ছানুসারে ১২ই জুলাই তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের নারীশাখা ভারতীয় নারীদের এক সভা আহ্বান করে। এই সভায় নেতাজী বক্তৃতা দেন। অনেক ভারতীয় মেয়ে দশ বারো মাইল পথ পায়ে হেঁটে এই সভায় যোগদান ক'রতে এসেছিলেন। কি বিপুল উৎসাহ তাঁদের! দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ ক'রতে পুরুষরা যেমন ব্যগ্র—তাঁরাও সেইরূপ ব্যগ্র।

নেতাজী তাঁদের উদ্দেশ্যে সেদিন নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন—

"ভগিনীগণ—দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ভারতের মেয়েরা কি ক'রেছে সে কথা আমার মত আপনাদেরও জানা, বিশেষ ক'রে আমি গত বিশ বৎসরের কথা বল্‌ছি। ১৯২১ সালে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পুনর্জন্ম লাভ ক'রবার পর থেকে তাঁ'দের কর্ম্মতৎপরতার আপনারা নিশ্চয়ই খবর রাখেন। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের কথাই শুধু বল্‌ছি না, গোপন বিপ্লবাত্মক এমন কি

আন্দোলনেও তাঁ'রা কম কাজ করেন নি।...বস্তুতঃ এ কথা বল্‌লে আমার অত্যুক্তি হবে না—দেশের কাজের এমন ক্ষেত্র নেই, জাতীয় প্রচেষ্টার এমন বিভাগ নেই যেখানে না আমাদের দেশের মেয়েরা সানন্দে নির্ভীকচিত্তে পুরুষের সঙ্গে সমভাবে জাতীয়-সংগ্রামের ভার নিজেদের কাঁধে বহন ক'রেছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তুচ্ছ ক'রে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো বলুন, সভার পর সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কাজে বলুন, দ্বারে দ্বারে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার কাজে বলুন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক নির্ব্বাচন পরিচালনায় বলুন, সরকারী আদেশ অমান্য ক'রে নির্ম্মম ব্রিটিশ পুলিশের লাঠির আঘাত তুচ্ছ ক'রে শোভাযাত্রা পরিচালনার কাজে বলুন অথবা নির্ভীক চিত্তে কারাবরণ, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করা বলুন—কোথাও আমাদের দেশের মেয়েরা পশ্চাৎপদ হন নি। আমাদের বোনেরা বিপ্লবাত্মক কাজেও যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন। তাঁ'রা দেখিয়েছেন—প্রয়োজন হ'লে তাঁ'রা তাঁ'দের ভাইদের মতই বন্দুক ও রিভলবার চালাতে পারেন।...আজ যে আমি আপনাদের উপর এতখানি বিশ্বাস স্থাপন ক'রছি—এর কারণ আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েরা দেশের কাজ ক'রবার কতটা ক্ষমতা রাখেন। একথা বল্‌লে বাড়িয়ে বলা হবে না যে এমন কষ্ট নেই যা আমাদের দেশের মেয়েরা সহ্য ক'রতে পারেন না।

ইতিহাসে আমরা দেখি প্রত্যেক সাম্রাজ্যেরই যেমন উত্থান আছে—তেমনি আছে তার পতন। সে সময় এসে গেছে—যখন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগৎ থেকে মুছে যাবে। পৃথিবীর এই অংশ থেকে সে সাম্রাজ্য যে অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে তা' আমরা নিজের চোখেই দেখ্‌ছি, এমনি ক'রে পৃথিবীর আরও এক অংশ থেকে সে সাম্রাজ্য মুছে যাবে—সে অংশ হ'চ্ছে ভারতবর্ষ···

কোন মেয়ে যদি মনে করেন বন্দুক কাঁধে নিয়ে যুদ্ধ করা নারীর কাজ নয়—আমি ব'লব ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে দেখুন আমাদেরই দেশের মেয়েরা অতীতে কি ক'রেছেন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ভারতের বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রাণী কি ক'রেছেন। এই রাণী খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়ায় চ'ড়ে নিজের সৈন্যদের পরিচালনা ক'রেছেন। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য—যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে হয় ভারতের পরাজয়। কিন্তু আমাদেরও তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিলে চ'লবে না, থাম্‌লে চ'লবে না, চালিয়ে যেতে হবে যুদ্ধ। ১৮৫৭ সালের সেই মহীয়সী রাণীর আরব্ধ কাজ আমাদের সমাপ্ত ক'রতে হবে···

তাই ভারত-স্বাধীনতার শেষ—সর্ব্বশেষ সংগ্রামে আজ আমাদের একজন ঝাঁসির রাণী হ'লে চল্‌বে না, আমরা চাই হাজার হাজার ঝাঁসির রাণী। ক'টা রাইফেল আপনারা ব্যবহার ক'রবেন সেইটেই বড় কথা নয়,—বড় কথা হ'চ্ছে ক'টা গুলি আপনারা ছুঁড়্‌বেন। আর বড় কথা হ'চ্ছে আপনাদের এই সাহসিকতার দৃষ্টান্তের নৈতিক প্রভাব···"

বক্তৃতার শেষে নেতাজী ঝাঁসির-রাণী বাহিনী ও রেড ক্রস দলের জন্য মেয়ে চাইলেন। বহু মহিলা তখনই এগিয়ে এসে নিজেদের নাম দিলেন। এরপর সিঙ্গাপুরে তাঁ'দের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হ'ল। সিঙ্গাপুরে ৬০০ স্বেচ্ছাসেবিকা এই নারী-বাহিনীতে যোগ দেন, এঁদের মধ্যে অল্পবয়স্কা তরুণী থেকে বর্ষীয়সী মহিলা পর্য্যন্ত ছিলেন—অধিকাংশই উচ্চ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সব সম্প্রদায়ের এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের মেয়েই এতে ছিলেন। মেয়েদের এই শিক্ষা-কেন্দ্রে কোনরূপ ভোগ বিলাসের নামগন্ধ ছিল না। সামরিক শিক্ষা গ্রহণের সময় তাঁ'দের অনেক কঠিন কষ্টসাধ্য কাজ ক'রতে হ'ত। যথা—মেশিনগান, টমীগান চালানো, হাত বোমা ছোঁড়া, রাইফেল, সঙ্গীন প্রভৃতি চালানো শেখা। শ্রমসাধ্য শারীরিক ব্যায়াম, কুচ্‌কাওয়াজ ইত্যাদিও তাঁ'দের ক'রতে হ'ত। এ ছাড়া ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে তাঁ'দের কাছে বক্তৃতা দেওয়া হ'ত। ক্যাম্পে অতি সাধারণ খাদ্য খেয়ে তাঁ'দের জীবনধারণ ক'রতে হ'ত। ভাত, মাছ, তরকারী এই ছিল তাঁ'দের খাদ্য। রাত্রে ঘুমাবার জন্য সুকোমল শয্যা তাঁ'দের ছিল না, কাঠের মেঝের উপর মাত্র একটা ক'রে কম্বল পাতা, —এই তাঁ'দের বিছানা।

শিক্ষাশিবিরের নিয়ম-কানুন ছিল অতীব কঠোর। বাইরের লোক কেউ তাঁ'দের সঙ্গে দেখা ক'রতে পেত না, আত্মীয়-স্বজনেরা সপ্তাহে মাত্র একদিন দেখা ক'রবার অনুমতি

পেতেন। সামরিক-শিক্ষা গ্রহণে তাঁ'দের সকাল থেকে সন্ধ্যা কেটে যেত। ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথন নামে একটি উদ্যোগশীলা, তরুণী, অসম-সাহসিকা মেয়েকে নেতাজী ইঁহাদের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করেন।

মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই তাঁ'দের ট্রেণিং শেষ। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁ'দের সামরিক শিক্ষা এমন পূর্ণাঙ্গ হয় যে আজাদ হিন্দ ফৌজের পুরুষ সৈনিকদের সঙ্গে তাঁ'দের শিক্ষা সম্বন্ধে আব কোন পার্থক্য ছিল না। সঙ্গিন যুদ্ধে তাঁরা সব চেয়ে বেশী পারদর্শিনী হন এবং তাঁ'দের সবারই ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে সঙ্গিন চালনা ক'রবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্রতা।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদল যখন ইম্ফল আক্রমণ ক'রবার জন্য ব্রহ্মদেশে যাত্রা করে— তখন ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েরা নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে নেতাজীর কাছে এক আবেদন লেখেন—পুরুষ সৈনিকদের মত তাঁরাও দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে প্রাণ দিতে সমভাবে ব্যগ্র। নেতাজী যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁ'দের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ দেন। নেতাজী তাঁ'দের এই আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর ঝাঁসির-রাণী বাহিনী সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে যায়, সেখানে নতুন স্বেচ্ছাসেবিকাদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে, আর একটি ট্রেণিং ক্যাম্প খোলা হয়। এরপর স্বেচ্ছাসেবিকার সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজার। আরও কয়েক হাজার মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক হ'য়ে নিজেদের

নাম লিখিয়েছিলেন—কিন্তু শিক্ষাদান প্রভৃতির ব্যবস্থার অসুবিধা থাকায় তাঁ'দের দলে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল আক্রমণ সুরু ক'রলে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর দলগুলিকে মেমিওয় (Maymyo) নিয়ে যাওয়া হয়। এঁরা প্রধানতঃ দুইই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর কাজ ছিল যুদ্ধ, অপরটির শুশ্রূষা। কিন্তু প্রত্যেক মেয়েকেই যুদ্ধ ও হাসপাতালের সুশ্রূষার কাজ—দু'ইই শেখান হ'ত। এই বাহিনীর মেয়েরা শুশ্রূষার কার্য্যে কেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, সে কথা এই গ্রন্থের অন্যত্র আমি বিবৃত ক'রেছি; এখানে তা'র আর পুনরাবৃত্তি ক'রতে চাই না।

এঁদের যুদ্ধ করা সম্বন্ধে নেতাজী ব'লতেন—ইম্ফল জয়ের পর এঁদের যুদ্ধ ক'রতে নামানো হবে। নেতাজীর অভিপ্রায় ছিল—কলকাতা যদি কোনদিন জয় করা সম্ভব হয় তবে এই ঝাঁসির-রাণী বাহিনীই সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মুখ-বাহিনী হ'য়ে বিজয়োল্লাসে সে নগরীতে প্রবেশ ক'রবে। আমাদের ইম্ফল-অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় ঝাঁসির-রাণী বাহিনী যুদ্ধ ক'রবার সুযোগ পায় নি বটে, কিন্তু আমি ব'লতে পারি, এ সুযোগ পেলে এই বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবিকারা নিঃসন্দেহে তাঁ'দের যোগ্যতা প্রমাণ ক'রে কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রতে পারতেন। তাঁ'দের প্রত্যেকেরই ছিল ব্যাঘ্রের মত সাহস আর ইস্পাতের মত দৃঢ়তা। তাঁদের ট্রেণিং-এর শেষের দিকে প্রায় আধ মণ ওজনের ভারী রাইফেল আর গুলিবারুদের বোঝা নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন ১৫ থেকে ২০ মাইল ক'রে হাঁটতে

হ'ত। শারীরিক শিক্ষা গ্রহণের সময় প্রতিদিন সকালে একটানা তাঁ'দের ২ মাইল দ্রুতগতিতে দৌড়তে হ'ত। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে একবার আজাদ হিন্দ ফৌজের এক আনুষ্ঠানিক কুচ্‌কাওয়াজ হয়। প্রায় ৩০০০ হাজার সৈনিক এতে যোগদান করে। ঝাঁসির-রাণী বাহিনী ছিল এর দক্ষিণভাগের অগ্রণী দল। প্রধান প্রধান জাপানী জেনারেল, বর্ম্মী মন্ত্রী এবং রেঙ্গুনের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই প্যারেড দেখ্‌তে এসেছিলেন। নেতাজী এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন এবং সৈন্যরা তাঁর সামনে এক খোলা মাঠে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুন্‌লেন।

নেতাজীর বক্তৃতা শেষ হ'লে সৈন্যদের মার্চ্চ ক'রে নেতাজীকে অভিবাদন ক'রতে আদেশ দেওয়া হ'ল। ঝাঁসির-রাণী বাহিনী মার্চ্চ আরম্ভ ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেল। কাছের বিমানঘাঁটি থেকে জাপানী জঙ্গী বিমানগুলি আকাশে উঠ্‌ল। ব্রিটিশ বোমারু ও জঙ্গী বিমান রেঙ্গুন আক্রমণ ক'রতে আস্‌ছে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তারা এসে গেল এবং আমাদের মাথার উপরে ভয়ঙ্কর মেশিনগানের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। জাপানী জেনারেল এবং অন্যান্য দর্শকবৃন্দ বিপদের গুরুত্ব বুঝ্‌তে পেরে ভয়ে পালিয়ে নিরাপত্তার জন্য পাশের সর্ব পরিখায় আশ্রয় নিলেন। নেতাজী তখনও মঞ্চের উপর প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর

মেয়েরা অচঞ্চল নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মার্চ্চ ক'রে চ'লে গেল, যেন কিছুই ঘটে নি। হঠাৎ শত্রু-বিমানগুলি ছোঁ মেরে নেমে এসে যেখানে প্যারেড হ'চ্ছিল তা'র উপর দিয়ে গেল। একখানা শত্রু-বিমান মাটি থেকে ৫০ ফুটের মধ্যে এসে নেতাজীর প্রায় ১০০ গজ দূর দিয়ে চ'লে গেল। বিমানধ্বংসী কামান থেকে এই বিমানখানির উপর গোলা ছুড়্‌তে লাগ্‌ল, তা'রই একটা গোলা লেগে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর একটি মেয়ের মাথা উড়ে গিয়ে মৃত্যু হ'ল। অন্যান্য মেয়েরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লেন না, তাঁ'রা দৃঢ় পদক্ষেপে নেতাজীর সামনে দিয়ে মার্চ্চ ক'রে গেলেন। শত্রু-বিমানটিতে ছ'টি মেশিনগান ছিল—ওরা ঐ মেশিনগান চালালে নেতাজী এবং ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ ছিল না।

আর একবার ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর কতকগুলি মেয়ে যখন রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রে ব্যাঙ্ককে যাচ্ছিলেন—ব্রিটিশ গেরিলারা তাঁ'দের ট্রেণ আক্রমণ করে। আমাদের দলের মেয়েরা তখনই বন্দুক ছুড়ে তা'দের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এই যুদ্ধে আমাদের দু'টি মেয়ে মারা যান এবং দু'টি আহত হ'ন কিন্তু আমাদের যা ক্ষতি হয় তা'র চেয়ে শত্রুদের ক্ষতি করেন তাঁ'রা অনেক বেশী।

ভীষণ বর্ষার মধ্যে রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রে রাস্তায় শত্রু কর্ত্তৃক অনুসৃত হ'য়ে ব্যাঙ্ককে যাবার সময় তাঁ'রা যে দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তা'র বিস্তৃত বিবরণ আমি

এর পূর্ব্বেই দিয়েছি। এই অপসরণকালে সুদীর্ঘ ২০০ মাইল পথ তাঁ'রা বন্দুক ও গুলিবারুদ ইত্যাদির ভারী বোঝা বহন ক'রে পায়ে হেঁটে গিয়েছেন। ঝাঁসির-রাণী বাহিনীর মেয়েদের কার্য্যাবলী থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হ'য়েছে যে প্রয়োজন উপস্থিত হ'লে আমাদের দেশের মেয়েরা কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহসিকতা ও ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি গুণে জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের চেয়ে অপকৃষ্ট ত' নয়ই, উৎকৃষ্টই হবে।

আত্মসমর্পণের আগেই নেতাজী প্রত্যেক মেয়েকে তাঁ'র বাপ মা বা অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁ'রা ঠিক ঠিক মত পৌছেছেন নিশ্চিত জেনে তবে আত্মসমর্পণ করা হয়।